ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান

অনুশীলন বই

দাখিল

ষষ্ঠ শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

ইন্দিরা গান্ধী
ভারতের প্রধানমন্ত্রী

জেনারেল স্যাম মানেকশ
ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রধান

এডওয়ার্ড কেনেডি
আমেরিকান সিনেটর

পন্ডিত রবিশঙ্কর
ভারতীয় সেতারবাদক ও সঙ্গীতশিল্পী

উইলি ব্রান্ট
চ্যান্সেলর
জার্মান ফেডারেল রিপাবলিক

আলেক্স কোসিজিন
রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী

মার্শাল টিটো
যুগোস্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট

আঁন্দ্রে মালরোঁ
ফরাসি লেখক ও রাজনীতিবিদ

জে.এফ.আর. জ্যাকব
ভারতীয় সেনাবাহিনীর
লেফটেন্যান্ট জেনারেল

সিডনি শনবার্গ
আমেরিকান সাংবাদিক

এলেন গিন্সবার্গ
আমেরিকান কবি

সায়মন ড্রিং
ব্রিটিশ সাংবাদিক

উইলিয়াম এ এস অর্ডারল্যান্ড
অস্ট্রেলিয়ান, বীর প্রতীক খেতাব প্রাপ্ত
মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষক

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে সহায়তাকারী কয়েকজন বিদেশি বন্ধু

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক জাতীয় শিক্ষাক্রম- ২০২২ অনুযায়ী প্রণীত এবং ২০২৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে দাখিল ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান (অনুশীলন বই)

দাখিল

ষষ্ঠ শ্রেণি

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

রচনা ও সম্পাদনা

আবুল মোমেন

অধ্যাপক এম. শহীদুল ইসলাম

অধ্যাপক শরমিন্দ নীলোর্মি

অধ্যাপক স্বাধীন সেন

অধ্যাপক আকসাদুল আলম

ড. দেবাশীষ কুমার কুন্ডু

অধ্যাপক ড. পারভীন জলী

ড. সুমেরা আহসান

মুহাম্মদ রকিবুল হাসান খান

রায়হান আরা জামান

উমা ভট্টাচার্য্য

সিদ্দিক বেলাল

সানজিদা আরা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত

[জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রকাশকাল : ডিসেম্বর ২০২২

শিল্পনির্দেশনা

মঞ্জুর আহমদ

চিত্রণ

ইউসুফ আলী নোটন
প্রমথেশ দাস পুলক
বিভল সাহা
তামান্না তাসনিম সুপ্তি

প্রচ্ছদ

ইউসুফ আলী নোটন

গ্রাফিক্স

মো: রুহুল আমিন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

প্রসঙ্গ কথা

পরিবর্তনশীল এই বিশ্বে প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে জীবন ও জীবিকা। প্রযুক্তির উৎকর্ষের কারণে পরিবর্তনের গতিও হয়েছে অনেক দ্রুত। দ্রুত পরিবর্তনশীল এই বিশ্বের সঙ্গে আমাদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। কারণ প্রযুক্তির উন্নয়ন ইতিহাসের যেকোনো সময়ের চেয়ে এগিয়ে চলেছে অভাবনীয় গতিতে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব পর্যায়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশ আমাদের কর্মসংস্থান এবং জীবনযাপন প্রণালিতে যে পরিবর্তন নিয়ে আসছে তার মধ্য দিয়ে মানুষে মানুষে সম্পর্ক আরও নিবিড় হবে। অদূর ভবিষ্যতে অনেক নতুন কাজের সুযোগ তৈরি হবে যা এখনও আমরা জানি না। অনাগত সেই ভবিষ্যতের সাথে আমরা যেন নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারি তার জন্য এখনই প্রস্তুতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

পৃথিবী জুড়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটলেও জলবায়ু পরিবর্তন, বায়ুদূষণ, অভিবাসন এবং জাতিগত সহিংসতার মতো সমস্যা আজ অনেক বেশি প্রকট। দেখা দিচ্ছে কোভিড ১৯ এর মতো মহামারি যা সারা বিশ্বের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা এবং অর্থনীতিকে থমকে দিয়েছে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় সংযোজিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা।

এসব চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তার টেকসই ও কার্যকর সমাধান এবং আমাদের জনমিতিক সুফলকে সম্পদে রূপান্তর করতে হবে। আর এজন্য প্রয়োজন জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন দূরদর্শী, সংবেদনশীল, অভিযোজন-সক্ষম, মানবিক, বৈশ্বিক এবং দেশপ্রেমিক নাগরিক। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পদার্পণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। শিক্ষা হচ্ছে এই লক্ষ্য অর্জনের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। এজন্য শিক্ষার আধুনিকায়ন ছাড়া উপায় নেই। আর এই আধুনিকায়নের উদ্দেশ্যে একটি কার্যকর যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের একটি নিয়মিত, কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হলো শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জন। সর্বশেষ শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয় ২০১২ সালে। ইতোমধ্যে অনেক সময় পার হয়ে গিয়েছে। প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়নের। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং শিখন চাহিদা নিরূপণের জন্য ২০১৭ থেকে ২০১৯ সালব্যাপী এনসিটিবির আওতায় বিভিন্ন গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলন পরিচালিত হয়। এসব গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলনের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে নতুন বিশ্ব পরিস্থিতিতে টিকে থাকার মতো যোগ্য প্রজন্ম গড়ে তুলতে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণির অবিচ্ছিন্ন যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়েছে।

যোগ্যতাভিত্তিক এ শিক্ষাক্রমের আলোকে সকল ধারার (সাধারণ, মাদ্রাসা ও কারিগরি) ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য এই পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হলো। বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু এমনভাবে রচনা করা হয়েছে যেন তা অনেক বেশি সহজবোধ্য এবং আনন্দময় হয়। এর মাধ্যমে চারপাশে প্রতিনিয়ত ঘটে চলা বিভিন্ন প্রপঞ্চ ও ঘটনার সাথে পাঠ্যপুস্তকের একটি মেলবন্ধন তৈরি হবে। আশা করা যায় এর মাধ্যমে শিখন হবে অনেক গভীর এবং জীবনব্যাপী।

পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নে ধর্ম, বর্ণ, সুবিধাবঞ্চিত ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরীক্ষামূলক এই সংস্করণের কোনো ভুল বা অসংগতি কারো চোখে পড়লে এবং এর মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কোনো পরামর্শ থাকলে তা জানানোর জন্য সকলের প্রতি বিনীত অনুরোধ রইল।

প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

ভূমিকা

নতুন বছরে নতুন শ্রেণিতে তোমাদের অভিনন্দন, স্বাগতম।

ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হওয়া মানে শিক্ষায় প্রাথমিক পর্ব শেষ করে মাধ্যমিকে প্রবেশ। তোমাদের জন্যে পড়ালেখার নতুন এক পদ্ধতি নিয়ে আমরা অপেক্ষায় আছি। এ পদ্ধতিতে তোমাদের আর পরীক্ষা এবং ভালো নম্বরের পিছনে ছুটতে হবে না। কেবল পরীক্ষার জন্য সম্ভাব্য প্রশ্ন জানা আর সেসবের উত্তরের খোঁজে থাকতে হবে না। এখন থেকে উত্তর মুখস্থ করাও তোমাদের মূল কাজ নয়। বাবা-মায়েরও ভালো টিউটর, কোচিং সেন্টার, গাইড বই আর তোমাদের পরীক্ষা ও প্রশ্ন নিয়ে উদ্বেগে কাটাতে হবে না। অযথা অনেক টাকাও খরচ করতে হবে না।

আমরা জানি তোমাদের প্রত্যেকের রয়েছে এক একটা সতেজ মন আর একটা করে খুবই সক্রিয় মস্তিষ্ক। তোমাদের কল্পনা শক্তি যেমন আছে তেমনি আছে বুদ্ধি, তা খাটিয়ে পেয়ে যাও ভাবনার নানা পথ। মন আর মস্তিষ্কের মতো আরও কয়েকটা যোগ্যতা নিয়েই জন্মেছ সবাই। এগুলোর কথা বিশেষভাবে বলতে চাই। বলছি মানুষের ইন্দ্রিয় শক্তির কথা। তোমরা আগেই জেনেছো আমাদের সবার আছে পাঁচটি করে বিশেষ প্রত্যঙ্গ - চোখ, কান, নাক, জিহ্বা আর ত্বক। এগুলো ইন্দ্রিয়ের কাজ করে। চোখ দিয়ে আমরা দেখি, এ হল দৃষ্টিশক্তি, আর এটিকে বলি দর্শনেন্দ্রীয়। তেমনি কানে শুনি, এটি শ্রবণেন্দ্রীয়, নাক দিয়ে শুঁকি বা ঘ্রাণ নেই, এটি ঘ্রাণেন্দ্রীয়। জিহ্বা দিয়ে স্বাদ গ্রহণ করি, এটি স্বাদেন্দ্রীয়; আর ত্বক দিয়ে স্পর্শ করি, এটি স্পর্শেন্দ্রীয়। কিছু চিনতে, বুঝতে, জানতে এগুলো আমাদের সহায়তা করে। তাই ইন্দ্রিয়গুলো এতো গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যঙ্গ।

এতোসব সম্পদ মিলিয়ে তোমাদের প্রত্যেকের আছে -

অফুরন্ত প্রাণশক্তি
সীমাহীন কৌতূহল
আনন্দ পাওয়ার অসীম ক্ষমতা এবং
বিস্মিত হওয়ার স্বাভাবিক প্রবণতা।

আধুনিক শিক্ষা-বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, পরীক্ষা আর উত্তর মুখস্থ করার যে চাপ তাতে তোমাদের এসব স্বাভাবিক ক্ষমতার বিকাশ ব্যহত হয়। শিক্ষায় বরং শিক্ষার্থীদের এই ক্ষমতাগুলোকেই কাজে লাগানো দরকার, তাতেই ভালো ফল মিলবে।

এ থেকে তোমাদের নিজেদের কাজ সম্পর্কে একটু ধারণা নিশ্চয় পেয়ে যাচ্ছো। হ্যাঁ এই ব্যবস্থায় তোমরা বেশ স্বাধীনতা পাচ্ছো। তবে ভুলো না, স্বাধীনতা ভোগ করতে হলে দায়িত্বও নিতে হয়। আচ্ছা, পড়ালেখাটা তো তোমার নিজেরই কাজ, নিজের জন্যেই। তো নিজের কাজ নিজে করবে, এতো খুব ভালো কথা।

তবে আসল কথা হলো কোনো কাজে যখন নিজেই সফল হবে তাতে আনন্দ যে কত বেশি তা নিশ্চয় তোমরা বুঝতে পার। তাই নতুন পথে শিক্ষা হবে আনন্দময় যাত্রা, পথচলা। রবীন্দ্রনাথের গানে আছে - যাত্রাপথের আনন্দগান। শিক্ষা হলো আনন্দগান সেই অভিযাত্রা - যেন গান করতে করতে পথ চলেছ।

তোমরা ষষ্ঠ শ্রেণিতে মাত্রই উঠেছো। অভিজ্ঞতার ঝুলিতে রয়েছে পঞ্চম শ্রেণির পাঠ। নতুন শ্রেণির পাঠের অনেক কিছুই হবে নতুন, অনেকটা বা অজানা। তবে অজানা আর নতুন বলেই তো এ পথচলাটা হবে অভিযানের মতো। পথে যে চ্যালেঞ্জ থাকবে সেগুলো পেরুনোর অভিজ্ঞতা থেকে যেমন অনেক কিছু জানবে, শিখবে, করবে তেমনি পাবে অফুরন্ত আনন্দ।

অথচ এর জন্যে বাড়তি কোনো খরচ লাগবে না। কারণ চ্যালেঞ্জ মোকবিলার জন্যে তোমাদের ভাঁড়ারে আছে নিজস্ব শক্তিশালী হাতিয়ার - কৌতূহল, বিস্ময়বোধ, প্রাণশক্তি এবং আনন্দিত হওয়ার ক্ষমতা। ইন্দ্রিয়গুলো এতে সহায়ক ভূমিকা গ্রহণ করে। আর মজা হল এগুলো টাকা-পয়সার মতো নয়, ব্যবহারে খরচ না হয়ে বরং বাড়ে। কারণ এসবই তোমার মনের সম্পদ, তুমি যত চর্চা করবে ততই এগুলো ঝকঝকে থাকবে, কাজে হবে দক্ষ। বরং এদের প্রেরণায় তোমাদের নতুন নতুন ক্ষমতার প্রকাশ ঘটবে। প্রথম ডাক পড়বে বুদ্ধির। নিজেদের বুদ্ধি খাটাতে হবে, ভাবতে হবে, আবার ভাবতে গেলে যুক্তির প্রয়োজন। এ হলো চর্চার বিষয় - বুদ্ধি খাটালে তা আরও বাড়বে, দেখবে কোনো কোনো গাছের ডাল-পাতা ছেঁটে দিলে গাছটি বাড়ে ভালো, ফলও দেয় বেশি। তোমাদের চাই বুদ্ধিকে খাটানো, যুক্তিতে শান দেওয়া। আর ইন্দ্রিয়গুলোকে সজাগ রাখতে হবে, তাতে এদের দক্ষতাও বাড়তে পারবে।

এভাবে অজানাকে জয় করবে, অন্ধকারে আলো জ্বালিয়ে চলতে চলতে বিস্ময়ে-আনন্দে মজে কখন যে অনেক কিছু জানা হয়ে যাবে টেরও পাবে না। তবে শুরু হোক এই জয় যাত্রা!

সূচিপত্র

আত্মপরিচয়	১-২৩
সক্রিয় নাগরিক ক্লাব	২৪-৩০
বিজ্ঞানের চোখ দিয়ে চারপাশ দেখি	৩১-৫৩
বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ক্লাব	৫৪-৬৩
আমাদের এলাকায় মুক্তিযুদ্ধ	৬৪-৮৬
বই পড়া ক্লাব	৮৭-৮৯
গোত্রবদ্ধ সমাজ থেকে স্বাধীন রাষ্ট্র	৯০-৯৯
সামাজিক পরিচয়	১০০-১৩৬
প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামো	১৩৭-১৫৬
প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামোর আন্তঃসম্পর্ক এবং আমাদের দায়িত্বশীলতা	১৫৭-১৭৮
সমাজ ও সম্পদের কথা	১৭৯-১৯২
পরিশিষ্ট	১৯৩-২০৩

আত্মপরিচয়

নতুন বছরের প্রথম ক্লাস: বন্ধুদের সাথে পরিচয়ের খেলা

আজ নতুন বছরের প্রথম ক্লাস শুরু হলো। ষষ্ঠ শ্রেণিতে অনেক নতুন মুখের আনাগোনা। অনেকে সবাইকে আগে থেকে চেনে না। নতুন শ্রেণিতে সবার মনে রোমাঞ্চ আর উৎকণ্ঠা। অনেকেই সহপাঠীদের চেহারা, পোশাক আর বাচনভঙ্গি দেখে অনুমান করার চেষ্টা করছে কাদের সাথে বন্ধুত্ব করা যাবে। অন্বেষা সামনের দিকের একটা বেঞ্চে চুপচাপ বসেছিল। এমন সময় শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক প্রবেশ করলেন এবং বললেন, আমার নাম খুরশিদা হক, সবাই ডাকে খুশি আপা। আমি তোমাদের ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষক।

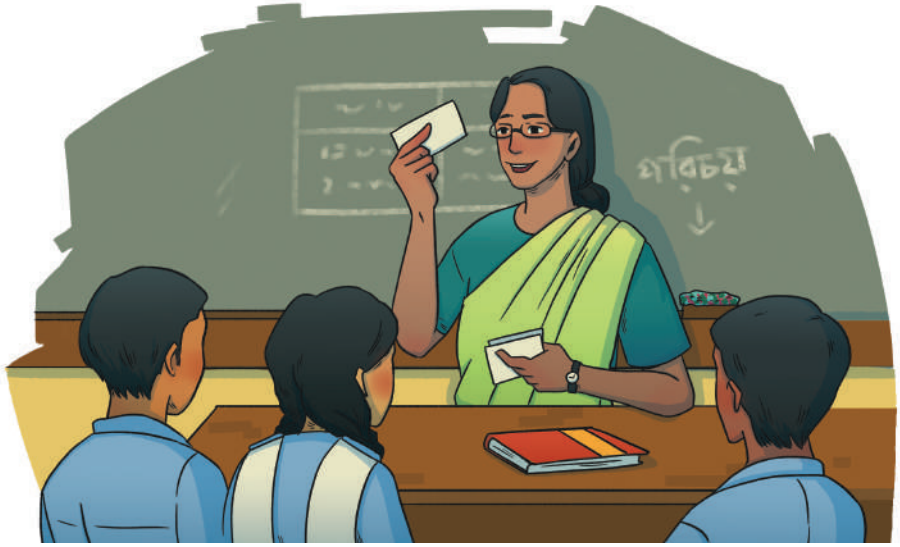

ষষ্ঠ শ্রেণির প্রথম ক্লাসে তোমাদের আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাই।

তিনি বললেন, আমার পরিচয় তো এক রকমভাবে পেলে। এখন তোমাদের সাথে পরিচিত হওয়ার পালা। আমি ভাবছি, তোমাদের সাথে একটা নতুন উপায়ে পরিচিত হবো। চলো আমরা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে বসে কিছু কাজ করি-

- প্রথমে প্রত্যেকে একটা করে কাগজের কার্ড নেই।
- এবার এসো এই কার্ডে আমরা নিজের পরিচয় তুলে ধরার জন্য নিজের সম্পর্কে এমন কিছু তথ্য লিখি যা আমাদের দিকে তাকিয়ে দেখেই কেউ বুঝতে পারবে না। মনে রেখো কার্ডে আমরা কেউ নিজেদের নাম লিখবো না।

সবার লেখা শেষ হয়ে গেলে খুশি আপা কার্ডগুলো এক জায়গায় জড়ো করলেন এবং সেখান থেকে যে কোন একটি কার্ড তুলে নিয়ে সবাইকে কার্ডে লেখা পরিচয়ের বর্ণনা পড়ে শোনালেন এবং জানতে চাইলেন বর্ণনার সাথে মিল আছে এমন শিক্ষার্থী কে হতে পারে?

আত্মপরিচয়ের কার্ড

আমি বই পড়তে ভালোবাসি। নতুন নতুন বিষয় সম্পর্কে জানতে আমি খুব পছন্দ করি। চারপাশে মানুষ ও প্রকৃতি সম্পর্কে আমার অনেক কৌতূহল। আমি বিতর্ক প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পেয়েছি। সাঁতার কাটতে আমার খুব ভালো লাগে। বড় হয়ে আমি একজন বিজ্ঞানী হতে চাই।

পরিচয়ের কার্ডে লেখা বর্ণনা শুনে সবাই আশেপাশের বন্ধুদের দিকে নতুনভাবে তাকাতে শুরু করলো। তাদের চেহারা, পোশাক অথবা কথা বলার ধরন কেমন তার বদলে তাদের কী কী গুনাবলি আছে সেটা বোঝার চেষ্টা শুরু করলো। বন্ধুদের যতটুকুই চেনে তার ভিত্তিতে তারা প্রকৃতি, অনুসন্ধান, জয় আর মিলিকে দাঁড় করিয়ে দিলো। খুশি আপা অবাক হয়ে বললেন, বাহ্! আত্মপরিচয়ের কার্ড একটা কিন্তু তোমরা খুঁজে পেয়েছে চার জনকে। স্বভাবতই খুশি আপা জানতে চাইলেন যে, কার্ডটা কার ছিলো? মিলি জানালো যে কার্ডটা তার। কিন্তু বাকি তিনজনও এটা জেনে খুশি হলো যে, তারা একা নয়, তাদের মতো আরও অনেকেই আছে। ফলে খুব দ্রুতই তারা পরস্পরের বন্ধু হয়ে গেল। এরপর খুশি আপা আরো কিছু আত্মপরিচয়ের কার্ড তুলে পড়ে শোনালেন

আত্মপরিচয়ের কার্ড

আমি ঘুরে বেড়াতে খুব পছন্দ করি। সমুদ্র আমার খুব প্রিয়। আমার প্রিয় রং নীল। আমার ক্রিকেট খেলতে খুব ভালো লাগে। বড় হয়ে আমি ক্রিকেট খেলোয়াড় হতে চাই।

আমাদের মিল-অমিল

আত্মপরিচয়ের কার্ড থেকে প্রতিবারই দেখা গেল একসাথে অনেককেই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে যাদের একই রকম বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তখন খুশি আপা সবার কাছে জানতে চাইলেন বার বার একটা আত্মপরিচয়ের কার্ড দিয়ে কয়েকজন একই রকম বৈশিষ্ট্যের বন্ধুদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে কেন? সবাই বলে উঠলো, কারণ আমাদের এক জনের সাথে অন্য জনের অনেক মিল রয়েছে। খুশি আপা বললেন, আচ্ছা এবার বলো তো এভাবে পরিচিত হয়ে তোমাদের কেমন লাগলো? নিসর্গ বললো, খুব ভালো লেগেছে। কারণ আমরা বুঝতে পেরেছি যে, বাইরে যত অমিলই দেখাক না কেন, আমাদের মাঝে আসলে অনেক বিষয়ে মিল রয়েছে। আর সবার সম্পর্কে এক সাথে অনেক জরুরি কথা জানতে পারলাম যা জানতে হয়তো আমাদের অনেক দিন লেগে যেতো। এরপর খুশি আপা বললেন, তাহলে প্রতিদিন ক্লাসের শুরুতে অবশিষ্ট কার্ডগুলো থেকে কিছু কিছু কার্ড নিয়ে পড়ে দেখবো।

আমি কে?

এ পর্যায়ে খুশি আপা সবার উদ্দেশ্যে বললেন যে, এতক্ষণ আমরা যা করলাম তার উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের পরিচয় তুলে ধরা। তোমরা নিশ্চয়ই খেয়াল করেছো আমরা প্রত্যেকে অন্যের সামনে নিজেদের বিশেষ পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। একজন মানুষ বিভিন্ন পরিস্থিতিতে এরকম নিজের বিভিন্ন পরিচয় তুলে ধরে। এসবই আমাদের আত্ম-পরিচয়ের একটা অংশ মাত্র। এরকম আরও অনেক বিষয় মিলে একটা সমাজের, জাতির মানুষের আত্মপরিচয় গড়ে ওঠে। তোমরা কি জানতে চাও আমাদের আত্মপরিচয় কীভাবে গড়ে উঠেছে? আজ আমরা যে কার্যক্রম শুরু করলাম এর ধারাবাহিকতায় সারা বছর ধরে আমরা আরও অনেক মজার মজার কাজ করবো। এটা একটা অভিযাত্রার মত। এই অভিযাত্রায় আমরা যেমন দেখবো সুদূর প্রাচীনকালে মানুষ কীভাবে প্রকৃতির সাথে যুদ্ধ করে জীবন যাপন করেছে, সময়ের সাথে সভ্যতার বিকাশে ভূমিকা পালন করেছে, তেমনি জানবো কীভাবে গড়ে তুলেছে পরিবার, সমাজ, আইন-কানুন, রাষ্ট্র প্রভৃতি। আর এসবের মধ্য দিয়েই পূর্ণতা পেয়েছে এই ভূখণ্ডের মানুষের আত্ম পরিচয়। খুশি আপা আনন্দের সাথে বললেন, আত্মপরিচয়ের ধারণাটিকে আরো গভীরভাবে বোঝার জন্য এখন থেকে আমরা ধাপে ধাপে অনেক মজার মজার কাজ করবো এবং শিখবো। চলো এবার শুরু করা যাক আমাদের এই অভিযাত্রা।

এরপর খুশি আপা, বোর্ডে আত্মপরিচয় শব্দটি লিখলেন এবং সবাইকে বললেন, এই শব্দটি দিয়ে কে কী বুঝেছ তা বলো। শুভ বললো, আত্মপরিচয় হচ্ছে এমন একটি বিষয় যার মাধ্যমে “আমি কে?” এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া যায়। আর মিলি বললো, আমরা এতক্ষণ কার্ডে নিজেদের সম্পর্কে যা লিখেছি তা এই আত্মপরিচয়েরই অংশ মাত্র।

> খুশি আপার মতো করে আত্মপচিয়ের কার্ডের খেলাটি চলো আমরা আমাদের এলাকার বন্ধুদের সাথেও খেলি।

এ পর্যায়ে স্বাধীন প্রশ্ন করলো যে, আমরা যেমন করে আমাদের পরিচয় তুলে ধরতে চেষ্টা করলাম অন্যরাও কি একই ভাবে “আমি কে?” এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করে? জবাবে খুশি আপা বললেন, এ প্রশ্নের উত্তর পেতে চলো আমরা সহপাঠীদের যে কোনো একজনের আত্মপরিচয়ের একটি ছক তৈরি করবো। তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে কে স্বেচ্ছায় আত্মপরিচয় জানাতে চাও? শুনে রুমানা বললো—আমি চাই আপা। আলোচনা করে রুমানার আত্মপরিচয়ের ছক তৈরি করবে। তখন ঠিক হলো সবাই প্রশ্ন করবে এবং খুশি আপা বললেন, সেটা তো খুবই ভালো কথা। চলো আমরা প্রথমে রুমানার পরিচয়ের ছক তৈরি করে অনুশীলন করি। তারপর সবাই মিলে নিচের মতো করে রুমানার পরিচয়ের ছক তৈরি করলো।

চলো আমরা অনেক পরিচয়ে রুমানাকে চিনে নিই –

রুমার পরিচয়ের ছক

খুশি আপা বললেন দ্যাখো, রুমানার আঠারোটা পরিচয় বেরিয়ে গেল। ইচ্ছা করলে আরও পরিচয় বের করতে পার। যেমন ও মুসলিম আর ওর দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মধ্যে রেখা হিন্দু, সুবর্ণা বৌদ্ধ ও বই কেনে এবং পড়তে ভালোবাসে এমনি আরও।

ফাতেমা বললো, চলো এবার আমরা আমাদের আত্মপরিচয়ের ছক তৈরি করি। সে আরো বললো মানুষের পরিচয়ের এই খেলা থেকে একটা জিনিস বুঝলাম – আমাদের কেবল একটা করে পরিচয় নয়। একটা ভালো নাম, সঙ্গে হয়তো একটা ডাক নাম আমাদের দেওয়া হয়েছে জন্মের কিছু পরে। আমাদের অন্যান্য পরিচয় তখন প্রকাশ পায় নি। নাম যেন সুটকেসের হাতলের মতো, ওটা তোলার জন্য লাগে, নাম লাগে ডাকার জন্য। সুটকেসের ডালা খুললে ভেতরে দেখতে পাও কত জিনিস আছে। তেমনি তোমার নিজের গল্পের ডালা খুললে বেরিয়ে আসবে তোমার অনেক পরিচয়।

এ হলো পরিচয়ের ডালা খোলার খেলা।

আমার আত্মপরিচয়

পরের দিন খুশি আপা, সবাইকে অভিনন্দন জানিয়ে বললেন, যে তোমরা এখন মানুষের আত্মপরিচয়ের মৌলিক উপাদানগুলো চিহ্নিত করার যোগ্যতা অর্জন করেছো। অনুভব বললো, হ্যাঁ আপা, রুমানার আত্মপরিচয়ের ছক তৈরির অভিজ্ঞতা ব্যবহার করে আমরা নিজেদের আত্মপরিচিতি পত্র তৈরি করব। মিলি বললো, সেই সাথে কয়েকজন বরেণ্য মানুষ, যেমন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বেগম রোকেয়া, আর বিজ্ঞানী নিউটনের পরিচিতি পত্রও তৈরি করতে চাই।

বিখ্যাত মনীষীদের পরিচয়ের ছক তৈরি করি

এবার বিখ্যাত মনীষীদের পরিচয়ের ডালা খোলার পালা। চলো প্রথমে আমরা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সংক্ষিপ্ত জীবনীটা পড়ে সেখান থেকে তার পরিচয়ের ছক তৈরি করে একটু অনুশীলন করে নেই। নিচে দেয়া বঙ্গবন্ধুর জীবনীটা দলে ভাগ হয়ে দ্রুত পড়ে নিই আর পরিচিতিসূচক শব্দগুলোর নিচে দাগ দিয়ে রাখি। সেগুলো তাঁর পরিচয়ের ছক তৈরিতে সাহায্য করবে। ছক তৈরি হয়ে গেলে ওরা গলগতভাবে সেগুলো উপস্থাপন করলো এবং দৃশ্যমান জায়গায় টানিয়ে দিলো। সবশেষে মনীদের পরিচয়ের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিতর্ক প্রতিযোগিতা বা আলোচনা করলো

ছেলেবেলার মুজিব

১.

শেখ মুজিবুর রহমান। এই নামটি তুমি জানো। অনেকবার শুনেছো। তাঁর অনেক ছবিও নিশ্চয় দেখেছো। একটি ছবি বেছে নিয়ে বড়দের সাহায্যে বাঁধিয়ে নিতে পার।

সেটা তোমার পড়ার টেবিলে রাখতে পার। সামনের দেওয়ালেও টাঙাতে পার। অথবা বাসার কোনো সুন্দর জায়গায় ঝুলিয়ে দিতে পার।

মানুষ ভালোবেসে তাঁকে ডাকে বঙ্গবন্ধু। তাই আমরা বলি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

তুমি বঙ্গবন্ধুর যে ছবিটা বাছাই করেছ তার নিচে ঠিকভাবে তাঁর নাম এবং দুটি তারিখ লিখবে – ১৭ই মার্চ ১৯২০ – ১৫ই আগস্ট ১৯৭৫।

এ দুইটি তারিখ কেন বলো তো? হয়তো অনেকেই আন্দাজ করতে পারছো, প্রথমটি জন্ম তারিখ ও সাল আর দ্বিতীয়টি মৃত্যু তারিখ ও সাল।

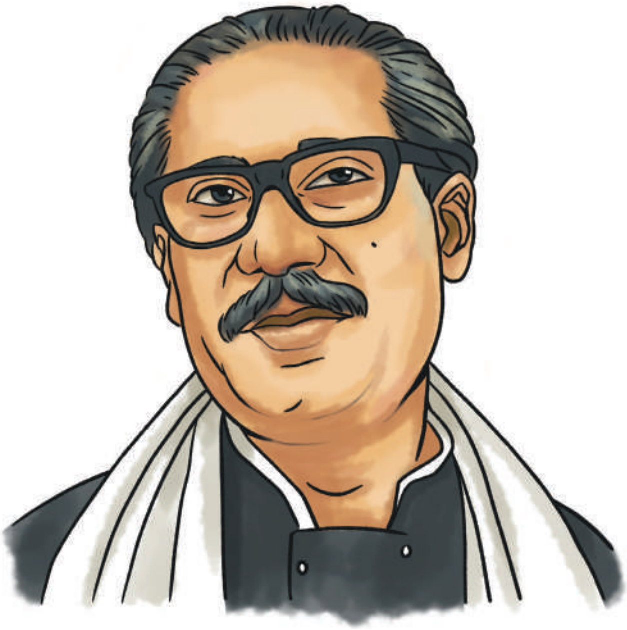

তিনি আমাদের জাতির পিতা।

আমরা তাঁকে কেন জাতির পিতা বলি জানো?

তিনি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়ে গেছেন, কখনও ভয় পেয়ে পিছু হটেন নি, ওদের সাথে মন্ত্রিত্ব বা কোনো কিছুর বিনিময়ে আপোস করেন নি । তিনি নিজের জন্যে কখনও কিছু চান নি, এমনকি নিজের জীবনের পরোয়া করেন নি। ওদের ষড়যন্ত্র, নির্যাতন, মামলা কিছুতেই তিনি টলেন নি। এমন নেতা এদেশের মানুষ আগে কখনও দেখে নি। তাই সবাই তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছিল। জান তো বাঙালি আগে কখনও যুদ্ধ তেমন করে নি। তিনিই আমাদের সবাইকে এক করলেন আর বীরের জাতিতে পরিণত করলেন। বঙ্গবন্ধু না হলে এমনটা হত না, তিনি নয়তো কে জাতির পিতা হবেন?

চলো আজকে আমরা সে মানুষটা ছেলেবেলায় কেমন ছিলেন সে গল্পটা শুনি

২.

টুঙ্গিপাড়া – বাংলাদেশের একটা গ্রাম। সে গ্রামে একটি নদী আছে – মধুমতি। ধানক্ষেত, পুকুর, দিঘি, বিল আর ঝোপঝাড় বনবাদাড় নিয়ে সে নিভৃত বাংলার শান্ত এক গ্রাম। আর দশটা গাঁয়ের মতো সেখানেও মাছ পাওয়া যেত প্রচুর, পাখির কলকাকলিতে থাকত মুখর। গরু-বাছুর চড়ত মাঠে। পাড়ায় কিছু দালান, মাটির দাওয়া টিনের ছাউনি ঘর, বাঁশ-বেড়ার ঘর, ভ্যান্না পাতার ছাউনি কুঁড়েঘরও ছিল। ছিল না পাকা রাস্তা, বিদ্যুৎ, গাড়ি। লোকে চলাচল করত পায়ে হেঁটে। আর ছিল নৌকা – নানা রকম।

এই গাঁয়ে ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ শেখ লুৎফর রহমান ও সায়েরা খাতুনের এক পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। প্রথম সন্তান, তাই পরিবারে আনন্দের ঢেউ।

নাম রাখা হয় মুজিবুর রহমান, বংশের উপাধি শেখ থাকবে নামের আগে। বাবা-মায়ের মুখে মুখে ডাকনাম

হয়ে গেল খোকা। ছোট খোকা বড় হচ্ছে মায়ের সাথে গ্রামে, টুঙ্গিপাড়ায়। ছোটবেলা থেকেই খেলাধূলায় ঝোঁক ছেলেটির। তার ছিল ছোটদের দল। খোকাই তাদের নেতা। কারো গাছের আম পেড়ে খায়, কারো গাছের ফুল তুলে নেয়, আর থেকে থেকে তারা দল বেঁধে খেলায় মেতে ওঠে। একসময় ফুটবল খেলতে শুরু করে। খোকা বেশ ভালোই খেলে।

গ্রামের স্কুলেই ভর্তি করে দেওয়া হয় শিশু মুজিবকে। এখানে তৃতীয় শ্রেণির পাঠ শেষ করার পরে বাবা তাকে নিয়ে আসেন গোপালগঞ্জ শহরে, নিজের কাছে রেখে পড়াবেন। বলা হয় নি বুঝি, বাবা লুৎফর রহমান এখানে সরকারি অফিসে কেরানি। বলা হয় সেরেস্তাদার – ফার্সি শব্দ। এক কালে ফার্সি ছিল রাষ্ট্রভাষা – মানে সরকারের অফিস-আদালতের ভাষা।

এবার মুজিব চলল গোপালগঞ্জ শহরে, হাইস্কুলে পড়বে। সারাক্ষণের বন্ধুদল আর অতিচেনা গাছপালায় ছাওয়া পুকুর-বিল ঘেরা মায়ের গন্ধমাখা টুঙ্গিপাড়ার মায়াভরা দিন পিছনে ফেলে মুজিব এল গোপালগঞ্জ শহরে। ভর্তি হলো গোপালগঞ্জ পাবলিক স্কুলের ক্লাস ফোরে। থাকে বাবার সাথে।

বাবার হাত ধরেই সপ্তাহের ছুটিতে আর স্কুলের লম্বা বন্ধের সময় ফেরে গাঁয়ে মায়ের কোলে। মাকে ছেড়ে চেনা পরিবেশ ছেড়ে থাকতে কষ্ট হলেও একসময় সয়েও গেছে। নতুন জায়গায় নতুন নতুন বন্ধুও হয়েছে।

শিশু মুজিব কিন্তু মোটেও কেবল পড়া আর পরীক্ষা নিয়ে সময় কাটিয়ে দেয় নি। নানা দিকে তার উৎসাহ – খেলাধূলায় সবচেয়ে বেশি। তার মধ্যে ফুটবল সবার উপরে। বড় হয়ে ঐ সময়ের কথা তিনি নিজেই লিখেছেন –ছোট সময়ে আমি খুব দুষ্ট প্রকৃতির ছিলাম। খেলাধুলা করতাম, গান গাইতাম, এবং খুব ভাল ব্রতচারী করতে পারতাম।

ভাবো তো, আমাদের বঙ্গবন্ধু গানও গাইতে পারতেন। তিনি যে বরাবর গান পছন্দ করতেন সে পরিচয় আমরা পরেও পেয়েছি। তোমরা তাঁর লেখা 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' পড়লে এছাড়াও তাঁর জীবনের আরও অনেক কথা জানতে পারবে। বড় হয়ে অবশ্যই পড়বে।

৩.

কিন্তু হঠাৎ ছন্দপতন। প্রাণবন্ত শিশুটা হঠাৎ করেই এক কঠিন রোগে আক্রান্ত হলো – বেরিবেরি। রোগের নামটা মজার, কিন্তু স্বভাবটা খারাপ। সবাই দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল, এ সময় লেখাপড়া বন্ধ করে দু'বছর তাঁর চিকিৎসা চলে। ডাক্তার দেখাতে কলকাতা যেতেন আর বাকি সময় গাঁয়ে মা আর ফুফুদের সেবায় ভালো হয়ে উঠতে থাকেন। দুইবছরের চিকিৎসায় বেরিবেরি থেকে ভালো হলেও এবার দেখা দিল গ্লুকোমা, চোখের অসুখ। আগের রোগে হার্ট দুর্বল হয়েছে, এবারে চোখের দৃষ্টি কমে গেল। চিকিৎসা চলল আবারও কলকাতায়। এই মহানগরীই তখন অবিভক্ত বাংলার রাজধানী। ভালো ডাক্তার, হাসপাতাল, বাজার-সওদা, স্কুল-কলেজ সব কিছুর কেন্দ্র তখন কলকাতা।

অসুখের কারণে লেখাপড়ায় বেশ পিছিয়ে পড়তে হলো। ১৯৩৬ সালে আবার স্কুলে ফেরা। এবারে মাদারীপুর হাইস্কুলে, কারণ ততদিনে বাবা লুৎফর রহমান বদলি হয়ে গেছেন মাদারীপুরে। এখানেও তিনি সেরেস্তাদার অর্থাৎ আদালতের প্রধান কেরানি। কিন্তু এসময় মুজিবের চোখের অসুখ আবার বেড়ে গেল। কলকাতার ডাক্তার অপারেশন করতে বললেন। বলেছেন তাড়াতাড়ি না করলে অন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। তাই দ্রুতই

দুই চোখের অপারেশন করতে হলো। ভালো হয়ে চশমা নিতে হলো এবং সেই ১৫/১৬ বছর বয়স থেকে তাঁকে সবসময় চশমা পরতে হয়েছে।

এভাবে লেখাপড়া আবার ঠিকভাবে শুরু করতে করতে ১৯৩৭ সাল এসে গেল। বালক মুজিব পুরোনো স্কুলে আর যেতে চাইল না। বন্ধুরা যে তাকে পেছনে রেখে এগিয়ে গেছে। এই সময় কিছুদিন তার বাসায় পড়ার ব্যবস্থা হলো। কাজী আবদুল হামিদ নামে এমএসসি পাশ একজনকে মাস্টার হিসেবে বাড়িতেই রেখে দিলেন বাবা। সেকালে এমন ব্যবস্থা প্রায় সব শিক্ষানুরাগী পরিবারেই ছিল। হামিদসাহেব পড়ানোর পাশাপাশি গরিব ছাত্রদের সহায়তা দেওয়ার জন্যে ‘মুসলিম সেবা সমিতি’ গড়ে তুললেন। সেকালে মুসলমানরা একটু পিছিয়ে ছিল। বেশির ভাগ মানুষ ছিল গরিব চাষি, লেখাপড়ার খবরই রাখত না, ছেলেমেয়েদের পড়ানোর সঙ্গতিও ছিল না।

বালক মুজিব এবং আরও ছেলেরা মিলে বাড়ি বাড়ি ঘুরে চাল সংগ্রহ করত। সেই চাল বিক্রি করে গরিব ছাত্রদের বই-খাতা দেওয়া হতো, পরীক্ষা ও অন্যান্য খরচ দিয়েও সাহায্য করা হতো। হায়, কী দুর্ভাগ্য হঠাৎ করেই অসুখে ভুগে শিক্ষক হামিদসাহেব মারা যান। কিন্তু তাঁর যোগ্য শিষ্য মুজিব আছে না! ততদিনে বালক মুজিব পরের জন্যে খাটায় উৎসাহ পেয়ে গেছে।

খেয়াল করেছ বালকের কয়েকটি বিশেষ গুণ – তার সাহস ছিল, গরিবের প্রতি ছিল দরদ, নেতা হওয়ার গুণ ছিল এবং দায়িত্ব পালনে নিষ্ঠা ছিল প্রবল। হয়ত কখনও কখনও একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলত, কিন্তু পরে নিজেই ভুল বুঝতে পারত। বয়সও তো কম ছিল তখন।

৪.

১৯৩৮ সালের ঘটনাটা না বললেই নয়। বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে একজন রাজনৈতিক নেতা হিসেবে সর্বপ্রথম জনগণের মন জয় করতে পেরেছিলেন বরিশালের এ. কে. ফজলুল হক (১৮৭৩-১৯৬২)। তাঁকে মানুষ সম্মান করে ডাকত শের-এ-বাংলা অর্থাৎ বাংলার বাঘ। লম্বা চওড়া মানুষ। তিনি তখন বাংলার প্রধানমন্ত্রী। আর শহীদ সোহরাওয়ার্দী (১৮৯২-১৯৬৩)– আরেকজন বড় মাপের নেতা, তখন শ্রমমন্ত্রী। ঠিক হলো নেতাদের নিয়ে বড় করে সভার আয়োজন হবে। সঙ্গে থাকবে একটা প্রদর্শনী, এতে দোকানপাটের সঙ্গে জেলার কৃষি আর কুটির শিল্পের নমুনাও থাকবে। যারা এসব আয়োজন করবে, দেখাশুনা করবে সেই স্বেচ্ছাসেবকদের নেতা হলেন শেখ মুজিব।

সব ভালোভাবে হয়ে গেল। সভা শেষে নেতাদের বিদায় দেওয়ার সময় মুজিব সামনে এগিয়ে এসে দুই নেতাকে স্কুলের ছাত্রাবাসের ছাদ মেরামত করে দেওয়ার দাবি জানালো। কারণ বর্ষায় ছাদের ফুটো দিয়ে পানি পড়ে, ছাত্রদের খুব অসুবিধা হয়। তাঁর শিক্ষকরা তো ছাত্রের সাহস দেখে তাজ্জব, ভয়ও পেয়েছিলেন নেতারা কিছু মনে করেন কিনা এই ভেবে। কিন্তু প্রকৃত নেতা হয়ত এই তরুণের মধ্যে ভবিষ্যতের নেতার গুণই দেখতে পেয়েছিলেন।

খেলাধূলা আর কাজকর্মে ডুবে থাকতে থাকতেই চলে এলো স্কুলপর্ব শেষে আজকের এসএসসির মতো সেকালের প্রবেশিকা বা ম্যাট্রিক পরীক্ষার সময়। ১৯৪১ সালে ম্যাট্রিক পাশ করলেন মুজিব। তারপরে কলেজের পড়া। পাড়ি দিলেন কলকাতায়।

আমার আত্মপরিচয়ের ছক তৈরি করি

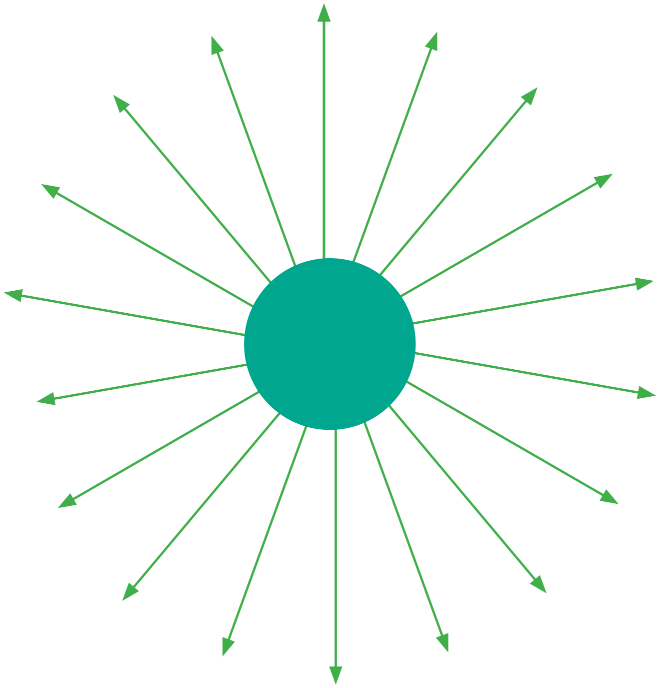

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন: নারী জাগরণের দিশারী

মেয়েরা ঘরের ভেতর বন্দি হয়ে আছে, তাদের লেখাপড়া করার সুযোগ নেই, বাইরের পৃথিবীর সাথে নেই কোনো রকম যোগাযোগ, ছোট্ট ঘরটাই তাদের কাছে পৃথিবী—এমনটি কি এখন ভাবা যায়? অথচ এক সময় এটাই ছিল স্বাভাবিক। মেয়েদের জীবন ছিল নিষেধের দেয়াল দিয়ে ঘেরা। এমনই এক অসহনীয় সামাজিক পরিবেশে জন্ম বেগম রোকেয়া সাখওয়াত হোসেনের , ১৮৮০ সালের ৯ ডিসেম্বরে।

রোকেয়া জন্মেছিলেন সম্ভ্রান্ত পরিবারে। রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামে ছিল তাঁদের বিশাল জমিদার বাড়ি। প্রাচীরঘেরা এই বাড়িটি ছিল প্রায় সাড়ে তিনশ বিঘা এলাকা জুড়ে। রোকেয়ার বাবা জহিরুদ্দিন মুহম্মদ আবু আলী সাবের ছিলেন এই বংশের শেষ জমিদার। রোকেয়ার মায়ের নাম ছিল রাহাতুন্নেসা চৌধুরী। তাঁদের পাঁচ সন্তানের মধ্যে বেগম রোকেয়া ছিলেন চতুর্থ। বাড়িতে সবাই তাঁকে রুকু বলে ডাকতো।

জমিদার পরিবারে প্রচুর ঐশ্বর্যের মধ্যে বড় হচ্ছিলেন রোকেয়া। তাঁদের পরিচর্যার জন্য ছিল পরিচারিকার দল। তবুও তাঁর ছেলেবেলাটা মোটেই আনন্দের ছিল না। এমন খাঁচায় বন্দি পাখির জীবন কারই বা ভালো লাগে? শুধু যে ছেলেদের সামনে বের হওয়া বারণ তা নয়, পরিবারের বাইরে অন্য কোনো মহিলা বেড়াতে এলেও বড়রা চোখের ইশারায় সরে যেতে বলতেন। পরিবারে মেয়েদের লেখাপড়া শেখা মানে শুধু কোরান শরিফ মুখস্থ করা।

বড় ভাই ইব্রাহিম সাবের কবিতা আবৃত্তি করতেন চমৎকার। রোকেয়ার বড় বোন করিমুন্নেসার লেখাপড়ায় ছিল দারুণ উৎসাহ। ইব্রাহিম লুকিয়ে তাঁকে পড়াতেনও। এক সময় একথা জেনে গেলেন তাঁদের বাবা এবং বাইরের লোকজন। বাবা বাধ না সাধলেও ক্ষেপে গেল সমাজ। করিমুন্নেসার বিয়ে দেওয়াই মুশকিল হয়ে গেল। ব্যস, বন্ধ হয়ে গেল করিমুন্নেসার লেখাপড়া।

তারপরও রোকেয়াকে বাংলা বর্ণের সাথে পরিচয় করালেন করিমুন্নেসা। আর পরিবারের নিষেধ অমান্য করে রোকেয়াকে ইংরেজি শেখালেন বড় ভাই ইব্রাহিম। অনেক রাতে পুরো বাড়িটা যখন ঘুমিয়ে, তখন মোম জ্বালিয়ে ইব্রাহিম আর রুকু লেখাপড়া করতেন। এভাবেই বেগম রোকেয়া আরবি, ফারসি, উর্দুর পাশাপাশি বাংলা, ইংরেজি লিখতে ও পড়তে শিখেছিলেন। সকল বাধাবিপত্তি দূরে ঠেলে সামনে এগিয়ে যাওয়ার এই ছিল শুরু।

রোকেয়ার বয়স যখন আঠারো তখন তাঁর বিয়ে হলো খান বাহাদুর সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের সাথে। পেশায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সাখাওয়াতের বয়স ছিল তখন চল্লিশ। বিহারের এক দরিদ্র পরিবারে তাঁর জন্ম হলেও সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় তিনি দারিদ্র্যকে জয় করেছিলেন। স্বভাবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী। তিনি ছিলেন অবাঙালি, তবে হুগলি কলেজে বাঙালি সহপাঠীদের কাছে বাংলা শিখেছেন। আদর্শ চরিত্রের সাখাওয়াতকেই রোকেয়ার স্বামী হিসেবে সকলের পছন্দ হলো।

বিয়ের পর স্বামীর সঙ্গে তিনি চলে এলেন ভাগলপুরে। এখানেও মুসলিম মেয়েদের দুরবস্থা রোকেয়াকে ভীষণ কষ্ট দিল। তিনি অনুভব করলেন, মেয়েরা যদি শিক্ষার আলো না পায় তাহলে কখনও তারা এই শৃঙ্খল ভেঙে বেরিয়ে আসতে পারবে না। এ ব্যাপারে তিনি স্বামীর সাথে প্রায়ই আলাপ করতেন।

স্বামীর সহযোগিতা পেয়ে রোকেয়ার ইংরেজি ভাষাচর্চায় যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। ইংরেজিতে অনেক মূল্যবান বই ও সাময়িকপত্র তিনি রোকেয়াকে পড়তে দিতেন। ফলে স্বামীর সরকারি কাজেও রোকেয়া সাহায্য করতে পারতেন। বিয়ের পর দুই কন্যা সন্তানের মা হয়েছিলেন রোকেয়া। কিন্তু অল্প বয়সে মারা যায় সন্তান দুটি।

সাংসারিক কাজের ফাঁকে লিখলেন ইংরেজিতে 'Sultana's Dream' নামে একটি কাহিনি। সাখাওয়াত হোসেন সেই লেখা পাঠিয়ে দিলেন একটি সাময়িকপত্রে এবং কোনো ধরনের পরিমার্জনা ছাড়াই তা ছাপা হলো।

এ সময় সাখাওয়াত হোসেনের শরীর খুব একটা ভালো যাচ্ছিল না। তাঁর মন বললো, হঠাৎ তাঁর মৃত্যু হলে রোকেয়া খুব নিঃসঙ্গ হয়ে পড়বেন।

এ থেকেই সাখাওয়াত একটি মেয়েদের-স্কুল প্রতিষ্ঠার কথা ভাবলেন এবং তাঁর সঞ্চিত অর্থ থেকে দশ হাজার টাকা আলাদা করে রাখলেন স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য। এর কিছুদিন পর ১৯০৯ সালের ৩রা মে তিনি মারা যান।

স্বামীর মৃত্যুর পাঁচ মাস পর ভাগলপুরেই বেগম রোকেয়া প্রতিষ্ঠা করেন 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল'। শুরুতে ছাত্রীর সংখ্যা ছিল পাঁচ। তবে পারিবারিক কিছু জটিলতার কারণে তাঁকে ভাগলপুর ছেড়ে কলকাতায় চলে আসতে হলো। এখানেই ১৩ নম্বর ওয়ালিউল্লাহ লেনে ১৯১১ সালের ১৬ মার্চ থেকে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা পেল 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল'। ৮ জন ছাত্রী নিয়ে শুরু করলেও ক্রমে ছাত্রী সংখ্যা বাড়তে লাগল।

রোকেয়ার কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রি ছিল না। তারপরও তিনি স্কুলের কাজে কোনো ত্রুটি হতে দেন নি। তিনি বলেছেন, 'শুধু পুঁথিগত বিদ্যাই নয়, বালিকাদিগকে নানাভাবে দেশ ও জাতির সেবায় এবং পরোপকারব্রতে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলাও আমাদের প্রধান একটি উদ্দেশ্য।'

স্কুল চালানোর পাশাপাশি অব্যাহত ছিল রোকয়োর সাহত্যি র্চচা। তিনি একাধারে কবিতা, গল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধ লিখেছেন। সবখানেই সত্য ও ন্যায়ের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা প্রকাশ পেয়েছে। প্রবন্ধ লিখে তিনি অত্যন্ত স্পষ্ট ও কড়া ভাষায় নারী সমাজরে ওপর যে অন্যায় জুলুম করা হয় তার সমালোচনা করেছেন।

১৯১৬ সালে তিনি আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম বা মুসলিম মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল সমাজ ও রাষ্ট্রে মেয়েদের ভূমিকা প্রতিষ্ঠা করা।

নারী শিক্ষাকে জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন বেগম রোকেয়া। তাঁর রচিত সাহিত্যেও তিনি এই আদর্শেরই প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। তিনি বারবার বলতে চেয়েছেন, নারী সমাজকে জাগতে হবে, নইলে মুক্তি নেই। তাঁর আরেকটি আদর্শ ছিল সত্যনিষ্ঠা। তিনি বলেছেন, 'সত্য প্রিয় হোক, অপ্রিয় হোক, সত্যকে বুঝব, খুঁজব এবং গ্রহণ করব।'

১৯৩২ সালের ৯ ডিসেম্বর। সেদিন ছিল রোকেয়ার ৫২তম জন্মবার্ষিকী। খুব সকালে তিনি ঘুম থেকে উঠে ওজু করলেন। হঠাৎ বুকে ব্যথা হলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই তা নিল প্রচন্ড রূপ। এক সময় তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন।

রোকেয়া চলে গেছেন, কিন্তু রেখে গেছেন তাঁর আদর্শ। সে আদর্শ নারী সমাজের উন্নতির আদর্শ। নারী সমাজের উন্নতির জন্য প্রয়োজন আত্মমর্যাদাবোধ, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, জ্ঞান আর সাধনা। একমাত্র শিক্ষাই নারীকে এনে দিতে পারে এই অর্জন।

লাস্ট বয় থেকে সেরা বিজ্ঞানী

গ্রামের বাইরে শীতের বিকেলে স্যাঁতস্যাঁতে অন্ধকার নামে। সেই অন্ধকারে একটি ছেলে চেষ্টা করছে ঘুড়ি ওড়াতে। কাঠি আর কাপড়ের তৈরি ঘুড়ি – ছেঁড়া কাপড় জোড়া দিয়ে দিয়ে তার আবার বিরাট লম্বা লেজ। শুধু তাই নয়, সেই লেজের আগায় ঝোলানো ছোট্ট একটি আলো।

ছেলেটি ভাবছে, যদি ঘুড়ি আকাশে ওড়ে, তখন আলো দেখে সবাই হয়তো ভাববে, বুঝি একটি নতুন তারাই উঠল আকাশে। কেউ হয়তো ভাববে, এটা রোজ কেয়ামতেরই পূর্বলক্ষণ। ছেলেটি ভাবে আর তার ঠোঁটের কোনায় দুষ্টু হাসি খেলে যায়।

কিন্তু সে ঘুড়ি কি আকাশে ওড়ে? আলোর ভারে লেজ তার পড়েছে ঝুলে। যতবারই সুতো ধরে টানে, ততবারই ঘুড়িটা গোত্তা খেয়ে মাটিতে পড়ে। শেষ পর্যন্ত তাকে হাল ছেড়ে দিতে হয়।

কথাটা কেমন করে গ্রামের আরও দুচারজন লোকের কানে গিয়ে ওঠে। যারা শোনে, তারা বলাবলি করে: যেমন ব্যাটা আহাম্মক আমাদের বোকা বানাতে গিয়েছিল, তেমনি তার উচিত ফল হয়েছে। মূর্খটা এসব পাগলামি রেখে মাস্টারের কথামতো স্কুলের পড়া পড়লেই তো হতো।

এসব কথা ছেলেটি বড় হয়ে নিজেই তার আত্মজীবনীতে লিখে গেছে। বিলেতের স্কিলিংটন বলে একটি জায়গায় গ্রামের স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণিতে সে ছিল লাস্ট বয়। মাস্টাররা রায় দিয়েছিল এর মাথায় গোবর ছাড়া আর কিছু নেই। সহপাঠীরা তাকে নিয়ে ঠাট্টা-মশকরা করত।

কিন্তু বড় হয়ে সেই ছেলেটিই এমন সব আবিষ্কার করে বসল—যা দেখে দুনিয়ার সব বড় বড় বিজ্ঞানীরা থ' খেয়ে গেলেন। তাকে গুরু বলে মানলেন। তাঁকে করা হলো বিলেতের পার্লামেন্টের সদস্য, সম্রাট তাঁকে ভূষিত করলেন 'নাইট' বা 'স্যার' উপাধি দিয়ে। পণ্ডিতদের সেরা প্রতিষ্ঠান রয়্যাল সোসাইটি তাঁকে সভাপতি নির্বাচিত করলেন। সেই ছেলেটির নাম ছিল আইজাক নিউটন।

নিউটনের জন্ম হয়েছিল ১৬৪২ সালের ২৫শে ডিসেম্বর। বাপ ছিলেন কৃষক, নিউটন জন্মাবার আগেই তিনি মারা যান। গাঁয়ের স্কুলেই ছোটবেলায় পড়াশোনা, কিন্তু পড়ার চেয়ে সূর্যঘড়ি, জলঘড়ি, এমনিতরো কলকব্জা নিয়ে নাড়াচাড়ার ঝোঁকই তাঁর বেশি দেখা যেত।

যখন তাঁর বয়স ষোল বছর, তখন একদিন বিলেতে ভীষণ ঝড় হয়। সে কী প্রচণ্ড হাওয়ার দাপট। বিলেতের ইতিহাসে এত বড় ঝড় খুব কমই হয়েছে। নিউটনের তখন একটা শখ ছিল, হাওয়ার বেগ মাপার। হাওয়ার

যখন দাপট খুব বেশি, এমনি সময় তিনি হঠাৎ বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। যে দিকে হাওয়ার প্রবাহ, সেদিকে দিলেন এক লাফ; যেখানে পা গিয়ে পড়ল, সেখানে দিলেন একটা দাগ। তারপর ঠিক উল্টো দিকে দিলেন আর এক লাফ, আর মাটিতে দিলেন আরেক দাগ। পাড়া-প্রতিবেশীরা জানালার ফাঁক দিয়ে দেখল এই পাগলের অবাক কাণ্ড।

আত্মীয়-স্বজন ভেবেছিল, কৃষকের ছেলে কৃষকই হবে। কিন্তু ছেলের ঝোঁক বিজ্ঞানের বই যোগাড় করে পড়ার আর নানা রকম অদ্ভুত অদ্ভুত পরীক্ষা করার দিকে। একদিন বাজারে পাঠানো হয়েছে নিউটনকে; কয়েকটি ভেড়া, কিছু ডিম, আরো অন্যান্য জিনিস বিক্রি করে আসার জন্যে। কিন্তু তিনি আরেকটি লোককে পাঠিয়ে দিলেন তাঁর হয়ে এগুলো বেচে দিতে; আর নিজে এক ঝোপের তলায় বসে মশগুল হয়ে পড়তে লাগলেন একটা অঙ্কের বই।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর যখন তাঁকে সেখানে পাওয়া গেল, তখন তো বাড়িতে একটা রীতিমতো কুরুক্ষেত্র কাণ্ড। কী করা যায়, এমন একটি অপদার্থ ছেলেকে নিয়ে? তাকে উদ্ধার করলেন এক চাচা। তিনি বললেন, দাও একে কলেজে পাঠিয়ে—সেখানে বসে যত খুশি অঙ্ক কষুক। তাই তাঁকে পাঠানো হলো কেমব্রিজে।

সত্যি সত্যি তিনি কলেজে গিয়ে অঙ্কে খুব ভালো করলেন। প্রথম বছরেই তিনি গণিতের এক নতুন ক্ষেত্র ক্যালকুলাস আবিষ্কার করে ফেললেন। লিখে রাখলেন সে সব। কিন্তু কাউকে বললেন না কিছুই। চাঁদের

চারদিকে মাঝে মাঝে চাকতির মতো আলোর প্রভা (চাঁদের সভা) দেখতে পাওয়া যায়। তা যে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ভেসে থাকা পানির কণার ওপর আলো পড়ে তৈরি হয়, তাও তিনি এই কলেজের প্রথম বছরেই আবিষ্কার করলেন।

তেইশ বছর বয়সে নিউটন কলেজের পড়া শেষ করে গণিতের অধ্যাপক হলেন। কিন্তু পরের বছরই বিলেতে লাগল বিরাট রকম প্লেগের মড়ক। স্কুল-কলেজ সবই বন্ধ হয়ে গেল। কাজেই নিউটনও গ্রামে ফিরে গিয়ে তাঁর গবেষণার কাজে মন দিলেন। তাঁর মনে যত সমস্যা দেখা দিতে লাগল, গণিতের হিসেবে ফেলে তার সব কিছুর মীমাংসা করার চেষ্টা করতে লাগলেন। এই গ্রামে বসে বসে পঁচিশ বছর বয়স হওয়ার আগেই নিউটন তাঁর সমস্ত যুগান্তকারী আবিষ্কারের ভিত দাঁড় করালেন।

গ্রহেরা কী করে সূর্যের চারদিকে ঘোরে, এ প্রশ্নের মীমাংসা করতে গিয়ে তিনি আবিষ্কার করলেন মহাকর্ষ তত্তোর।

গল্প আছে গাছ থেকে আপেল মাটিতে পড়তে দেখেই কথাটা তাঁর মাথায় এসেছিল। নিউটন ভাবলেন, গাছ থেকে আপেল যদি মাটিতে পড়ে তাহলে চাঁদ পৃথিবীতে না পড়ে শূন্যে ভেসে থাকে কী করে। তাঁর মনে হলো, চাঁদকেও নিশ্চয়ই পৃথিবীটা আকর্ষণ করছে, কিন্তু চাঁদ পৃথিবীর চারপাশে ঘুরছে বলেই সেটা পড়তে পারছে না অর্থাৎ পৃথিবীর আকর্ষণটা কাটাকাটি হয়ে যাচ্ছে।

চাঁদ কত বেগে ঘুরলে পৃথিবীর আকর্ষণ কাটাকাটি হতে পারে নিউটন তা অঙ্ক কষে বের করলেন। আর আশ্চর্য! জ্যোতির্বিদরা চাঁদের ঘোরার যে বেগ হিসেব করেছিলেন তার সাথে তাঁর হিসেব হুবহু মিলে গেল। সবাই অবাক হয়ে দেখল নিউটনের মহাকর্ষের তত্ত¡ দিয়ে সারা বিশ্বের গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি হিসেব করা সম্ভব হয়ে উঠেছে।

আলোর দিকে ঝোঁক ছিল তাঁর বরাবর। আলো কী দিয়ে তৈরি—বাতির আলো, সূর্যের আলো, তারার আলো? নাওয়া-খাওয়া বন্ধ করে তিনি আলো নিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলেন।

গ্যালিলিও যে দুরবিন তৈরি করেছিলেন, তার কথা নিউটন জানতেন। দুরবিনের মধ্যে আলোর গতিবিধি তিনি গণিতের মাপজোকের সাহায্যে পরীক্ষা করলেন। তারপর এমন এক নতুন ধরনের দুরবিন তৈরি করলেন, যার ব্যাস ছিল মাত্র এক ইঞ্চি, আর যা লম্বায় ছিল দুইইঞ্চি। কিন্তু তাতে দূরের কোনো জিনিস দেখা যেত চল্লিশ গুণ বড়। এই দুরবিনের মাধ্যমে তাকিয়ে তিনি আবিষ্কার করলেন বৃহস্পতির উপগ্রহদের। এরপর কাচের প্রিজম বা তেশিরা পরকলার সাহায্যে নিউটন দেখলেন সাদা আলোর মধ্যেই আছে সাতরঙা আলোর রঙধনু।

নিউটন ছিলেন খুবই সাদাসিধে রকমের মানুষ। সেকালের বিজ্ঞানীরা নতুন কিছু আবিষ্কার করলে সেটা সঙ্গে সঙ্গে লিখে প্রচার করতেন। কিন্তু নিউটনের এসব দিকে মোটেই মন ছিল না। নিত্য নতুন আবিষ্কার নিয়ে তিনি এমন মশগুল থাকতেন যে, সেসব কথা লিখে ছাপাবার তাঁর ফুরসতই হত না।

নিউটন গবেষণার কাজে কেমন আপনভোলা হয়ে যেতেন, সে সম্বন্ধে অনেক কাহিনি চালু আছে। একবার তাঁর বাড়িতে ছিল এক বন্ধুর খাবার নিমন্ত্রণ। বন্ধু এসে দেখেন নিউটন বাড়ি নেই। টেবিলে একটা রান্না করা মুরগি ঢাকনা চাপা দেওয়া রয়েছে। অপেক্ষা করতে করতে পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট করে দুইঘণ্টা কেটে গেল। এত দেরি দেখে বন্ধু মুরগিটি খেয়ে ফেললেন। থালায় শুধু হাড়গোড়গুলো পড়ে রইল। শেষটায় নিউটন ফিরলে খাবারের ঢাকনাটা খুলে বললেন: 'আমি ভেবেছিলাম এখনো রাতের খাবার খাই নি। কিন্তু এখন দেখছি আগেই খেয়েছি।' তারপর দুই বন্ধুর মধ্যে শুরু হলো দীর্ঘ বৈজ্ঞানিক আলোচনার বৈঠক।

নিউটন নিজের সম্বন্ধে কী বলেছিলেন শুনবে? 'লোকে আমার সম্বন্ধে কী ভাবে, তা আমি জানি নে। কিন্তু নিজের কাছে মনে হয় যেন আমি ছোট শিশুর মতো সাগরের তীরে শুধু নুড়িই কুড়িয়ে বেড়ালাম। বিশাল জ্ঞানের সমুদ্র আমার সামনে অজানাই পড়ে রইল।'

চলো আমরাও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বেগম রোকেয়া আর বিজ্ঞানী নিউটনের জীবনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক জেনে তাদের পরিচয়ের ছক তৈরি করি। বাসায় বা এলাকায় বন্ধুদের সাথে এটা নিয়ে বিতর্ক প্রতিযোগিতা বা আলোচনা করি।

ব্যক্তিগত পরিচয়ের ছক

এবারে খুশি আপা ক্লাসে এক মজার ছবি দেখালেন। এটি গোল চাকতির মত ছক। ছকে নিজের পরিচয়ের জন্য আমাদের নিজেদের বিষয়ে অনেক কিছু লেখার জায়গা রয়েছে। ক্লাসের প্রত্যেকে নিজের বিষয়ে সেখানে লিখলো। হয়ে গেল সবার ব্যক্তিগত পরিচয়ের ছক।

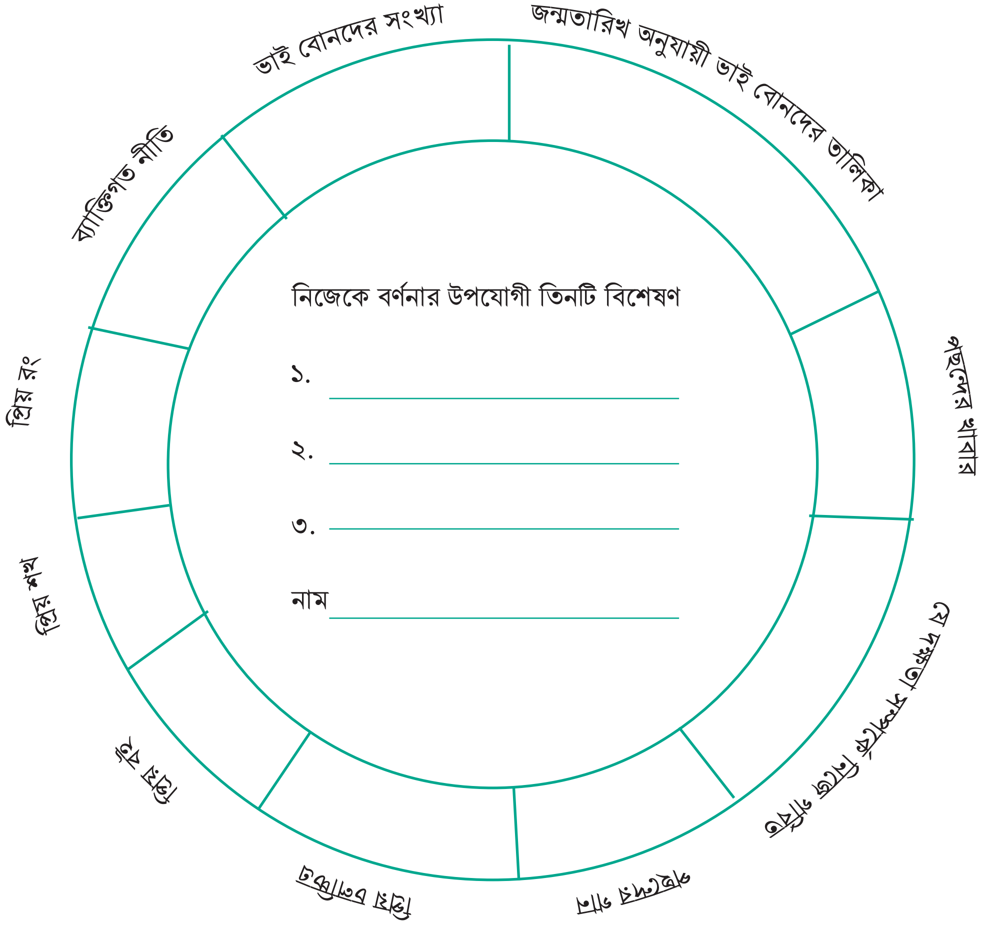

এ পর্যায়ে খুশি আপা ছক ও প্রশ্নের উত্তরগুলো নিয়ে সকলের অংশগ্রহণে একটি সাধারণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করে বললেন, দেখলে তো ব্যক্তিগত পরিচয় মানুষের শুধু দুই/একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে নয় বরং তা আসলে বহুমাত্রিক এবং এক একজন মানুষের আত্মপরিচয়ের ছক এক এক রকমের হওয়াটাই স্বাভাবিক। আমাদের কাছের বন্ধুটির সাথে আমাদের যেমন মিল রয়েছে, তেমনি রয়েছে অমিল। অর্থাৎ আত্মপরিচয়ের ভিন্নতা সত্ত্বেও মানুষ অনেক ভালো বন্ধু হতে পারে।

আমরাও চলো আত্মপরিচয়ের ছকটি পূরণ করি, প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে বের করি এবং বন্ধুদের সামনে তুলে ধরি

আত্মপরিচয়: ব্যক্তিগত পরিচয় ও সংকট

পরদিন ক্লাসে খুশি আপা বললেন, চলো একটা সহজ কাজ দিয়ে শুরু করা যাক আজ।
আচ্ছা, ভেবে দেখো তো, আমরা কি নিজেকেই ভালোভাবে চিনি? 'নিজেকে চেনা' —একটা রীতিমতো খেলাই হতে পারে। তুমি ভাব আমাকে তো সব্বাই চেনে, জানে তো আমার নাম মামুন আসলে আমরা তো সবাই সব্বাইকে চিনি – ঐ তো শাহিন, ওদিকে রুমানা, ওটা গণেশ, দারুণ ফুটবল খেলে।
একটু থামো তো, গণেশকে কেবল নাম দিয়েই চেনো না, ও যে ভালো ফুটবল খেলে সেই গুণ দিয়েও তাকে চেনো। আমরা তো জানিই, নামের আড়ালে তোমাদের আরও পরিচয় লুকিয়ে আছে, সে একটা-দুটো নয় অনেক। সেগুলো সব মিলেই আত্মপরিচয়।
কখনও কখনও মানুষের আত্মপরিচয়ের সংকট হয়। ভাবছ সে আবার কেমন কথা! দুইভাবে হতে পারে এই সমস্যা। প্রথম হলো তুমি নিজেকে যা ভাব অন্যরা তা ভাবছে না। দ্বিতীয়ত, অনেক সময় আমাদের নানা বিষয়ে ঝোঁক বা আগ্রহ থাকে। যেমন, ছবি আঁকা, খেলা, নাচ বা গান করা, কবিতা, গল্প-উপন্যাস পড়া, ইতিহাস, ঐতিহ্য চর্চা প্রভৃতি। কিন্তু আমরা বুঝতেই পারি না কোনটি হবে আমার চর্চার বা অনুশীলনের প্রধান ক্ষেত্র বা বিষয়।
প্রথম সমস্যার একটা চরম কিন্তু মজাদার দৃষ্টান্ত আছে বিদেশি একটি গল্পে। চলো গল্পটা আমরা পড়ে নিই –

যে ভালুকটি ভালুক ছিল না

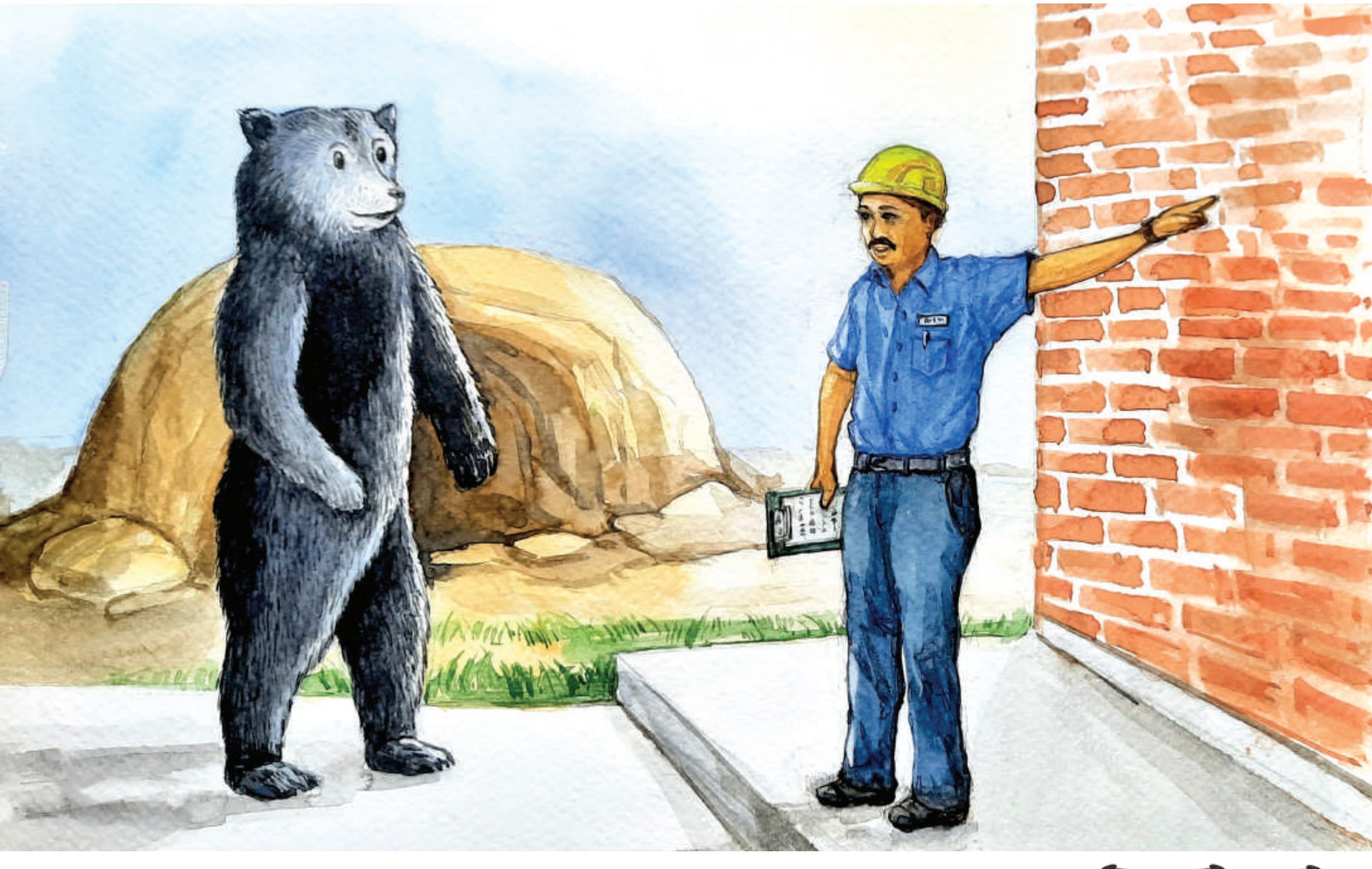

অনেক দিন আগের কথা, হ্যাঁ দিনটা ছিল মঙ্গলবার। ভালুক দেখল শীত আসছে, তাকে কোনো গুহায় গিয়ে লম্বা শীতঘুম দিতে হবে। যা ভাবা তাই সে করল। খুব বেশিদিন হবে না, দিনটা ছিল বুধবার, বিরাট এক কর্মীবাহিনী এলো গুহার কাছে। ভালুক যতদিন ঘুমোচ্ছিল তার মধ্যেই বিরাট একটা কারখানা তৈরি হয়ে গেল সেখানে।

শীত গিয়ে বসন্ত আসতেই ভালুকের ঘুম ভাঙল। সে গুহার বাইরে বেরিয়ে এলো। চারিদিকে তাকিয়ে ওর চোখ তো ছানাবড়া। আরে, বনটা গেল কই? ঘাসগুলোরই বা কী হলো? আর গাছপালা সব? ফুলগুলো? ব্যাপারটা কি? – কীভাবে ঘটল এ কাণ্ড!

'আমি বোধহয় স্বপ্ন দেখছি', ভালুক নিজেকে বলল, 'নিশ্চয় আমি স্বপ্ন দেখছি।' না, এটা মোটেও স্বপ্ন নয়। একেবারে বাস্তব ঘটনা। এমন সময় কারখানার ফোরম্যান বেরিয়ে এসে হাঁক দিয়ে বলল – 'এই-তুমি, যাও তাড়াতাড়ি কাজে যাও।'

ভালুক ঢোঁক গিলে বলল, 'আমি তো এখানে কাজ করি না। আমি তো ভালুক।'

শুনে ফোরম্যান হেসে ফেলল, 'হ্যাঁ কাজ ফাঁকি দেওয়ার জন্যে একটা মানুষের ভালো ছুতো বটে – (ব্যঙ্গ করে) আমি একটা ভালুক।'

ভালুক আবার বলল, 'কিন্তু আমি তো একটা ভালুক।'

ফোরম্যান এবার আর হাসতে পারল না, তার বরং পাগল হওয়ার উপক্রম, 'আমাকে বোকা বানানোর চেষ্টা করবি না, সে বলল। তুই মোটেও ভালুক না। একটা বোকা হাঁদারাম মানুষ যার দরকার দাঁড়ি চাঁছা আর উদ্ভট পশমের কোট খোলা আছে। আমি তোমাকে ম্যানেজারের কাছে নিয়ে যাচ্ছি।'

ম্যানেজারও বলল, 'ভালুকটা একটা গবেট যার দরকার ভালো করে শেভ করা আর সে পরে আছে একটা পশমের কোট'।

ভালুক বলল, 'না, আপনার ভুল হচ্ছে। আমি ভালুকই।' শুনে ম্যানেজারও ভয়ানক চটে গেল।

ভালুকের কথা, 'আপনার এ কথা শুনে আমি খুব দুঃখ পেয়েছি, আমি একটা ভালুকই।'

কারখানার থার্ড ভাইস প্রেসিডেন্ট তো আরও চটে গেলেন, দ্বিতীয় ভাইস প্রেসিডেন্ট তো পাগল হওয়ার উপক্রম। তিনি মহা চটে গেলেন। প্রথম ভাইস প্রেসিডেন্ট রেগে চিৎকার শুরু করে দিলেন, 'তুমি কোনো ভালুক নও। তুমি একটা বোকা মানুষ যার দরকার দাঁড়িগুলো চাঁছা। আর হ্যাঁ, তুমি পরে আছ একটা পশমের কোট। চলো, তোমাকে আমি প্রেসিডেন্টের কাছে নিয়ে যাবো।' ভালুক মিনতি করে বলল, 'আপনাদের ভয়ানক ভুল হচ্ছে, বুঝেছেন, কারণ যতটা আমার মনে পড়ে আমি সবসময়ই ভালুকই ছিলাম।'

তার এ কথাটাই ভালুক আবার বলল কারখানার প্রেসিডেন্টকেও।

প্রেসিডেন্ট উত্তরে বললেন, 'কথাটা বলার জন্যে ধন্যবাদ। তুমি ভালুক হতেই পার না। ভালুক থাকে চিড়িয়াখানায় অথবা সার্কাসে। তাহলে এখানে দাঁড়িয়ে তুমি কীভাবে ভালুক হবে?'

ভালুকের এক কথা, 'কিন্তু আমি একটা ভালুক।'

এবার প্রেসিডেন্ট গম্ভীর হয়ে বললেন, 'তুমি শুধু বোকা মানুষ নও যার দাঁড়ি চাঁছা দরকার, যে পশমের কোট পরে আছ, তুমি একটা গোঁয়ারগোবিন্দ লোক। বেশ, আমি তোমাকে এক্কেবারে প্রমাণ করে দেব যে তুমি মোটেও ভালুক নও।'

প্রেসিডেন্ট মহোদয় তাঁর ভাইস প্রেসিডেন্টদেরসহ ভালুকটাকে গাড়িতে তুললেন। তারা চলল শহরের চিড়িয়াখানায়। চিড়িয়াখানার ভালুকরা ওকে ভালুক বলে স্বীকার করল না, কারণ ভালুক হলে সে তো থাকত খাঁচায়।

ভালুক গরগর করে বলল, 'আমি কিন্তু ভালুক।'

তো সবাই চিড়িয়াখানা থেকে চলল এবার কাছের সার্কাস দলের কাছে। প্রেসিডেন্ট মশাই সার্কাসের ভালুকদের জিজ্ঞেস করলেন, 'এই দ্যাখ তো – এ ভালুক কিনা?

ভালুকরা সমস্বরে বলল, না, ও যদি ভালুক হত তাহলে ও তো মাথায় ছোট্ট হ্যাট পরত, ওর হাতে থাকত ফিতায় বাঁধা বেলুন আর ও চড়তো সাইকেল।

ভালুক জোর দিয়ে বলল, 'না, আমি ভালুকই।

কারখানায় ফিরে এসে প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্টরা ভালুককে অনেক লোকের সাথে একটা বড় মেশিনে কাজে লাগিয়ে দিলো। বেচারা ভালুক ঐ বিশাল যন্ত্রে মাসের পর মাস কাজ করে গেল।

অনেক অনেক দিন পরে, কারখানাটা বন্ধ হয়ে গেল এবং সব লোকজন চলে গেল। ভালুক সবার শেষে বেরুল, বন্ধ কারখানা ছেড়ে বাইরে এসে সে দেখল হাঁসগুলো দক্ষিণে উড়ে যাচ্ছে, গাছ থেকে পাতা ঝরে পড়ছে। সে বুঝল শীত আসছে। তার শীত ঘুমে যাওয়ার সময় এসেছে।

ভালুক একটা গুহা খুঁজে পেয়ে ঢুকতে গিয়ে একটু থমকে দাঁড়াল। 'আমি তো গুহায় যেতে পারি না। আমি তো ভালুক নই। আমি এক বোকা মানুষ, যার শেইভ দরকার আর যে পশমের কোট পরে আছে।'

ঠাণ্ডা বাড়ছে, তুষার পড়তে শুরু করেছে, ভালুক ঠাণ্ডায় কাঁপতে লাগল। 'আমি চাই আমি – আমি যদি ভালুক হতাম!' ভালুক ভাবল।

তারপর হঠাৎ সে উঠে দাঁড়াল, তুষারের ওপর দিয়ে হেঁটে চলল গুহার দিকে। ভিতরটা আরামদায়ক এবং বেশ উম আছে। হিমশীতল বাতাস আর হাড়কাঁপানো শীত তার কাছে ঘেঁষতেই পারছে না। বেশ আরাম লাগছে তার। পাইনের ডালের বিছানায় সে গা এলিয়ে দিল আর শীঘ্রই মহাসুখে ঘুমিয়ে পড়ল আর মধুর স্বপ্ন দেখতে শুরু করল – ঠিক যেমনটা ভালুকরা শীতঘুমে দেখে। যদিও কারখানার ফোরম্যান, ম্যানেজার, থার্ড ভাইস প্রেসিডেন্ট, দ্বিতীয় ভাইস প্রেসিডেন্ট, প্রথম ভাইস প্রেসিডেন্ট, এবং চিড়িয়াখানার ভালুকগুলো এবং সার্কাসের ভালুকগুলো বলেছে বটে সে একটা বোকাসোকা মানুষ যার দরকার দাঁড়িটা চাঁছা আর যে কিনা পরে আছে পশমের কোট। কিন্তু আমার মনে হয় না ভালুক ওদের কথা বিশ্বাস করেছে, তোমরা কি বিশ্বাস করেছ?

না, সে জানত যে সে বোকা মানুষ নয় এবং সে বোকা ভালুকও নয়।

খুশি আপা, কয়েকজনকে স্বেচ্ছায় এসে গল্পটির বিভিন্ন অংশ উচ্চস্বরে সকলের উদ্দেশ্যে পড়ে শোনানোর জন্য আহ্বান করলেন। গল্পটি পড়ে শোনানো শুরু হওয়ার আগেই খুশি আপা সকলকে ছবি আঁকার জন ছোট ছোট কক্ষ সম্বলিত নিচের ছকটি সরবরাহ করলেন। বললেন যে, গল্পটি পড়ে শোনানোর সময় সবাই গল্পের প্রতিটি অংশের মূল বিষয়বস্তু অনুযায়ী ছকে ছবি আঁকবে।

চলো গল্পটি পড়ে আমরাও নিচের ছকে গল্পের মূল অংশগুলোর ছবি আঁকি

গল্প থেকে ছবি আঁকি

ছবি আঁকার ছক:

শিক্ষার্থীরা গল্পটির প্রতিটি অংশের মূল বক্তব্য ছোট বক্সগুলোতে আঁকবে এবং নিচে শিরোনাম লিখবে

সমাজ কীভাবে মানুষের পরিচয়কে প্রভাবিত করে

এরপর খুশি আপা ভালুকের থাবা চিহ্ন- যুক্ত নিচের ছকটি সবাইকে দিলেন।

ভালুকের পরিচয়ের ছক তৈরি করি:

খুশি আপা বললেন, তোমরা ছকটি ব্যবহার করে ভালুকটি কোন কোন শব্দ দিয়ে নিজের পরিচয় প্রকাশ করতে পছন্দ করে এবং অন্যরা ভালুকটির পরিচয় হিসেবে কোন কোন বিষয় মনে করে তার তালিকা তৈরি করবে। যে শব্দগুলো ভালুকটি নিজের পরিচয় হিসেবে পছন্দ করে সেগুলো ভালুকের থাবার ভিতরে এবং যে শব্দগুলো অন্যরা ভালুকের উপর আরোপ করতে চায় তা লিখবে থাবার বাইরে। সেই অনুযায়ী সবাই ছকটি ব্যবহার করে ভালুকের জন্য পরিচয়ের এই ছক তৈরি করলো।

ভালুকের গল্প নিয়ে আলোচনা:

খুশি আপা বললেন, এখন চলো আমরা এই গল্পটির অর্থ কে কী ভাবে বুঝলাম তা নিয়ে একটি আলোচনা করি। আলোচনা চলার সময় খুশি আপা নিচের প্রশ্নগুলো জিজ্ঞাসা করলেন।

- ভালুকটি নিজের পরিচয় বর্ণনা করতে কোন কোন শব্দ ব্যবহার করতো?
- অন্যরা তার পরিচয় বর্ণনা করতে গিয়ে কী কী শব্দ ব্যবহার করতো?
- সময়ের সাথে সাথে কীভাবে ভালুকটির পরিচয় পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল?
- ভালুকটিকে যখন পশমের কোট পরা বোকা মানুষ বলা হচ্ছিল তখন ভালুকটির কেমন লেগেছিলো বলে তোমরা মনে কর?
- গল্পের লেখক এখানে কী বোঝাতে চয়েছেনে?
- আমাদের পরিচয় গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কোন বিষয়টি বেশি গুরুত্বপূর্ণ? আমাদের পরিচয় সম্পর্কে আমরা কী ভাবি তাই, না কি অন্যরা আমাদের সম্পর্কে যা ভাবে তা?

তিনি বললেন, আশা করি, এই আলোচনা থেকে নিজের পরিচয় সম্পর্কে সচেতন হওয়ার পাশাপাশি অন্য মানুষও আমাদের পরিচয়কে কিভাবে প্রভাবিত করে সে সম্পর্কে তোমাদের একটি গভীর উপলব্ধি তৈরি হয়েছে। এরপর তিনি সবাইকে নিচের প্রশ্নগুলো করলেন-

- তুমি কি এমন কিছু মনে করতে পারো যখন তোমাকে কেউ কোন উপাধি/খেতাব বা তকমা দিয়েছে? তখন তোমার কেমন অনুভূতি হয়েছে? তুমি ঐ পরিস্থিতিতে কী আচরণ করেছো?
- এমন কি কখনো ঘটেছে যে তুমি অন্য কাউকে উপাধি/খেতাব বা তকমা দিয়েছো? দিয়ে থাকলে, কেন দিয়েছিলে?
- তোমার মতে আমরা কেন খুব দ্রুত আরেকজনকে উপাধি/খেতাব/তকমা দিয়ে দেই ?
- খুশি আপা বললেন চলো এক কাজ করা যাক আমরা আমাদের এই পরিচয়ের বিষয়ে একটি বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করি।
- বিতর্কের বিষয়: "আমি আমার পরিচয় সম্পর্কে যা ভাবি তাই আমার পরিচয় গড়ে তোলার জন্য গুরুত্বপূর্ণ—অন্যরা কী ভাবলো তা নয়!"
- খুশি আপার ক্লাসের বন্ধুরা বিতর্কের বিষয়ের পক্ষে এবং বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে বির্তক করলো। দুই দল আলোচনা করে প্রতি দল থেকে একজন করে তাদের যুক্তি তুলে ধরলো।

চলো আমরাও উপরের প্রশ্নগুলো নিয়ে বন্ধুদের সাথে বির্তক বা আলোচনা করি।

এ অধ্যায় থেকে আমার শেখা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ-

-
-

মূল্যায়ন: আমরা কতটুকু শিখলাম?

নিচের সারণীতে বাম পাশে কিছু বিবৃতি রয়েছে। আর ডান পাশে রয়েছে ৪ মাত্রার একটি স্কেল। প্রতিটি বিবৃতি ভালোভাবে পড়ে বিবৃতির সাথে কতটা একমত বা ভিন্নমত পোষণ করছি তা নির্দিষ্ট ঘরে টিক চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করি এবং শিক্ষককে দেখাই-

আত্মপরিচয়: ব্যক্তিগত পরিচয় সংক্রান্ত মূল্যায়নের ছক

	সম্পূর্ণ একমত	একমত	ভিন্নমত	সম্পূর্ণ ভিন্নমত
১। সাদিয়া খুব ভালো ক্রিকেট খেলে, সে কবিতা পড়তে ভালোবাসে, তার স্বপ্ন সে একদিন বড় ক্রিকেটার হবে; সাদিয়া পানিতে নামতে খুবই ভয় পায়। তার প্রিয় রঙ নীল, তারা ৩ বোন, সে ফল খেতে ভালোবাসে-এসব কিছু মিলেই সাদিয়ার পরিচয়।				
২। মানুষের পরিচয় শুধু নির্দিষ্ট একটি বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে।				
৩। নীলার প্রিয় খেলা দাবা আর স্যাব্বিরের প্রিয় ফুটবল। নীলার মা ডাক্তার আর সাব্বিরের মা আর্টিস্ট। নীলার কোনো ভাই বোন নেই, সাব্বিরের ২ ভাই এক বোন আছে। নীলা খুব ভালো সাঁতারু, সাব্বিরের পানিতে খুব ভয়। তাদের পরিচয় অনেক ভিন্ন ভিন্ন হলেও তারা ভালো বন্ধু হতে পারে।				
৪। পরিস্থিতির বা অবস্থানের পরিবর্তনে মানুষের কিছু পরিচয় আলাদাভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।				
৫। আমার ব্যক্তিগত পরিচয় অনেকগুলো বিষয় নিয়ে গঠিত।				
৬। আমার ব্যক্তিগত পরিচয়ে যে যে বিষয়ই থাকুক না কেন, আমি আমার আত্মপরিচয় নিয়ে গর্ব অনুভব করি।				
৭। সুং মারমা ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠির এক মেয়ে। সে আমার থেকে দেখতে বেশ ভিন্ন। সে যে খাবার খায় সেটি আমি যে খাবার খাই তা থেকে ভিন্ন। সে মারমা ভাষায় কথা বলে। সব কিছুর সমন্বয়ে তার যে পরিচয় সেটাকে আমি শ্রদ্ধা করি।				
৮। একজন মানুষের আত্মপরিচয়ে অনেক ভিন্ন ভিন্ন বিষয় বা বৈশিষ্ট্য থাকাটা ভালো নয়।				
৯। আমাদের শ্রেণিতে, যে বিজ্ঞান সবচেয়ে পছন্দ করে আবার যে বিজ্ঞান সবচেয়ে অপছন্দ করে দুজনই আমার বন্ধু হতে পারে।				
১০। আমাদের ক্লাসের মীনা প্রায়ই অসুস্থ থাকে বলে তাকে আমরা রুগ্ন মীনা বলে ডাকি। সেতো অসুস্থই তাই তাকে ও নামে ডাকাটা যুক্তিযুক্ত।				
১১। মানুষকে কোনো উপাধি/খেতাব/তকমা দেয়ার আগে ভালোভাবে চিন্তা করা উচিৎ।				

সক্রিয় নাগরিক ক্লাব

আজ ক্লাসে একটা আনন্দঘন পরিবেশ। সবাই বেশ ফুর্তিতে আছে। গতদিন খুশি আপা বলে দিয়েছিলেন আজ ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান ক্লাসের সময়ে বিদ্যালয়ের মাঠে বা যেখানে জায়গা পাওয়া যাবে সেখানে সবাই মিলে ফুটবল খেলা হবে। শ্রেণিকক্ষে সবাই অধীর আগ্রহে তাই খুশি আপার জন্য অপেক্ষা করছে। কেউ কেউ ব্যাগে করে প্রিয় খেলোয়াড়ের ছবিও নিয়ে এসেছে। একটু পর পর বের করে সবাইকে দেখাচ্ছে। এসবের মধ্যেই হাতে আস্ত একটা ফুটবল নিয়ে আকর্ণ বিস্তৃত হাসি মুখে নিয়ে খুশি আপা ক্লাসে ঢুকে পড়লেন। সবার মাঝেই বিরাট এক উত্তেজনা।

হাতের ইশারায় সবাইকে থামিয়ে, খুশি আপা বললেন, কি সবাই প্রস্তুত? সবাই সমস্বরে বলে উঠলো, প্রস্তুত আপা।

তাহলে এসো আমরা দুইটা দল গঠন করে ফেলি। প্রথমে আমরা সবাই মিলে চলো দুইজন অধিনায়ক ঠিক করে নেই। তারপর আমাদের দুই অধিনায়ক তাদের দলের অন্য খেলোয়াড়দের বাছাই করে নেবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে যাতে দল গঠনের সময় ছেলে-মেয়ে, বিশেষ চাহিদা সম্পন্নসহ সব ধরণের সক্ষমতার শিক্ষার্থীই কোনো না কোনো ভাবে যার যার সক্ষমতা অনুসারে খেলায় বা খেলার কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে।

তখন শামীমা প্রস্তাব করলো যে, নীলা আর গণেশ হতে পারে দুই জন অধিনায়ক। অন্য দিকে মোজাম্মেল প্রস্তাব করলো যে ফ্রান্সিস আর রুপা হতে পারে দুই জন অধিনায়ক। সবাই চিন্তিত হয়ে পড়লো তাহলে এই চারজনের মধ্য থেকে কোন দুই জন হতে পারে তাদের অধিনায়ক। অনুসন্ধান বলে উঠলো, আমরা ভোটের মাধ্যমে যে কোন দুই জনকে বাছাই করে নিতে পারি। তখন সবাই মিলে ভোট দিলো এবং ভোটে নীলা আর গণেশ দুই অধিনায়ক হিসেবে নির্বাচিত হলো। এরপর নীলা আর গণেশ অন্য খেলোয়াড়দের দলে যুক্ত করে তাদের দল গঠন সম্পন্ন করলো।

মাঠে গিয়ে খুশি আপা বললেন, আজ কিন্তু খেলা হবে অন্য রকমভাবে। আজ খেলায় কোন নিয়ম থাকবে না। খেলোয়াড়রা যে যেমন ইচ্ছা তেমন করেই খেলতে পারবে। শুনে দুই দলের খেলোয়াড়রাই মহা খুশি হয়ে উঠলো, এই ভেবে যে আজ আর গোলের হিসেব কেউ ঠিক করে রাখতে পারবে না। রেফারির দায়িত্ব পালন করছে তাদের ক্লাসেরই খাদিজা। খাদিজা বাঁশি বাঁজাতেই খেলা শুরু হয়ে গেল। তারপর ১৫ মিনিট ধরে তারা মহা উৎসাহের সাথে নিয়ম ছাড়া ফুটবল খেলার চেষ্টা করলো। তারপর খুশি আপা নিয়ম ছাড়া খেলার পর্ব শেষ করলেন। এবার তিনি বললেন, এসো আমরা নিয়ম অনুযায়ী ফুটবল খেলি। তারপর তারা আবার নিয়ম-কানুন মেনে ফুটবল খেললো।

নীলা ও গণেশ এর দলের মতো চলো আমরাও ক্লাসের বন্ধুদের সাথে দুই দলে বিভক্ত হয়ে ফুটবল খেলি

নিয়ম ছাড়া কোনো কিছুই কাজ করে না!

পরদিন ক্লাসে সবাই উত্তেজিত হয়ে ফুটবল খেলা নিয়ে আলোচনা করছিল। খুশি আপা এসে বললেন, কাল যে আমরা ফুটবল খেললাম সেটা তোমাদের কেমন লেগেছে? সবাই সমস্বরে বলে উঠলো, খুবই ভালো!!

খুশি আপা তখন বললেন, গতকাল আমরা দুই ভাবে ফুটবল খেলেছি, তাতে খেলায় কি কোনো পার্থক্য তৈরি হয়েছে? চিংময় বললো, আমিতো ভেবেছিলাম নিয়ম ছাড়া ফুটবল খেলার সময় এত গোল হবে যে কোন হিসেব রাখা যাবে না। কারণ সবাই হাত দিয়েই গোল দেবে। খাদিজা বললো, অথচ কোন দলই একটাও গোল দিতে পারে নি। কোন নিয়ম ছাড়াই খেলতে গিয়ে একজন যখন বল হাতে নিয়ে দৌড় দিয়েছে অন্যরা তার উপর ঝাপিয়ে পড়েছে। ফলে একজায়গায় জটলা পাকিয়ে কেউ কোনো দিকে যেতে পারে নি। বারবার এই একই পরিস্থিতি তৈরি হওয়াতে নির্ধারিত সময়ে আর কেউ গোল করতে পারে নি। আসলে নিয়ম ছাড়া খেলাটাই শেষ পর্যন্ত আমরা খেলতে পারি নি। চলো এবার আমরা ৫/৬ জনের গ্রুপে বসে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে বের করি।

- নিয়ম কি শুধু খেলাতেই থাকে?
- আর কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা নিয়ম দেখতে পাই? চলো তার একটি তালিকা তৈরি করি।
- কোথায় কী ধরণের নিয়ম রয়েছে?
- নিয়ম না থাকলে ঐসব ক্ষেত্রে কী ধরণের সমস্যা হতে পারে?

এরপর দলগুলো নিজেদের ফলাফল বোর্ডে বা পোস্টার পেপারে লিখে একটি তালিকা তৈরি করলো এবং উন্মুক্ত আলোচনা শেষে সবাই উপলব্ধি করে যে, জীবনের সর্বক্ষেত্রেই নিয়ম এবং নিয়ম মানার গুরুত্ব অপরিসীম। তাদের শ্রেণিকক্ষ, বিদ্যালয়, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র সর্বত্রই নিয়মের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

এবার চলো আমরাও বন্ধুদের সাথে মিলে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে বের করি—

নিয়ম কি শুধু খেলাতেই থাকে?

উত্তর:...

আর কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা নিয়ম দেখতে পাই? চলো তার একটি তালিকা তৈরি করি।

উত্তর:...

কোথায় কী ধরণের নিয়ম রয়েছে?

উত্তর:...

নিয়ম না থাকলে ঐসব ক্ষেত্রে কী ধরণের সমস্যা হতে পারে?

উত্তর:...

এ পর্যায়ে শামিমা বললো, আচ্ছা, এবার বুঝেছি কেন আমাদের শ্রেণিকক্ষে, দিনের শুরুতে বিদ্যালয়ে ঢোকার সময়, টিফিনের সময়, ছুটির সময়সহ বিভিন্ন সময়ে মাঝে মাঝে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। কারণ, এসব ক্ষেত্রে আমরা নিয়ম মেনে চলি না। স্বাধীন বললো, তাহলে তো আমাদের শ্রেণিকক্ষ, বিদ্যালয়, পরিবার এবং সমাজে আচার-আচরণের নিয়ম তৈরি করা প্রয়োজন।

এরপর তারা দলে ভাগ হয়ে শ্রেণিকক্ষে ও বিদ্যালয়ে নিজেরা পালনের নীতিমালা তৈরি করলো এবং তা শ্রেণিকক্ষে দৃশ্যমানভাবে টাঙিয়ে দিল। তাদের প্রস্তুতকৃত নীতিমালাসমূহের নমুনা নিচে দেওয়া হলো।

শ্রেণিকক্ষে অনুসরণের নিয়মের নমুনা:

১. পরিচিত কারও সাথে দেখা হলে হাসিমুখে কুশল বিনিময় করব
২. অন্যের মতামতের ব্যাপারে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবো
৩. কেউ যখন কথা বলবে অন্যরা ধৈর্য সহকারে শুনবো
৪. নিজের মতামত দেওয়ার আগে হাত তুলে অনুমতি নেবো
৫. কোন বিষয়ে বিরোধ হলে একসাথে বসে আলোচনা করে মীমাংসা করবো

বিদ্যালয়ে অনুসরণের জন্য নিয়মের নমুনা:

১. বিদ্যালয়ে প্রবেশ ও বাহিরে যাবার সময় ধৈর্যের সাথে লাইনে দাঁড়াবো।
২. বিদ্যালয় কোনো ভাবেই অপরিচ্ছন্ন করবো না
৩. বিদ্যালয় পরিস্কার রাখতে নিয়মিত দায়িত্ব পালন করবো

পরিবারে ও সমাজে অনুসরণের জন্য নিয়মের নমুনা:

১. নিজের কাজ নিজে করবো
২. অন্যের সমস্যা বা ক্ষতি হয় এমন কাজ করবো না
৩. নতুন মানুষের সাথে কথা বলার সময় আগে নিজের পরিচিয় দেব। এর পর অনুমতি নিয়ে বিনয়ের সাথে কথা বলব।
৪. ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ, বিত্ত ও সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে সমাজের সকল মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করব এবং ছোটদের স্নেহ ও ভালোবাসা দেব।
৫. রাস্তায়, হাটে-বাজারে ও যেকোনো সমাবেশে এমনভাবে চলব যাতে অপরের চলাচলের কোনো সমস্যা না হয়। অপ্রয়োজনে কোথাও ভিড় বাড়াব না।

তারা ঠিক করলো যে, সারা বছর নিয়মগুলো তারা মেনে চলবে। যদি নতুন কোনো নিয়ম যুক্ত করার প্রয়োজন হয় তবে শ্রেণিকক্ষে উন্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে তা যুক্ত করা যাবে। একইভাবে কোনো নিয়ম অপ্রয়োজনীয় হয়ে গেলে তা বাদ দেওয়া যাবে। যত দিন তারা বিদ্যালয়ে থাকবে ততদিন পরবর্তী ক্লাসগুলোতেও এই নিয়মগুলো, প্রয়োজনে কিছু সংশোধন করে, তারা অনুসরণ করতে পারবে। খুশি আপা আনন্দের সাথে জানালেন যে, তিনিও সবার সাথে এই নিয়মগুলো মেনে চলবেন।

আদনান তখন বললো, কিন্তু বিদ্যালয়ে ও সমাজে তো আমরা শুধু একাই বাস করি না। আরো অনেক ধরণের মানুষ বাস করে। সবাই তো বিদ্যালয়ে এসব নিয়ম শেখার সুযোগ পায় নি। তারাও যদি নিয়ম মেনে না চলে তাহলে তো বিশৃঙ্খলা দূর হবে না। কিন্তু এত মানুষকে নিয়ম পালনে উদ্বুদ্ধ করা খুবই কঠিন কাজ। এটা একা একা করা আমাদের জন্য অনেক চ্যালেঞ্জিং হবে। আনুচিং বললো, চল তাহলে আমরা একটি ক্লাব তৈরি করি। সক্রিয় নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য ক্লাব।

সবাই তার এ চিন্তাটাকে সমর্থন করলো। রবিন বললো, তাহলে আমাদের ক্লাবের নাম হতে পারে সক্রিয় নাগরিক ক্লাব।

এ পর্যায়ে খুশি আপা নিচের ছবিগুলো সবাইকে দেখিয়ে নিচের তার কোনগুলো নিয়ম মেনে চলার আর কোনগুলো নিয়ম ভাঙার তা আলোচনা করতে বলবেন।

এবার খুশি আপা সবাইকে কতগুলো ছবি দেখালেন।

ছবি নিয়ে আলোচনা শেষ হলে তিনি বললেন যে, এগুলো তো শুধু ট্রাফিক নিয়ম মানা না মানার চিত্র। এসব ছাড়াও কাজের আরো অনেক ক্ষেত্র রয়েছে।

এরপর শিক্ষার্থীরা ৫/৬ জনের দলে ভাগ হয়ে আমাদের সক্রিয় নাগরিক ক্লাবের কাজ কী হবে তার তালিকা তৈরি করলো। প্রতিটি দলের তালিকা উপস্থাপনের পর আলোচনার মাধ্যমে সবার সম্মতিতে ক্লাবের কাজ কী হবে তা শিক্ষার্থীরা চূড়ান্ত করে ফেললো।

তিনি আরো বললেন, কী কাজ করবো তা তো ঠিক করা হলো, চলো এবার আমরা এই কাজগুলো সুষ্ঠুভাবে করার সুবিধার্থে ক্লাবের একটি কমিটি গঠন করি। শিক্ষার্থীরা দলে বসে কমিটি সম্পর্কিত নিচের বিষয়গুলো আলাচনা করলো—

- মোট সদস্য সংখ্যা,
- কী কী পদ/পদবি থাকবে,
- তাদের কার কী কাজ হবে
- সাধারণ সদস্য কারা হতে পারবে
- সাধারণ সদস্যদের অধিকার ও কর্তব্য কী থাকবে

এগুলোর ভিত্তিতে শিক্ষার্থীরা প্রস্তাবনা তৈরি করলো এবং দলগতভাবে উপস্থাপন করলো। সবাই মিলে আলোচনা করে একটা সাধারণ কাঠামো এবং অধিকার ও দায়িত্বের বিবরণী তারা তৈরি করলো। কমিটিতে তারা ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষককে উপদেষ্টা হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করলো।

এরপর শিক্ষার্থীরা নির্বাচনের মাধ্যমে তাদের কমিটি গঠন সম্পন্ন করলো। নতুন কমিটি দ্রুতই তাদের প্রথম মিটিংয়ের তারিখ নির্ধারণ করে এবং প্রথম সভাতেই তারা পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ শুরু করে।

সক্রিয় নাগরিক ক্লাবের প্রথম কার্যক্রম হিসেবে খুশি আপা ট্রাফিক আইন নিয়ে ভাবার প্রস্তাব করলেন। শিক্ষার্থীরা সম্মত হলে তিনি সবাইকে তিনটি দলে বিভক্ত হবার আহ্বান জানান।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী-

- প্রথম দল উপযুক্ত ব্যক্তির মাধ্যমে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বই থেকে, অন্যান্য উৎস থেকে ট্রাফিক নিয়ম সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করলো।
- দ্বিতীয় দল ট্রাফিক নিয়মের প্রতীকগুলো সংগ্রহ করে পরিচিতি লিখলো।
- তৃতীয় দল খুশি আপার সহযোগিতায় এলাকার সড়ক পথে ঘুরে এসে তাদের এলাকার ট্রাফিক ব্যবস্থার বাস্তব চিত্র তুলে ধরলো। এ কাজে তারা আলোকচিত্র, আঁকা ছবি, বর্ণনা ব্যবহার করলো।

- নির্দিষ্ট দিনে তিনটি দলই নিজ নিজ সংগ্রহ শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করলো। এ সম্পর্কে অন্যান্যরা মতামত দিয়ে সংশোধন বা পরিমার্জন সম্পর্কে পরামর্শ দিলো।
- এভাবে তারা ট্রাফিক নিয়ম সম্পর্কে সচিত্র প্রতিবেদন তৈরি করলো। বর্ণনাসহ ছবি ও ট্রাফিক সংকেতের একটি প্রদর্শনীও তারা আয়োজন করলো।
- প্রদর্শনীতে তারা নিজেরাই বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করে সড়কের ট্রাফিক নিয়ম মেনে মানুষ ও যান চলাচলের বাস্তব চিত্র তুলে ধরলো। কেউ অভিনয় করে গাড়ি, কেউ পথচারী, কেউ মোড়ের ট্রাফিক লাইট, কেউবা ট্রাফিক পুলিশ সেজে যথাযথ ভূমিকা পালন করলো। আর অন্য শিক্ষার্থীরা মাঝখানে ফাঁকা জায়গা রেখে দুই সারিতে দাঁড়িয়ে একটি চৌরাস্তার মোড়ের চারটি রাস্তার ভ‚মিকায় অভিনয় করলো। রাস্তায় দ্রুতগতিতে গাড়িরূপী শিক্ষার্থীরা দৌড়ে এপাশ থেকে ওপাশ যাতায়াত করতে থাকলো। তারা ট্রাফিক নিয়ম মেনে সিগন্যাল অনুযায়ী ডান-বাম ঘুরবে এবং চলাচল করবে। পথচারী শিক্ষার্থীরা সাবধানে নিয়ম মেনে রাস্তা পারাপার করার অনুশীলন করবে। ট্রাফিক সিগন্যালরূপী শিক্ষার্থীরা ট্রাফিক নিয়ম অনুযায়ী ট্রাফিক বাতি জ্বালাবে।

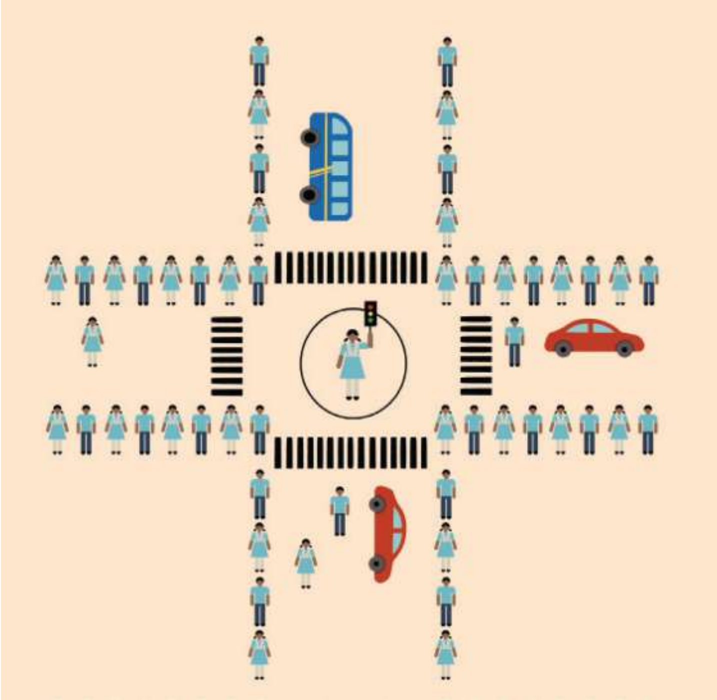

একাজে তারা আগে থেকেই তৈরি করে রাখা সবুজ, হলুদ ও লাল রংয়ের কাগজের বোর্ড বা অন্য যে কোন উপযুক্ত মাধ্যম ব্যবহার করে সিগন্যাল বাতি বানিয়ে রেখেছিলো। এ কাজে স্কুলের মাঠ বা উঠান ব্যবহার করব। শিক্ষকের সহায়তায় তারা প্রদর্শনীর দিনের আগেই এই খেলার পরিকল্পনা ও রিহার্সেল (মহড়া) করেছিলো।

একটি সড়ক দুর্ঘটনা, বাজারের একটি দিন বা আসা-যাওয়ার পথে-এইসব বিষয় নিয়ে শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষক বা উপযুক্ত কারও সহায়তায় নাটক আয়োজন করলো। প্রস্তুতির সময় ট্রাফিক বিভাগের একজন অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে তাদের সহযোগিতা করেছিলেন। কমিটির সদস্যরা খুশি আপা প্রধান ও শিক্ষকের সহায়তায় তাঁর সাথে যোগাযোগ করেছিলেন।

চলো বন্ধুদের সাথে নিয়ে আমরাও একটি সক্রিয় নাগরিক ক্লাব গড়ে তুলি এবং আমাদের কার্যক্রম শুরি করি।

মূল্যায়ন:

এবার চলো আমরা নিচে যুক্ত আত্মমূল্যায়নের ছকের মাধ্যমে আমাদের সক্রিয় নাগরিক ক্লাবের সাথে আমাদের কার্যক্রমের মূল্যায়ন করি।

আত্মমূল্যায়নের ছক (শিক্ষার্থী নিজে পূরণ করবে)

ক্রম	ক্লাব কার্যক্রমে অংশগ্রহণের পর	সম্পূর্ণ একমত	মোটামুটি একমত	একমত নয়
১	অন্তত: দুটি সক্রিয় নাগরিকের গুণাবলি অর্জন করেছি			
২	গণতান্ত্রিক আচরণ শিখেছি			
৩	ভোটের পদ্ধতি সম্পর্কে জেনেছি			
৪	ক্লাবের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে আনন্দ পেয়েছি			
৫	সমাজে একজন সক্রিয় নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠার আগ্রহ তৈরি হয়েছে			
৬	সক্রিয় নাগরিকসুলভ অন্তত: পক্ষে দুটি কাজ করেছি/শুরু করেছি			
৭	আমি বিশ্বাস করি আমার কাজে ক্লাব উপকৃত হয়েছে			

বিজ্ঞানের চোখ দিয়ে চারপাশ দেখি

আমাদের বন্ধু ‘নিসর্গ’ ও ‘অন্বেষা’

তোমরা কি নিসর্গ ও অন্বেষোকে চেনো? তাদের আরও বন্ধু আছে। আমরা তাদের সাথেও ধীরে ধীরে পরিচিত হবো। নিসর্গ আর অন্বেষা যা কিছু দেখে, শোনে তা নিয়েই ভাবে, মনে নানা প্রশ্ন আসে। তোমরাও নিশ্চয় তা-ই করো। তারা তোমাদের মতোই ক্লাসের অন্য বন্ধু, শিক্ষক, পরিবারের সদস্য আর প্রতিবেশীর সাহায্য নিয়ে বই পড়ে, নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজে। আর এটাই তাদের পড়ালেখা। কী দারুণ ব্যাপার, তাই না? চলো তাদের সাথে আমরাও যুক্ত হই ক্ষুদে অনুসন্ধানীর দল হিসেবে।

ছবি নিয়ে আলোচনা

আজ নিসর্গ ও অন্বেষা একটি ছবি খুঁজে পেয়েছে। এটি বুড়িগঙ্গা নদীর ছবি। নদীটি বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার দক্ষিণ-পশ্চিম দিক দিয়ে বয়ে চলেছে। কিছুদিন আগেই তারা বুড়িগঙ্গা নদীতে বেড়াতে গিয়েছিল। কিন্তু ছবির বুড়িগঙ্গা আর তাদের কিছুদিন আগের দেখা বুড়িগঙ্গার মধ্যে অনেক পার্থক্য। কেন? এই তাদের আজকের চিন্তার বিষয়। তোমরা দেখ তো তাদের একটু সাহায্য করতে পার কিনা?

চিত্র: বুড়িগঙ্গা নদী

চিত্র: বুড়িগঙ্গা নদী

প্রশ্ন

ক) ছবি দুইটিতে কী কী আছে?

খ) কোনো পার্থক্য কি আছে?

গ) কোন ছবিটি তুলনামূলকভাবে আগের? কোনটি সাম্প্রতিক?

ঘ) তোমাদের কী মনে হয়, কেন এই পার্থক্য ?

ক্লাসের শিক্ষক খুশি আপা তাদের আরো কিছু ছবি দেখালেন

চিত্র: পদ্মা নদী

চিত্র: পদ্মা নদী

চিত্র: ঢাকার গণপরিবহন

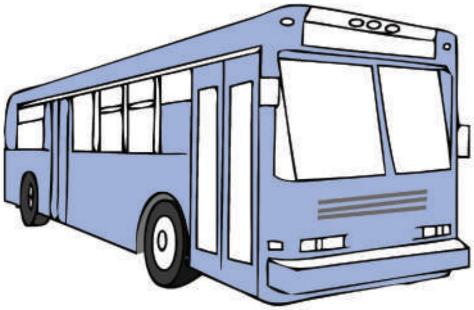

চিত্র: ঢাকার গণপরিবহন

এই সব ছবির মধ্যে কোনো মিল রয়েছে কি?

এগুলো কি কোনো নির্দিষ্ট একটি বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত?

ছবিতে যেসব বাহন দেখা যাচ্ছে সেগুলো ব্যবহারের উদ্দেশ্যের কথা চিন্তা করো।

এসো পরিবর্তন নিয়ে চিন্তা করি:

সময়ের সাথে সাথে অনেক কিছুর পরিবর্তন ঘটে । কিছু পরিবর্তন হয় ধীরে ধীরে অনেক সময় নিয়ে। আবার কিছু পরিবর্তন হয় দ্রুত।

চোখের সামনে দেখা কিছু পরিবর্তনের ছবি এঁকেছে ক্লাসের বন্ধু প্রকৃতি আর নিসর্গ।

নিসর্গের আঁকা ছবি

ঘরে রাখা লোহার চাবি

বাইরে পড়ে থাকা মরিচা ধরা লোহার চাবি

প্রকৃতির আঁকা ছবি

গ্রীষ্মকালে শুকিয়ে যাওয়া পুকুর

বর্ষাকালে পানিতে ভরা পুকুর

চলো আমরাও এরকম আশে পাশের বিভিন্ন পরিবর্তনের কথা চিন্তা করি ও ছবি আঁকি।

আমাদের এলাকার পরিবর্তন

নিসর্গ আজ দৌড়ে চলে এলো স্কুলে আর অন্বেষাকে বললো: দেখো দেখো আমাদের গ্রামের পুরনো এক ছবি।

অন্বেষা: কিন্তু এটি কোন জায়গা? এ রকম জায়গা তো চোখে পড়েনি আমাদের গ্রামে ।

নিসর্গ: হ্যাঁ, আমিও চিনতে পারছি না।

অন্বেষা: চলো সুরেশকাকার কাছে যাই। কাকার বয়স ৭০ এর বেশি। আগের অনেক কিছুই উনি জানেন, ওনার স্মৃতিশক্তিও ভাল, আগের অনেক কথা মনে করতে পারেন।

দুই বন্ধু পাশের বাসার সুরেশকাকার কাছে গেল। ওনার কথা শুনে তারা তো অবাক। এটা নাকি তাদের স্কুলের উত্তর পাশের সেই জায়গা যেখানে এখন বড় একটি কারখানা গড়ে উঠেছে। আর দেরি না করে বিকেলেই তারা অন্বেষার মাকে নিয়ে সেই জায়গাটিতে গেল। তারা অন্বেষার মায়ের ফোন ব্যবহার করে জায়গাটির ছবি তুলে নিল।

পরের দিন শ্রেণিকক্ষে সবাই ছবি দুটোর ওপর উপুড় হয়ে পড়ল!

বর্তমানের ছবি

আগের ছবি

দীপা বললো: এই কারখানায় চিপস বানায়।

দীপঙ্কর বলল: এজন্যই তো এখন এখানে এত আলুর চাষ হয়।

মিলি বললো: আগে কি আলুর চাষ হত না?

দীপা বলল: আমার দাদার কাছে শুনেছি আগে ধান চাষ হত বেশি।

নিসর্গ বললো: আগে অনেক কিছুই অন্যরকম ছিল। আমার নানী বলেছে তখন বিদ্যুৎ ছিল না। টিভি ছিল না। কম্পিউটার, গেইমস, মোবাইলও ছিল না।

মিলি: হ্যাঁ, কিন্তু তখনও তারা অনেক মাজার মজার খেলায় মেতে থাকতো। সেগুলো আমরা এখন খেলি না। আমি এই বিষয় নিয়ে আরও জানার চেষ্টা করবো ভাবছি।

দেখা গেলো ক্লাসের সবাই কম-বেশি নিজ নিজ এলাকারবিভিন্ন পরিবর্তনের ব্যাপারে জানতে আগ্রহী। কেউ জানতে চায় খেলা নিয়ে, কেই জামা কাপড়, পোশাক পরিচ্ছদ, কেউ যাতায়াত ব্যবস্থা, কেই কৃষি, কেই

ভূপ্রকৃতি, কেউ জলবায়ু, কেউ কেউ খাবার দাবার-এরকম কত কী সম্পর্কে জানার আগ্রহ তাদের!

এলাকাভিত্তিক পরিবর্তন অনুসন্ধান

অনুসন্ধানের জন্য প্রশ্ন

সব প্রশ্ন মাথায় নিয়ে তারা গেল বিদ্যালয়ে। তাদের শিক্ষক খুশি আপা সব শুনে বললেন—তাহলে চল, শুরু করে দেই তোমাদের প্রশ্নের উত্তর খোঁজা, শুরু হোক অনুসন্ধান। প্রথমে প্রত্যেকের এলাকায় ঘটে যাওয়া পরিবর্তন নিয়ে যার মাথায় যে প্রশ্ন আসছে তা চটপট লিখে ফেলি এসো।

আমার এলাকার পরিবর্তন নিয়ে যে প্রশ্নের উত্তর আমি জানতে চাই:

১. আগে এই এলাকার ছেলে-মেয়েদের সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কী কী করে সময় কাটত? এখন আমরা যা করি তা থেকে ভিন্ন ছিল কি? কতটা ভিন্ন?

২. আগে যখন কারও বাসায় ফ্রিজ ছিল না তখন আমাদের এলাকায় খাবার কীভাবে সংরক্ষণ করা হত?

চলো আমরাও আমাদের এলাকার পরিবর্তন বিষয়ে প্রশ্ন লিখি

১...

২...

প্রশ্ন বাছাই

এবারে খুশি আপা বললেন, চলো আমরা ৫/৬ জনের দলে ভাগ হয়ে বসি। প্রত্যেকে নিজেদের লেখা প্রশ্ন গুলো বন্ধুদের জানাই। প্রশ্নগুলো থেকে আমরা এমন সব প্রশ্ন বেছে নেব যেগুলোর উত্তর আমরাই নানা উপায়ে খুঁজে বের করতে পারি।

সব প্রশ্ন কি অনুসন্ধানের জন্য উপযুক্ত?

অন্বেষা বললো -আমি জানতে চাই—কবে আমাদের এই বিদ্যালয়টি তৈরি হয়েছিল?

বুশরা বললো—অন্বেষা, প্রধান শিক্ষক সেদিন এক বক্তৃতায় বলেছিলেন ১৯৯০ সালে আমাদের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এটা তো আমরা জানিই। তুমি কি আসলেই আবারো এটাই জানতে চাও? নাকি বিদ্যালয়ের কোনো পরিবর্তন সম্পর্কে জানতে চাও?

অন্বেষা বললো—নাহ বুশরা, তুমি ঠিকই বলেছো। যেসব প্রশ্নের উত্তর আমরা বন্ধুরা জানিই বা যেটা জানার জন্য কোনো খোঁজাখুঁজি বা অনুসন্ধানেরই দরকার নেই সেই প্রশ্ন বাদ দেই। বরং আমি এটা জানতে চাইতে পারি যে অনেক আগে বিদ্যালয়টা কেমন ছিল?

এবারে মুনিয়া বললো — আমার খুব জানতে ইচ্ছে করছে আমাদের পূর্ব দিকের নদীর নিচে বা তলায় কী ধরনের পরিবর্তন হয়েছে? বাইরেরটা তো দেখা যায় সহজেই, কিন্তু তলারটা জানব কীভাবে?
অন্বেষা বললো: আগে তুমি বড় হয়ে দক্ষ ডুবুরি হও, তারপর না হয় এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজা যাবে।
মুনিয়াসহ সবাই হেসে উঠলো জোরে।
মুনিয়া বলল: ঠিকই বলেছো। এই প্রশ্নটি আপাতত তুলে রাখি ভবিষ্যতের জন্য। এবার অন্যদেরও এরকম প্রশ্ন বের হলো যেগুলোর অনুসন্ধান করা এই মুহূর্তে সম্ভব নয় — হয়ত অনেক দূরে যেতে হবে নয়ত কাজটা নিরাপদ নয়, অথবা অনেকের সাহায্য দরকার হবে, কিংবা অনেক খরচের ব্যাপার আছে।
প্রতিটি প্রশ্ন এভাবে বিশ্লেষণ করে তারপর তালিকা চূড়ান্ত করল ওরা।

চলো এভাবে আমরাও প্রশ্নের তালিকা চূড়ান্ত করি

আমাদের প্রশ্নগুলো কি অনুসন্ধানের উপযোগী? চলো মিলিয়ে দেখি (✓/✗ দেই)

প্রশ্ন	প্রশ্নটির উত্তর আমরা এখানো জানিনা	প্রশ্নটির উত্তর জানার আগ্রহ আছে আমাদের	প্রশ্নের উত্তর পেতে কী করতে হবে, কার কাছে বা কোথায় যেতে হবে তা বুঝতে পারছি	প্রশ্নটির উত্তর পেতে যা করা দরকার তা আমরা করতে পারবো	নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রশ্নটির উত্তর খুঁজে পাওয়া সম্ভব
১					
২					

যে প্রশ্নগুলো উপরের সব বৈশিষ্ট্যই পূরণ করবে আপাতত সেগুলোই আমরা চূড়ান্ত তালিকায় রাখলাম।

চূড়ান্ত প্রশ্নের তালিকা তৈরি:

চল এবারে সবাই দলে বসি এবং প্রশ্নগুলো দলের বন্ধুদের একবার পড়ে শোনাই। এবারে প্রশ্নের চূড়ান্ত তালিকা একটি পোস্টার পেপারে লিখে শ্রেণিকক্ষের দেয়ালে টাঙিয়ে দেই। এখন বাছাইকৃত প্রশ্নের তালিকা থেকে প্রত্যেক দল আগ্রহ অনুযায়ী একটি করে প্রশ্ন বেছে নেব। এরপরে প্রতিটি দলের কাজ হলো — প্রশ্নের উত্তর খোঁজা।

অনুসন্ধানের পরিকল্পনা ও তার উপস্থাপন

দলের নাম:
দলের সদস্যদের নাম:
১। অনুসন্ধানের জন্য প্রশ্ন:
২। প্রশ্নের ভেতরে যে মূল বিষয় গুলো রয়েছে: (Key concepts):
৩। কোথায় বা কার কার কাছে গেলে প্রশ্নের উত্তর ভালোভাবে জানা যাবে:
৪। কিভাবে বা কী উপায়ে জানা যাবে:

চলো প্রত্যেক দলই প্রয়োজনীয় তথ্যসহ ছকটি পোস্টার পেপারে লিখে শ্রেণিকক্ষের সবার সাথে ভাগ করে নিই। এক দল আরেক দলের উপস্থাপনা থেকে পরিকল্পনার বিভিন্ন অংশ বোঝার চেষ্টা করব। প্রথমে তাদের

পরিকল্পনাটির ভালো দিকগুলোর প্রশংসা করব, তারপর যে সকল বিষয়ে পরিবর্তন প্রয়োজন সেসব বিষয়ে দিক নির্দেশনা দেওয়ার চেষ্টা করবো।

পরিকল্পনার বিচার-বিশ্লেষণ

অনুসন্ধানের ধাপ	বিচারের মানদন্ড	উদাহরণ
১। অনুসন্ধানের জন্য প্রশ্ন	● চ্যালেঞ্জিং (যে প্রশ্নের উত্তর আমরা জানি না কিন্তু জানতে চাই, কেননা তা জানার আগ্রহ আছে) ● স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট (প্রশ্নের উত্তর পেতে কী করতে হবে তা বুঝতে পারছি) ● বাস্তবায়নযোগ্য (প্রশ্নের উত্তর পেতে যা করা দরকার তা আমাদের পক্ষে করা সম্ভব ● প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে ২/৩ সপ্তাহের বেশি সময় লাগবে না	আগে এই এলাকার মানুষ কী ধরনের খাবার খেতো আর এখন কেমন খাবার খায়? অথবা এভাবেও প্রশ্নটিকে লেখা যায়- অতীত ও সাম্প্রতিককালে আমাদের এলাকার খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন হয়েছে কি? হয়ে থাকলে কী পরিবর্তন হয়েছে?
২। প্রশ্নের মধ্যে থাকা মূল বিষয়গুলো (Key concepts)	● প্রশ্নের মধ্যে সর্বোচ্চ দুইটি মূল বিষয় থাকবে। ● বিষয়টি/গুলো সুনির্দিষ্ট হবে	অতীতকালের খাদ্যাভ্যাস ↔ বর্তমান কালের খাদ্যাভাস
৩। কোথায় বা কার কাছে গেলে প্রশ্নের উত্তর ভালোভাবে জানা যাবে?	● যা জানতে চাচ্ছি তা এই উৎসটি থেকেই সঠিকভাবে জানা যাবে। ● উৎসটি এমন হবে যাতে নির্ভর করা যায়। ● সত্যনিষ্ঠ ও সহজলভ্য।	১। আমার কাছাকাছি থাকা তিন বন্ধু (বর্তমান সময়ের খাদ্যাভ্যাস জানার জন্য) ২। আমার দাদি ও প্রবীন প্রতিবেশী (অতীতের খাদ্যাভ্যাস জানার জন্য)
৪। এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য নির্ধারিত ব্যক্তি/বস্তু/ জায়গা ইত্যাদির কাছ থেকে কীভাবে প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে?	● যে উপায়ে জানার চেষ্টা করছি সেটিই সবচেয়ে উপযুক্ত উপায়। ● কোনো মানুষের জন্য প্রশ্নমালা তৈরি করলে তা হবে সহজবোধ্য, তা ৫/৬টি প্রশ্নে সীমাবদ্ধ হলে ভালো হয়। ● সেগুলো বিষয়বস্তুর সাথে প্রাসঙ্গিক হতে হবে। ● যদি পর্যবেক্ষণ করি তবে সেক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণের ফলাফল কিভাবে লিখে রাখবো বা রেকর্ড করবো তার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকবে।	সাক্ষাৎকারে বন্ধুদের জন্য প্রশ্নমালা ১। তুমি সাধারণত সকালে কী কী খেয়ে থাকো? ২। তুমি সাধারণত দুপুরে কী কী খাবার খেয়ে থাকো? ৩। তুমি বিকালে নাশতা হিসেবে কী খাবার খাও? ৪। তুমি রাতে কী কী খাবার খাও? প্রবীন ব্যক্তির জন্য প্রশ্নমালা ১। আপনি যখন ছোট ছিলেন তখন সকালে নাস্তা হিসেবে কী কী খাবার খেতেন? ২। -------দুপুরে----? ৩। ------বিকালে---? ৪। ------রাতে----?

পরিকল্পনা অনুযায়ী অনুসন্ধানী প্রশ্নের উত্তর খুঁজি

সবার মতামতের ও পরামর্শের ভিত্তিতে নিসর্গ ও অন্বেষাদের বন্ধুদের মতো চলো আমরাও আমাদের দলীয় পরিকল্পনাটি একটু ঠিক করে নিই। এবারে চলো পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজে নেমে যাই।

একজন সাক্ষাৎকার নিচ্ছে,
আরেকজন নোট নিচ্ছে।

পরীক্ষা-নিরীক্ষা

দলীয় আলোচনা: গ্রামের ৫ জন গোল হয়ে
বসেছে। সাথে ২ জন শিক্ষার্থীও আছে

পর্যবেক্ষণ

অনুসন্ধানী কাজের একটি উদাহরণ

নিসর্গ তার বন্ধুদের প্রশ্ন করে বা সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে ৪ বেলার যে সব খাবারের কথা জেনেছে সেগুলোর তালিকা তৈরি করল। তারপর একটি গোল কাগজকে ৪ ভাগে ভাগ করে একেক ভাগে প্রতি বেলার খাবারের তালিকা লিখলো। একইভাবে প্রবীন ব্যক্তিদের কাছ থেকে পাওয়া খাবারের তালিকাও সাজালো।

বর্তমানের খাদ্যাভাস

অতীতের খাদ্যাভাস

সিদ্ধান্ত

আমাদের দেশে গত ৩০ বছরে মানুষের খাদ্যাভাসে বড় পরিবর্তন এসেছে। বর্তমানে মানুষের খাবারে বৈচিত্র্য বেড়েছে। মানুষ এখন ফাস্ট ফুড এবং দেশি বিদেশি আরও নানান ধরনের খাবার খেতে অভ্যস্ত হচ্ছে, যা আগে ছিল না। আগে মানুষ মূলত ঘরে তৈরি খাবার খেয়েই জীবন ধারণ করতো।

নিসর্গ সাজানোর পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা ফলাফল বোঝা কত সহজ হলো!

প্রকৃতি খুব সুন্দর করেই বিভিন্ন বেলার তালিকা ধরে খাবারের ছবি এঁকে, রঙ করে কেটে লাগিয়েছে।

চলো আমরাও নানা উপায়ে (যেমন- সাক্ষাৎকার, পর্যবেক্ষণ, প্রশ্নমালা ইত্যাদি ব্যবহার করে) আমাদের অনুসন্ধানী প্রশ্নের উত্তর খুঁজি। এভাবে আমরা যা জানতে পারলাম তা নানা উপায়ে (যেমন- শ্রেণি বিভাগ করে, শতকরা হিসাব করে, গড় মান বের করে) সাজাই যেন তা আমাদের অনুসন্ধানের ফলাফলকে বা একটি সিদ্ধান্তকে নির্দেশ করে।

অনুসন্ধানী কাজের দলীয় উপস্থাপন

কত কাজই না করলাম আমরা প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে। এবারে চল আমরা যা যা করলাম ও যেসব ফলাফল পেলাম সেগুলো একসাথে উপস্থাপন করি যেন সকল বন্ধু বুঝতে পারে আমরা

কী উপায়ে প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছি আর কীই বা পেলাম।

খেয়াল রাখি যেন নিচের বিষয়গুলো উপস্থাপনা থেকে বাদ না পড়ে। চাইলে তুমি প্রাসঙ্গিক অন্য কিছুও যোগ করতে পার তোমার উপস্থাপনায়।

দলের নাম:..

সদস্যদের নাম:

১. .... ২...

৩. .... ৪...

১. অনুসন্ধানের প্রশ্ন::

২. প্রশ্নের মূল বিষয়বস্তু:

৩. যে উপায়ে প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছি: (ধাপগুলোর বর্ণনা)

৪. প্রশ্নের উত্তর/সিদ্ধান্ত:

৫. এ সংক্রান্ত যে সকল নতুন প্রশ্ন আমার মাথায় এসেছে:

উপস্থাপনাটি আমরা নানা উপায়ে করতে পারি। তোমার ও দলের সদস্যদের সাথে আলোচনা করে নাটক, দেয়াল পত্রিকা, প্রতিবেদন, সংবাদ পাঠ, কমিকস, ভিডিও, শিল্পকলার বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে এটি উপস্থাপন করার চেষ্টা করি চলো।

প্রতিফলন: একটু থামি ও চিন্তা করি

প্রতিফলনের খাতা:

যে কোনো কাজ/চিন্তা করার সময় নিসর্গ কাজ চলাকালীন ও শেষে একটু থেমে চিন্তা করে। ঠিক পথে যাচ্ছি তো? কী করলাম? কেন করলাম? কাজটি করতে কী কী সমস্যার সম্মুখীন হলাম? কীভাবে সমস্যার সমাধান করলাম? পরে আবার কাজটি করতে হলে কোন অংশ ভিন্ন ভাবে করবো? ইত্যাদি। এতে সে তার কাজটিকে ভালোভাবে বুঝতে পারে এবং পরবর্তী কাজ আরও ভালোভাবে করতে পারে। একে আমরা প্রতিফলন বলতে পারি। নিসর্গ একটি ছোট খাতায় এগুলো লিখে রাখে। তার খাতার নাম দিয়েছে “অনুসন্ধান ও আমার যত চিন্তা!”।

তোমরাও এরকম প্রতিফলনের খাতা তৈরি করবে? কী নাম দেবে তার?

অনুসন্ধান ও আমার যত চিন্তা

১. আমি কী কী কাজ করেছি?

আমি অতীত ও বর্তমানের খাদ্যাভ্যাসে পার্থক্য বোঝার জন্য আমার বয়সি তিন জন ও তিন জন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির সাক্ষাৎকার নিয়েছি। তাদের দৈনন্দিন খাদ্য-তালিকা সম্পর্কে জেনেছি।

২. আমার এ কাজটি করতে কেমন লেগেছে?

কাজটি করতে আমার খুবই ভালো লেগেছে। মনে হচ্ছিলো আমি একজন গবেষক/অনুসন্ধানী। তবে প্রথম দুইটি সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় একটু ভয় ভয় আর লজ্জাও লাগছিল।

৩. কোনো সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলাম কি? কীভাবে সমাধান করেছিলাম?

হ্যাঁ, মোট তিনটি সমস্যায় পড়েছিলাম। খুশি আপা ও বন্ধুদের সাথে আলোচনা করে সমাধানের চেষ্টাও করেছি। সেগুলো হলো-

সমস্যার বিবরণ	যেভাবে সমাধান করেছি/ করার চেষ্টা করেছি	ভবিষ্যতে করণীয়/ যা শিখলাম
১। সাবিহার দাদি সাক্ষাৎকার নিতে গিয়ে দেখলাম অনেক বয়স হওয়ার কারণে উনি অনেক ভুল তথ্য দিচ্ছিলেন, অতীত ও বর্তমানকে মিলিয়ে ফেলছিলেন।	পরে অন্য আরেকজনের সাক্ষাৎকার নিয়েছি।	যার সাক্ষাৎকার নেবো তার সম্পর্কে জেনে নিতে হবে—তিনি নির্ভরযোগ্য উত্তর দিতে পারবেন কিনা?
২। যে তিন জন বন্ধু নির্বাচন করেছি তাদের দুই জনই সম্পর্কে আপন বোন। তাই খাদ্যাভ্যাসে বৈচিত্র্য উঠে আসে নি।	আরও দুই জন বন্ধুর সাক্ষাৎকার নিয়েছি।	প্রশ্নের উত্তর যেন সঠিকভাবে পাই এজন্য ভবিষ্যতে সাক্ষাৎকারের জন্যে ব্যক্তি নির্বাচনে আরও চিন্তা-ভাবনা করতে হবে।
৩। প্রতিবেশী রানুর দাদুর সাক্ষাৎকার ফোনে রেকর্ড করায় উনি একটু রাগ করেছেন।	উনি রাগ করেছেন তা বুঝতে পেরে আর রেকর্ড করিনি। পুরোটা মুছে হাতে লিখে নিয়েছি।	এরপর কারও কাছ থেকে সাক্ষাৎকার নেওয়ার আগেই সাক্ষাৎকার রেকর্ড করার অনুমতি চেয়ে নেব।

চলো এবারে আমরা নিসর্গের মত নিজেদের অনুসন্ধানী কাজের এই অংশটুকু নিয়ে ভাবি করি।
আমার অনুসন্ধানী কাজের প্রতিফলন/সুচিন্তিত বিচার বিশ্লেষণ:

১. আমি কী কী কাজ করেছি?

----

২. আমার এ কাজটি করতে কেমন লেগেছে?

----

৩. কেনো সমস্যা: সম্মুখীন হয়েছিলাম কী? কীভাবে তার সমাধান করেছিলাম?

সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলাম	যেভাবে সমাধান করেছি/ করার চেষ্টা করেছি	ভবিষ্যতে করণীয়

৪. -- (আরও কিছু প্রশ্ন তুমি নিজেও যোগ করতে পারো, যা তোমার কাজটিকে বিশ্লেষণে সাহায্য করবে বলে তুমি মনে কর।)

দলীয় প্রতিফলনের জন্য পোস্টার

আমাদের চিন্তা ভাবনা ও কাজকর্মের প্রতিফলনে মনে নানা প্রশ্ন আসতে পারে। বন্ধুরা মিলে আলোচনাতে তার উত্তর না পেলে/সমাধান না মিললে তা আমরা খুশি আপা বা অন্য দলের সদস্যদে জন্য তুলে রাখলে কেমন হয়? প্রত্যেক দলের নাম লিখে দেয়ালের বিভিন্ন জায়গায় পোস্টার লাগিয়ে দিল। যখনই দলের সদস্যরা কোনো প্রশ্ন নিয়ে ঝামেলায় পড়ে যাবে তখনই তা পোস্টারে লিখে রাখলো। আপা ও অন্য বন্ধুরা সময় সুযোগ মতন তা নিয়ে আলোচনা করলো।

যে বিষয়গুলো শুধু এ কাজ নয় সকল কাজেই ভাবতে হবে:

১. দলের সবাই অংশগ্রহণ করতে পেরেছি তো?

২. যে উপায়ে উপস্থাপন করলাম তা শ্রেণিকক্ষের সকল বন্ধু শুনতে বা দেখতে বা বুঝতে পেরেছে কি? এক্ষেত্রে আমরা শ্রোতা বা দর্শক থেকে কেউ বাদ পড়লে কী করা যায় তা চিন্তা করবো।

অনুসন্ধানের গল্প

আমরা কি তবে গবেষক?

অন্বেষা আজ শ্রেণিকক্ষে ঢুকল খুবই উত্তেজিত হয়ে। বললো, এই তোমরা কি জান আমরা অনুসন্ধানী, আমরা যে গবেষক! নিসর্গ বললো, গবেষক! সে আবার কী? অনুসন্ধান বললো আরে শোনো, যারা ধাপে ধাপে নিয়ম মেনে প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করে তারাই হলো গবেষক। যেমনটা আমরা এ কয়দিন যে পরিবর্তন জানার কাজে করেছি।

খুশি আপা কখন যে পিছন এসে দাঁড়িয়েছেন, আমরা কেউ খেয়ালই তো করিনি। খুশি আপা বললেন- “হুম্ম আমার ছোট্ট গবেষকেরা আজ কী করতে চায়?"

সবাই হৈ চৈ করে উঠলো।

মিলি বললো, আপা গবেষণা কী?

রাজীব বললো,আপা অনুসন্ধান কী?

নিসর্গ জিজ্ঞাসা করলো, আপা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যাপারটা কী?

মুনিরা বললো, খুশি আপা, আমরা কি সত্যিই গবেষক? খবরের কাগজ পড়ে ভেবেছি শুধু বড়রাই গবেষক হয়।

খুশি আপা বললেন-চলো দেখি আমরা গবেষক কিনা!

আপা আমাদের কয়েকটি দলে ভাগ করে দিলেন। আমরা পাঠাগার (লাইব্রেরি), ইন্টারনেট, বই ঘেঁটে যা পেলাম তা হলোঃ

নিসর্গ:
কোনো কিছু খোঁজা অথবা কোনো প্রশ্নের উত্তর খোঁজার প্রক্রিয়াকেই বলে **অনুসন্ধান**।

ফাতেমা:
কোনো বিষয়ে জানার জন্য নিয়ম মেনে বা ধাপে ধাপে অনুসন্ধানের প্রক্রিয়াকে বলে **বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি**। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির নির্দিষ্ট কিছু ধাপ আছে।

অন্বেষা:
সত্য অনুসন্ধানের বা কোনো প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অগ্রসর হওয়াকেই সহজভাবে **গবেষণা** বলতে পারি। যারা এই অনুসন্ধানের কাজটি করেন তারাই গবেষক। ।

ফ্রান্সিস:

অনেক ধরনের অনুসন্ধান ও গবেষণা আছে। আশেপাশের সমাজ, সংস্কৃতির নিয়মতান্ত্রিক পরীক্ষা নিরীক্ষাই হলো সামাজিক অনুসন্ধান ও গবেষণা। সহজভাবে দেখলে সামাজিক অনুসন্ধানের ধাপগুলো হলো:

১/ অনুসন্ধানের বিষয়বস্তু (Topic) নির্বাচন করা,
২। অনুসন্ধানের জন্য বিষয়বস্তু সংক্রান্ত প্রশ্ন উত্থাপন করা,
৩। প্রশ্নের ভেতরকার মূল বিষয়গুলো (Key concept) নির্ধারণ করা,
৪। তথ্যের উৎস নির্বাচন করা (কোথা থেকে বা কার কাছ থেকে তথ্য পাওয়া যাবে),
৫। তথ্য সংগ্রহের উপকরণ নির্বাচন বা তৈরি (যা ব্যবহার করে উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়—যেমন সাক্ষাৎকারে জন্য প্রশ্ন, পূরণ করার জন্য লিখিত প্রশ্নমালা ইত্যাদি),
৬। তথ্য সংগ্রহ
৭। তথ্য বিন্যাস (সাজানো) ও বিশ্লেষণ
৮। সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

রাজীব:

অনুসন্ধান প্রক্রিয়ায় কিছু জানার জন্য উপযুক্ত মানুষের সাক্ষাৎকার নিয়ে, নিদর্শন পর্যবেক্ষণ করে বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সে বিষয়ের যে বৈশিষ্ট্য জানতে পারি তাই হলো **তথ্য**। একটা উদাহরণ দেওয়া যায়। প্রকৃতি পাঁচ জন মানুষের সাক্ষাৎকার থেকে তাদের খাদ্যাভ্যাস সংক্রান্ত যা কিছু জানতে পারল সে সবই তার জন্য তথ্য।

শফিক:

কিছু সাধারণ তথ্যের উৎস:

ব্যক্তিঃ

শিক্ষক, বন্ধুরা, অভিভাবক/পরিবারের সদস্য
প্রতিবেশী, বিজ্ঞ আর বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি

বই পুস্তকঃ বই, পত্রিকা, খবরের কাগজ, প্রতিবেদন/নথিপত্র বা দলিল

ডিজিটাল উৎসঃ ওয়েবসাইট, ইন্টারনেট, ভিডিও

নিদর্শনঃ কোন কিছুর নমুনা; যেমন **মাটি, পানি,** স্থান ইত্যাদি

নীলা:

যে উপায়ে আমরা তথ্য সংগ্রহ করি তাই **তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি বা কৌশল** এবং এ জন্য আমরা যে সব উপকরণ ব্যবহার করি তাই তথ্য **সংগ্রহের উপকরণ**। যেমন-সাক্ষাৎকার গ্রহণ তথ্য সংগ্রহের একটি কৌশল আর তথ্যদাতাকে দেওয়ার জন্য যে লিখিত প্রশ্নমালা হলো তথ্য সংগ্রহের একটি উপকরণ ।

তথ্য সংগ্রহের কিছু পদ্ধতি ও উপকরণ:

ক) প্রশ্নমালাঃ সাধারণত কিছু প্রশ্ন লিখে বা টাইপ করে দেই যে কাগজে তাতেই লিখে সাক্ষাৎকারদাতা উত্তর দেন। এটিতে চাইলে প্রশ্নের উত্তরগুলো কয়েকটি বিকল্প হিসেবে দেওয়া যায়।

যেমন- আমার বিদ্যালয়ের অবস্থান:
☐ গ্রামে ☐ শহরে

খ) সাক্ষাৎকারঃ একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে সামনাসামনি বা টেলিফোনে কিংবা অন্য মাধ্যমে পূর্বনির্ধারিত কিছু প্রশ্ন করা হয়। সেগুলো লিখে বা রেকর্ড করে সংরক্ষণ করা হয়।

গ) দলীয় আলোচনাঃ কোনো একটি ইস্যু বা বিষয়বস্তু নিয়ে একদল সমগোত্রীয় (যেমন- একদল শিক্ষার্থী বা একদল শিক্ষক বা একদল পরিচ্ছন্নতা কর্মী) ব্যক্তিদের আলোচনা। আলোচনা থেকে নির্দিষ্ট বিষয়ে যা উঠে আসবে তাই হবে অনুসন্ধানের জন্য তথ্য।

ঘ) পর্যবেক্ষণঃ এর মাধ্যমে আমরা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য মাথায় রেখে নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি, স্থান বা নিদর্শনকে খুব ভালোভাবে দেখি, যেমন- শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা কী কী কাজ করে অথবা একটি নির্দিষ্ট এলাকায় কী কী ধরনের মাটি আছে ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করা যায়। পর্যবেক্ষণের তথ্য লিখে, মিলিয়ে, ছক করে, যাচাই তালিকা (চেকলিস্টে) ব্যবহার করে সংরক্ষণ করা যায়। একটি যাচাই তালিকার উদাহরণঃ

শ্রেণিকক্ষের জিনিসপত্র	√ (আছে) × (নেই)	মন্তব্য নেই
১। দরজা	√	
২। জানালা	×	
৩। শিক্ষকের টেবিল	√	
৪। শিক্ষকের চেয়ার	√	
৫। বোর্ড	√	
৬। গ্লোব	×	
৭। শিক্ষার্থীর টেবিল	√	পর্যাপ্ত নয়
৮। শিক্ষার্থীর চেয়ার	√	পর্যাপ্ত নয়
৯। দেয়ালে টাঙানো শিক্ষা পোস্টার	√	শিক্ষকের তৈরি
১০। ক্যালেন্ডার	×	
১১। ময়লা ফেলার ঝুড়ি	×	

খুশি আপা:

আমরা যখন কোনো উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করি তখন সবসময় সরাসরি অনুসন্ধানের প্রশ্নটির উত্তর পাই না। এজন্য সংগৃহীত তথ্যগুলো সাজাতে হয়, কখনো কখনো কিছু হিসাব-নিকাশও করতে হয়। এভাবে তথ্যগুলো আমাদের কাছে অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে। তখন এই গুছানো তথ্য দিয়ে প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় অর্থাৎ প্রাসঙ্গিক সিদ্ধান্তে আসা যায়। তথ্য সাজানো গোছানোর এই প্রক্রিয়াকেই বলে **তথ্য বিশ্লেষণ**।

আমরা কি গবেষক?

চলো দেখি আমরা কী বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ধাপগুলো অনুসরণ করে অনুসন্ধান চালিয়েছি কিনা:

আত্মমূল্যায়ন

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গবেষণার ধাপ	হ্যাঁ/না
১. অনুসন্ধানের জন্য বিষয়বস্তু নির্ধারণ করেছি	
২. অনুসন্ধানের জন্য সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন উপস্থাপন করেছি	
৩. প্রশ্ন থেকে মূল বিষয়গুলো খুঁজে বের করেছি	
৪. তথ্যের উৎস নির্বাচন করেছি	
৫. তথ্য সংগ্রহের উপকরণ নির্বাচন করেছি বা তৈরি করেছি	
৬. তথ্য সংগ্রহ করেছি	
৭. তথ্য বিশ্লেষণ করেছি	
৮. সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি	

অনুসন্ধানী প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে সবাই এই ধাপগুলো পার হয়েছি। তাহলে আমরা সবাই তো ক্ষুদে গবেষক বা অনুসন্ধানী। তাই নয় কি?

অনুসন্ধান চলবে.........................

এতক্ষণ বন্ধুরা মিলে দলে অনুসন্ধান করেছি, এবারে একটু একা চেষ্টা করে দেখি। পারব কি একা করতে? চেষ্টা করেই দেখি না কি হয়! বন্ধুরা তো আছেই, আছেন খুশি আপাও। এবারে প্রত্যেকে আগের পদ্ধতি অনুসরণ করে নতুন কোনো প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করি চল। আর আগের ছকগুলোর সাহায্যে নিজেরাই নিজের কাজকে বিচার বিশ্লেষণের চেষ্টা করি।

অনুসন্ধানের ভ্রমণ পথ:

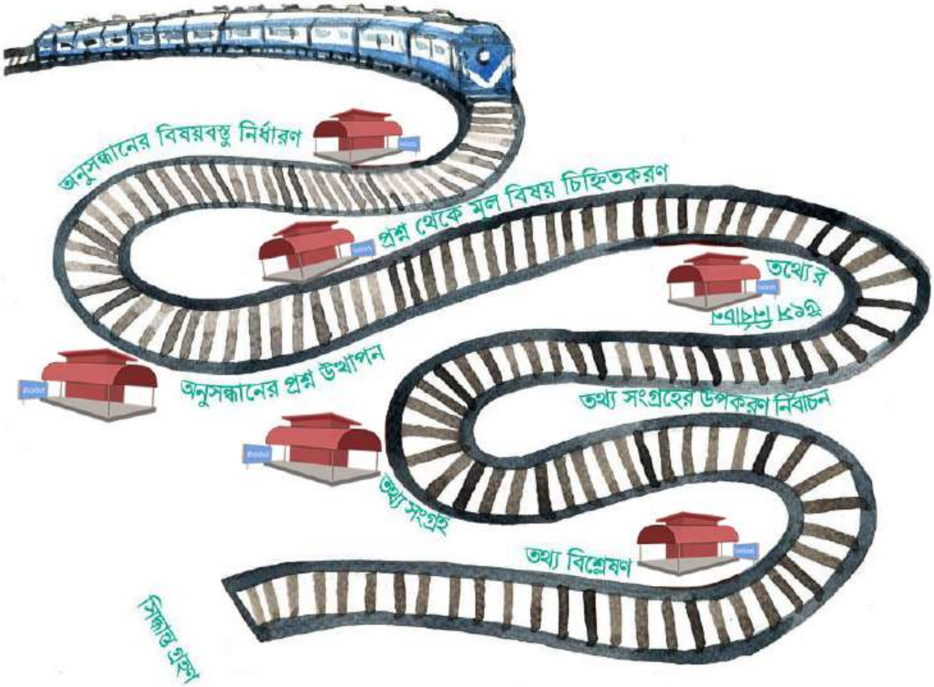

প্রতিটি অনুসন্ধান আসলে এক একটি ভ্রমণ বা যাত্রা। এখানে আছে কয়েকটি ধাপ বা স্টেশন। শুরুর স্টেশনে কী আছে আর শেষ স্টেশনে কী আছে বলো তো? তোমাদের দলের অনুসন্ধানটি একটি ভ্রমণ হিসেবে ছবি এঁকে দেখাতে পার। চাইলে রেলগাড়িও বানাতে পারো।

প্রত্যেক দল ঘুরে ঘুরে অন্য দলের পোস্টার দেখলাম। কী যে চমৎকার হয়েছে! উর্মিরা অনুসন্ধানে সাক্ষাৎকার ব্যবহার করেছে, তিতিররা ব্যবহার করেছে লিখিত প্রশ্নমালা, সাজ্জাদের দল তথ্য সংগ্রহের জন্য পর্যবেক্ষণ করেছে। আবার তথ্য বিশ্লেষণে উর্মিরা লিখিত তথ্যকে কয়েকটি শ্রেণিতে বা থিমে ভাগ করেছে, তিতিররা শতকরা হার আর সাজ্জাদরা সংখ্যা ব্যবহার করেছে। একেক জনের তথ্য-উৎসও ছিল ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু সকলেই সব ধাপগুলোই পার করেছে। গবেষণার রেলগাড়িতে চেপে প্রতি স্টেশনে থামতে হয়েছে সবাইকে, আর শেষ স্টেশনে এসে ভাবছে এখনতো এসেই গেলাম। উহু! হলো না, এতো মাত্র শুরু। সামনে দেখ আরও নতুন নতুন স্টেশন।

আমাদের অনুসন্ধানের রেলগাড়ি এগিয়ে যাচ্ছে কু ঝিক ঝিক ....

আমরা কতটুকু শিখলাম?

আমাদের অনুসন্ধান কাজ চলাকালে আমরা নিজেরা যেমন নিজের কাজকে বিচার বিশ্লেষণ (স্বমূল্যায়ন/আত্মমূল্যায়ন) করেছি, তেমনি আমাদের বন্ধুরা এবং খুশি আপাও (শিক্ষকের মূল্যায়ন) বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। কেন করেছেন জানো? যেন আমরা এই অনুসন্ধান ভ্রমণে কোন স্টেশনে থেমে না যাই। প্রতি

স্টেশনে আমাদের এক একজনের সময় বেশি বা কম লাগতে পারে। কিন্তু সঠিক পথে যাচ্ছি তো? এজন্যই আমাদের কাজের বিশ্লেষণে আছে বন্ধুরা, আছেন খুশি আপা।

দলীয় অনুসন্ধান কাজের জন্য দলীয় অনুসন্ধানের পুরো কাজটি শেষ হবার পর দলে বসে আলোচনা করে প্রত্যেক বন্ধুর জন্য নিচের ছকটি পূরণ করি। এখানে শিখনের ৭টি ক্ষেত্র দেয়া আছে। প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্য তিনটি বিকল্প আছে। সব কটি ক্ষেত্রে ৩টি কাজের ধরনের মধ্যে যেকোনো একটি নির্ধারণ করে বন্ধুটির কাজের অংশগ্রহণের অবস্থা নির্দেশ করি। সঠিকটিতে টিক (√) চিহ্ন দিয়ে বন্ধুটির শিখনের অবস্থা নির্দেশ করি।

সহপাঠীর মূল্যায়নের রুব্রিক্স:

নাম: ....

শিখনের ক্ষেত্র	কাজে অংশগ্রহণের ধরণ		
	দক্ষ বা অগ্রসর	আংশিক বিকাশমান হয়েছে	আমাদের সাহায্য প্রয়োজন
১. প্রশ্ন উত্থাপন	আমাদের বন্ধুটি দলে তিনটির বেশি চ্যালেঞ্জিং প্রশ্ন উত্থাপন করেছে।	আমাদের বন্ধুটি দলে দুই/একটি চ্যালেঞ্জিং প্রশ্ন উত্থাপন করেছে।	আমাদের বন্ধুটির অনুসন্ধানের জন্য প্রশ্ন খুজে বের করতে বেশ সমস্যা হচ্ছে।
২. তথ্য সংগ্রহের পরিকল্পনা	তথ্য সংগ্রহের পরিকল্পনায় বন্ধুটি মূল বা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। যেমন তথ্য উৎস চিহ্নিত করা, তথ্য সংগ্রহের উপকরণ তৈরি করা।	তথ্য সংগ্রহের পরিকল্পনায় বন্ধুটি অংশগ্রহণ করেছে, মতামত দিয়েছে।	তথ্য সংগ্রহের পরিকল্পনায় বন্ধুর ভবিষ্যতে আরও বেশি অংশগ্রহণ আশা করছি।
৩. তথ্য সংগ্রহ	আমাদের বন্ধুটি তথ্য সংগ্রহ সরাসরি অংশগ্রহণ করেছে। অর্থাৎ সে কোনো না কোনো তথ্য সংগ্রহ করেছে।	বন্ধুটি তথ্য সংগ্রহে সরাসরি অংশগ্রহণ না করলেও সাহায্য করেছে, যেমন-নোট নিতে, রেকর্ড করতে ইত্যাদি।	আমাদের বন্ধুটির তথ্য সংগ্রহে আরও সাহায্য আশা করি ভবিষ্যতে।
৪. তথ্য বিশ্লেষণ	বন্ধুটি সরাসরি তথ্য বিশ্লেষণ করেছে।	বন্ধুটি তথ্য বিশ্লেষণে সাহায্য করেছে- আইডিয়া দিয়েছে, পরিকল্পনা করেছে, কিছু হিসাব নিকাশে সাহায্য করেছে।	তথ্য বিশ্লেষণে ভবিষ্যতে বন্ধুটির আরও ভালোভাবে অংশগ্রহণ আশা করছি।

৫. সিদ্ধান্ত গ্রহণ	তথ্য সাজানো গোছানোর পর ফলাফল বা সিদ্ধান্ত গ্রহণে বন্ধুটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। যৌক্তিকভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পেরেছে।	সাজানো তথ্য থেকে আংশিকভাবে সিদ্ধান্তে/ফলাফলে পৌঁছাতে পেরেছে, যুক্তি দাঁড় করাতে সাহায্য করেছে।	বন্ধুটির সিদ্ধান্ত/ফলাফলে পৌঁছানোর জন্য সাহায্য আরও সাহায্য প্রয়োজন।
৬. প্রতিফলন/ কাজের বিচার বিশ্লেষণ	বন্ধুটি প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপে দলের কাজের বিচার বিশ্লেষণ করেছে, দল তাতে উপকৃত হয়েছে, ভুল ত্রুটি বুঝতে পারা গেছে।	বন্ধুটি কিছু ধাপে কাজের বিচার বিশ্লেষণ করেছে।	বন্ধুটির অনুসন্ধানী কাজে বিচার বিশ্লেষণ/ প্রতিফলন বিষয়টির দিকে আরও নজর দিতে হবে।
৭. অনুসন্ধানী কাজে সার্বিক অংশগ্রহণ	আমাদের বন্ধুটি পুরো অনুসন্ধানী প্রক্রিয়ায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছে।	বন্ধুটি কিছু কিছু ধাপে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করেছে অথবা প্রতিটি ধাপেই অংশগ্রহণ করেছে তবে স্বতঃস্ফূর্ত নয়।	বন্ধুটিকে আমাদের আরও বেশি উৎসাহ দিয়ে দলের কাজে তার আগ্রহ তৈরি করতে হবে।

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ক্লাব

আনুচিং মোগিনি ক্লাসে মন খারাপ করে বসে ছিল। মিলি এসে জিজ্ঞাসা করলো কিরে তোর মন খারাপ কেন? আনুচিং বললো, স্কুলে আসার পথে নদীর ধারে সে খুব একটা বাজে ঘটনা দেখে এসেছে, তাই তার মন খারাপ। মিলি বললো, আমি না তোর বন্ধু, আমাকে বল কী দেখেছিস? মিলি বললো, দেখলাম, নদীতে জেলেরা মাছ ধরার সময় একটি শুশুক (মিঠা পানির ডলফিন) ধরা পড়েছিল! তীরে নিয়ে আসার পর সেখানে অনেক লোক জমে যায়। তারপর একদল দুষ্টু লোক শুশুকটাকে চিনতে না পেরে ভয়ংকর কোন প্রাণী ভেবে মেরে ফেলেছে!

ছবি: শুশুক (মিঠা পানির ডলফিন)

খুশি আপা ক্লাসে ঢুকে ওদের কথা শুনতে পেয়ে বললেন, আনুচিং তুমি খুবই একটা দুঃখজনক ঘটনা দেখতে পেয়েছো। প্রতিদিনই সারা পৃথিবীতে অসংখ্য বিলুপ্ত প্রায় প্রাণী মানুষের সচেতনতার অভাবে মৃত্যুবরণ করছে। বিলুপ্ত প্রায় প্রাণী হত্যা করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। আসলে আজ আমরা এই বিষয় নিয়েই কাজ করবো।

বন্যপ্রাণী ও পরিবেশ ধ্বংসের স্বরূপ সম্পর্কে ধারণা:

এরপর খুশি আপা সবাইকে নিচের বন্যপ্রাণির ছবিগুলো দেখালেন।

বেঙ্গাল ফ্লোরিক্যান

হায়েনা

ময়ূর

নীল গাই

বনরুই

শ্লথ ভালুক

তারপর জিজ্ঞাসা করলেন- ছবির পাখি ও প্রাণীগুলো দেখতে কেমন লাগছে?

সবাই একযোগে বলে উঠলো, ছবির প্রাণীগুলো খুবই সুন্দর।

আপা জানতে চাইলেন, এই প্রাণীগুলো কোন দেশে পাওয়া যায়?

এবার সবাই চুপ। আসাদ বললো, আমি এদের মাঝে ময়ূর, ভালুক আর হায়েনা দেখেছি চিড়িয়াখানায়। কিন্তু বাকিদের কখনও দেখি নি। খুশি আপা হেসে বললেন, চিড়িয়াখানায় যাদের দেখতে পাই তারা নয়, প্রকৃতিতে?

তারপর বললেন, কেমন হতো যদি এই প্রাণীগুলো আমাদের চারপাশে সবসময় ঘুরে বেড়াতো? কিন্তু সেটা হয়তো আর কখনোই সম্ভব হবে না, কেননা এই প্রাণীদের আর বাংলাদেশে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না, বাংলাদেশে এদের আর একটি প্রাণীও বেঁচে নেই, এগুলো বিলুপ্ত হয়ে গেছে। অথচ অল্প কিছু দিন আগেও এদের অনেকেই বসবাস করতো বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে। ধরা যাক ময়ূরের কথা। মাত্র ১০০ বছর আগেও এরা কাক বা শালিখের মতো ঘুরে বেড়াতো সাভারসহ সারাদেশের শালবন ও অন্যান্য বনাঞ্চলে।

এবার খুশি আপা একটু গম্ভীর মুখে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি জানো কেনো এই সুন্দর সুন্দর প্রাণীরা বাংলাদেশ থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেল? উত্তরে সবাই আবারো চুপ করে রইলো। শুধু শফিক বললো, মনে হয় মানুষ অনেক গাছপালা কেটে ফেলাতে বন্যপ্রাণিগুলো থাকার জায়গা না পেয়ে অন্য দেশে চলে গেছে। খুশি আপা এ বিষয়ে কোন উত্তর না দিয়ে বললেন, এসো আবারও আমরা কয়েকটা ছবি দেখি।

ছবির নাম:........................

ছবির নাম:........................

ছবির নাম:........................

ছবির নাম:........................

ছবির নাম:........................

ছবির নাম:........................

ছবিগুলো দেখা হলে তিনি বললেন,

- ছবিগুলো দেখে তোমাদের কী মনে হচ্ছে? প্রত্যেকটি ছবির জন্য একটি করে নাম ঠিক করো এবং উপরের ছবিগুলোর নিচের শূন্যস্থানে লেখ।
- ছবিতে যা দেখানো হচ্ছে তার সাথে বন্যপ্রাণী বিলুপ্ত হওয়ার কোনো সম্পর্ক তোমরা কি খুঁজে পাও? উত্তর হ্যাঁ হলে, কী সম্পর্ক রয়েছে তা কি বলতে পারো?

তারপর বললেন—চলো, এ প্রশ্ন দুইটির উত্তর আমরা দলগতভাবে খুঁজে বের করি। এরপর সবাই ৫/৬ জনের ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে ১০ মিনিট আলোচনা করে প্রশ্ন দুইটির উত্তর লিখলো এবং দলগতভাবে উপস্থাপন করলো।

চলো আমরাও ওদের মতো আমাদের বন্ধুদের সাথে দলগতভাবে প্রশ্নগুলোর উত্তর খুজে বের করি।

১. ছবিগুলো দেখে তোমাদের কী মনে হচ্ছে? প্রত্যেকটি ছবির জন্য একটি করে নাম ঠিক করো এবং ছবির নিচের শূন্যস্থানে লেখ।

....

....

২. ছবিতে যা দেখানো হচ্ছে তার সাথে বন্যপ্রাণী বিলুপ্ত হওয়ার কোনো সম্পর্ক তোমরা কি খুঁজে পাও? উত্তর হ্যাঁ হলে, কী সম্পর্ক রয়েছে তা কি বলতে পারো?

....

....

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ক্লাব গঠন:

সবার কাছ থেকে খুশি আপা জানতে চাইলেন যে,

- এসব সমস্যার পেছনে কার ভূমিকা রয়েছে?
- এসব সমস্যা দূর করতে হলে কাকে ভূমিকা পালন করতে হবে?

চলো আমরাও এ প্রশ্নগুলোর উত্তর ভেবে বের করি

সবার উত্তর শুনে খুশি আপা প্রশ্ন করলেন যে,

- মানুষ হিসেবে আমাদের কোন দায়িত্ব আছে কিনা?
- আমরা কীভাবে বন্যপ্রাণী ও পরিবেশ সংরক্ষণে ভূমিকা রাখতে পারি?

বন্যপ্রাণী ও পরিবেশ সংরক্ষণের মতো এতো বড় কাজটি কি আমরা একা একা করতে পারবো?

সকলে সমস্বরে বলে উঠলো, না, একা করা কঠিন হবে।

তখন তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, সেক্ষেত্রে আমরা কীভাবে কাজ করলে বন্যপ্রাণী ও পরিবেশ সংরক্ষণের কাজে বেশি ভূমিকা রাখতে পারবো? উত্তরে সবাই বললো যে, সবাই মিলে কাজ করলে বেশি ভূমিকা রাখা যাবে। তখন সকলের উদ্দেশ্যে খুশি আপা বললেন-তাহলে আমরা বন্যপ্রাণী ও পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য একটি ক্লাব গড়ে তুলতে পারি কিনা, যেখানে সবাই মিলে কাজ করা যাবে? এই প্রস্তাবে সবাই খুব আনন্দিত হয়ে উঠলো। আনচিং বললো, দারুণ হবে তাহলে আমরা অসহায় শুশুকদের রক্ষা করতে পারবো!
ক্লাব গঠনের সিদ্ধান্ত হয়ে গেলে স্বাধীন জিজ্ঞাসা করলো যে তাহলে, আমাদের ক্লাবের কাজ কী হবে?
এ পর্যায়ে সবাই ইনক্লুসনের নীতিমালা অনুযায়ী দলে বিভক্ত হয়ে নিচে সংযুক্ত “শ্যামলী” নামের গল্পটি পড়লো।

শ্যামলী

অনেক অনেক দিন আগের কথা। জায়গাটা কোথায় তা নির্দিষ্ট করে জানা যায় না। একদেশে এক জলে থই থই মায়াবী নদীর ধারে খুব সুন্দর একটা গ্রাম ছিল। নাম ছিল তার শ্যামলী। গ্রামের একদিকে নদী আর বাকি তিন দিকে ছিল ঘন সবুজ বন। গ্রাম আর বনে ছিল রং বেরং এর ফুল আর গাছপালা। ঐ গ্রামে আর বনে গাছে গাছে উড়ে বেড়াতো সুন্দর সুন্দর সব কীট-পতঙ্গ আর পাখি। বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতো নানা রকমের বাহারি বন্যপ্রাণী। কীট-পতঙ্গ, পশু-পাখি আর মানুষ সবাই মিলেমিশে খুব সুখে শান্তিতে ছিলো।

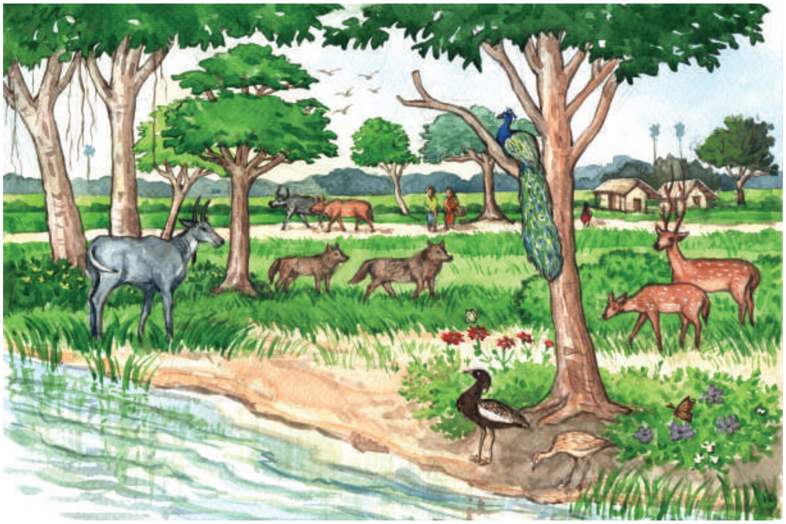

কিন্তু হলো কী? কয়েক বছরের ব্যবধানে দেখা গেল যে প্রথমে আস্তে আস্তে বনে ঘাস আর ছোট ছোট গাছের সংখ্যা কমে যেতে লাগলো। তারপর আস্তে আস্তে বড় বড় গাছপালার সংখ্যা আর বৃষ্টিও কমে যেতে লাগলো। গাছপালার সাথে সাথে কীট-পতঙ্গ আর পশু-পাখির সংখ্যাও কমে যেতে লাগলো। আস্তে আস্তে বৃষ্টি এতই কমে গেল যে নদীতে পানিও শুকিয়ে যেতে থাকলো। চারপাশের সবুজ রং উধাও হয়ে শুকনো খট খটে বাদামি রং ছড়িয়ে পড়তে শুরু করলো। নদীর পানি আর বৃষ্টি কমে যাওয়ায় ক্ষেতের ফসলও কমে যেতে লাগলো। আশংকা দেখা দিলো যে এ অবস্থা চলতে থাকলে কিছু দিনের মধ্যেই গ্রামের মানুষের খাবারও কমে যাবে। গ্রামটির অবস্থা এমনই প্রাণহীন বিবর্ণ হয়ে গেলো যে বহু বছর পর যারা গ্রামটিতে বেড়াতে আসতো তারা প্রথমে দেখে চিনতেই পারতো না যে এটাই তাদের সেই শ্যামলী নামের গ্রাম!

সবাই শুধু এটাই বলতো যে কী সুন্দর গ্রামটা এখন কেমন হয়ে গেল! কিন্তু কেউই জানতো না কী করলে শ্যামলী গ্রামের হারানো প্রাণ আবার ফিরিয়ে আনা যায়। এমনই যখন অবস্থা, তখন ঐ গ্রামের একদল ছেলেমেয়ে চিন্তা করলো এ অবস্থার একটা পরিবর্তন দরকার! ঠিক করলো তারা তাদের গ্রামের হারিয়ে যেতে বসা সবুজ গাছপালা, রং বেরং এর পশুপাখি, কীট-পতঙ্গ আর জল থই থই নদী আবার ফিরিয়ে আনবে কিন্তু তারা জানে না কীভাবে এ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব? একদিন তারা সবাই বসলো আলোচনার মাধ্যমে একটা উপায় খুঁজে বের করতে। চিন্তা করে দেখলো তারা আসলে সমস্যাটা সম্পর্কে অনেক প্রয়োজনীয় কথাই জানে না। আর তাই সেগুলো সমাধানও করতে পারছে না। ভেবে ভেবে তারা কয়েকটি বিষয় বের করলো যার উত্তর না জানলে সমস্যাটির সমাধান করা সম্ভব নয়। বিষয়গুলো হচ্ছে-

- আগে বনের গাছপালা, পশুপাখি, কীটপতঙ্গের সংখ্যা, বৃষ্টি আর নদীর পানির পরিমাণ কেমন ছিলো?
- এখন বনের গাছপালা, পশুপাখি, কীটপতঙ্গের সংখ্যা, বৃষ্টি আর নদীর পানির পরিমাণ কেমন আছে?
- কেন বনের গাছপালা, পশুপাখি, কীটপতঙ্গের সংখ্যা, বৃষ্টি আর নদীর পানির পরিমাণ কমে গেল?
- কি করলে আবার বনের গাছপালা, পশুপাখি, কীটপতঙ্গের সংখ্যা, বৃষ্টি আর নদীর পানির পরিমাণ বাড়ানো যাবে?

সমস্যা সমাধানের জন্য প্রশ্নগুলো চিহ্নিত করতে পেরে তারা ভীষণ খুশি হলো। এবার তারা ভাবতে শুরু করলো কীভাবে, কোথায় গেলে, কার কাছে থেকে এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে পারে। তারা তাদের শিক্ষকের কাছে জানতে পারলো যে, তাদের গ্রামে যে বন বিভাগের অফিস আছে ওরা বনের পশুপাখি আর গাছপালা নিয়ে কাজ করে। ওদের কাছে এসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যেতে পারে।

শিক্ষকের কথামতো ওরা বন বিভাগের লাইব্রেরি ঘেঁটে অনেক বই আর রিপোর্ট খুঁজে পেল যেখানে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর পাওয়া যেতে পারে। বই আর রিপোর্টগুলো নিয়ে তারা সবাই মিলে বেশ কিছু দিন পড়াশোনা করার পর তাদের বন আর বনের গাছপালা ও পশুপাখি বিষয়ক অনেক কিছু জানতে পারলো। কিন্তু মুশকিল হলো, যে বিষয়গুলো জানতে পারলো সবাই তাদের প্রশ্নের সাথে সম্পর্কযুক্ত হলেও সরাসরি তাদের প্রশ্নের উত্তর দেয় না। বই ও রিপোর্টগুলো থেকে তারা সমস্যা তৈরি হওয়ার আগে বনের গাছপালা ও পশুপাখির সংখ্যা কত ছিলো আর বর্তমানে এই সংখ্যা কত তা সবই জানতে পারলো। তারা খেয়াল করলো যে শুরুতে হঠাৎ করেই বনে নেকড়ের সংখ্যা দ্রুত কমে যায়। তারপর বনে দ্রুত গাছপালার সংখ্যা কমতে থাকে, এদিকে তৃণভোজী প্রাণীর সংখ্যা আবার বাড়তে থাকে। কিন্তু এসব কিছুর সাথে শ্যামলী গ্রামের সমস্যার কোন সরাসরি যোগাযোগ তারা খুঁজে পায় না।

সবকিছু নিয়ে তারা আবার হাজির হয় শিক্ষকের কাছে। সব শুনে শিক্ষক তাদের বললেন যে, এখন আসলে তাদের কথা বলতে হবে এমন একজন মানুষের সাথে যিনি বন আর বনের পশুপাখিদের সম্পর্ক খুব ভালো বোঝেন। সৌভাগ্যক্রমে তাদের গ্রামে এমন একজন আছেন যিনি বন্যপ্রাণী আর পরিবেশ নিয়ে গবেষণা করেন। ছেলে-মেয়েরা তখন ছুটলো সেই গবেষকের কাছে। গবেষক তাদের সব কথা আর প্রশ্ন মনোযোগ দিয়ে শুনে বললেন, তোমাদের কথা শুনে আমি মনে হয় ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছি। এক সময় বনে সব

ধরনের গাছপালা আর পশুপাখিই একে অপরের উপর নির্ভর করে শান্তিতে বসবাস করছিলো। যেমন ঘাস আর গাছপালা খাবারের জন্য নির্ভর করে মাটির উপর, হরিণ, গরু, মহিষ এরা বেঁচে থাকে ঘাস লতাপাতা খেয়ে। অন্যদিকে নেকড়েরা খাবারের জন্য শিকার করতো হরিণ, গরু, মহিষ প্রভৃতি তৃণভোজী প্রাণীদের। সবকিছুই ঠিকঠাক চলছিল। কিন্তু সমস্যা শুরু হয় তখনই যখন গ্রামের একদল শিকারী নিরাপত্তার অজুহাতে সব নেকড়েকে মেরে ফেলে।

শিক্ষার্থীরা জিজ্ঞাসা করলো, নেকড়ের সংখ্যা কমে যাওয়ার সাথে সমস্যার শুরুর সম্পর্কটা কী? তিনি তখন বললেন খেয়াল করে দেখ, বনের সব পশুপাখি আর গাছপালাই একে অপরের উপর নির্ভর করে বাঁচে। নেকড়েগুলো খাবারের জন্য শিকার করতো হরিণ, গরু, মহিষ আর অন্য তৃণভোজী প্রাণীদের। বনে যখন আর কোনো নেকড়ে থাকলো না তখন হরিণসহ তৃণভোজী প্রাণীদের সংখ্যা দ্রুত বেড়ে গেল। এই জন্যই তোমরা রিপোর্টগুলোতে পেয়েছো যে, যখন নেকড়ের সংখ্যা কমেছে তখন তৃণভোজী প্রাণীর সংখ্যা বেড়ে গেছে। শিক্ষার্থীরা বললো, এবার বুঝেছি! আর তৃণভোজীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়াতেই গাছপালার সংখ্যা কমে গেছে দ্রুত। কারণ, বেশি সংখ্যক তৃণভোজীরা বেশি বেশি গাছপালা খেয়ে ফেলেছে। গবেষক বললেন, একদম ঠিক ধরেছো। আর গাছপালা কমে যাওয়াতেই এই এলাকায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণও কমে গেছে। ফলে নদীর পানিও কমে গেছে। চারপাশ শুষ্ক ও বিবর্ণ হয়ে গেছে। তারা খুব উৎফুল্ল হয়ে বললো, এখন আমরা সমস্যাটি কীভাবে তৈরি হয়েছে তা অনুসন্ধান করে বের করতে পেরেছি। এবার আমাদের বের করতে হবে, কীভাবে সমস্যাটির সমাধান করা যাবে।

একজন বললো, তাহলে আমরা অনেক গাছ লাগিয়ে দিতে পারি যাতে আবার বৃষ্টিপাত বেড়ে যায়! কিন্তু বাকিরা বললো তাহলে তো তৃণভোজীরা আবার সেগুলো খেয়ে ফেলবে। তার চেয়ে বরং আমারা বনে কিছু নেকড়ে ছেড়ে দিতে পারি তাহলে ওরা তৃণভোজীদের সংখ্যা কমিয়ে বনের পরিবেশে আবার ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে পারবে। আর তখন গাছপালা, কীটপতঙ্গ, বৃষ্টিপাত আর নদীর পানি সবই বেড়ে যাবে। সেই সাথে আমরা বিভিন্ন জায়গায় গাছ লাগানো, পশুপাখির আবাস নির্মাণ এবং খাবারও নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করতে পারি। একজন শিক্ষার্থী বললো, গ্রামবাসীদেরও সতর্ক করতে হবে যেন কেউ একটা প্রাণীকে অপ্রয়োজনে হত্যা না করে! কিন্তু এটা তো জটিল একটি কাজ আমরা কীভাবে সেটা করতে পারবো? তখন সবাই আবার গেলো শিক্ষকের কাছে।

শিক্ষক তাদের বললেন চিন্তার কোন কারণ নাই। তোমরা যদি বন বিভাগে তোমাদের অনুসন্ধানের রিপোর্টসহ আবেদন করো, তাহলে বন বিভাগ অন্য বন থেকে নেকড়ে ধরে এনে আমাদের বনে ছেড়ে দিতে পারে। সবাই তখন খুশি হয়ে গেলো একজন বলে উঠলো আর বাকি কাজগুলো তো আমরাই সবাইকে সাথে নিয়ে করে ফেলতে পারবো। শিক্ষার্থীরা তাই করেছিল। ফলাফল হলো কয়েক বছরের মধ্যেই শ্যামলী গ্রামের হারানো প্রাণ আবার ফিরে এসেছিল। গ্রামবাসীও খাবারের অভাব থেকে বেঁচে গিয়েছিল।

গল্পটি পড়া শেষ হলে খুশি আপা তাদের বললেন চলো আমরা গল্পটি থেকে এবার নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে বের করি।

- শ্যামলী গল্পের শিক্ষার্থীরা তাদের এলাকার সমস্যাটি কীভাবে চিহ্নিত করেছিল?
- সমস্যাটি সমাধানের জন্য প্রথমে তারা কী করেছিল?
- সমস্যা সমাধানের জন্য তারা কী কী উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল?

চলো আমরাও “শ্যামলী” গল্পটি পড়ে গল্পটি থেকে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে বের করার চেষ্টা করি।

১. শ্যামলী গল্পের শিক্ষার্থীরা তাদের এলাকার সমস্যাটি কীভাবে চিহ্নিত করেছিল?

....

....

২. সমস্যাটি সমাধানের জন্য প্রথমে তারা কী করেছিল?

....

....

৩. সমস্যা সমাধানের জন্য তারা কী কী উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল?

....

....

সব দল তাদের উত্তর উপস্থাপন করার পর খুশি আপা জানতে চাইলেন যে, তারা তাদের ক্লাবের জন্য কী ধরনের কাজ নির্ধারণ করতে চায়?

এ পর্যায়ে সবাই-

আবারও ৫/৬ জনের দলে বিভক্ত হয়ে ক্লাবের কাজ কী হতে পারে তার একটি তালিকা তৈরি করলো। দলে কাজ করা শেষ হলে প্রত্যেক দল তাদের তালিকা পোস্টার পেপারসহ বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে উপস্থাপন করলো। উপস্থাপনার সময় সবাই আলোচনার মাধ্যমে সব দলের তালিকা থেকে যৌক্তিকভাবে বিশ্লেষণ করে বাস্তবায়নযোগ্য এমন কিছু কাজের তালিকা তৈরি করলো এবং সিদ্ধান্ত নিলো যে, ক্লাবের সদস্যরা একক ও দলীয়ভাবে সারা বছর ধরে তা বাস্তবায়ন করবে।

চলো এবার আমরাও নিজেদের মতো করে নিজেদের এলাকার বাস্তবতা অনুযায়ী কাজের ক্ষেত্র চিহ্নিত করি

(নিচে তিনটি উদাহরণ দেওয়া হলো বোঝার সুবিধার্থে, আমরা চাইলে এগুলো রাখতেও পারি আবার বাদও দিতে পারি)

- ফলজ ও বনজ বৃক্ষ রোপণ
- বন্য পশুপাখির আবাসস্থল সংরক্ষণ
- নিজের বিদ্যালয় ও আশেপাশের এলাকায় ময়লা- আবর্জনা ব্যবস্থাপনা
- ----------------------------
- ---------------------------
- ---------------------------

কাজের তালিকা তৈরি শেষ হলে, খুশি আপা বললেন, কী কাজ করবো তা তো ঠিক করা হলো! চলো এবার আমরা ক্লাবের কাজগুলো সুষ্ঠুভাবে করার সুবিধার্থে ক্লাবের একটি কমিটি গঠন করি। শিক্ষার্থীরা দলে বসে কমিটির গঠন অর্থাৎ

- মোট সদস্য সংখ্যা,
- কী কী পদ/পদবি থাকবে,
- তাদের কার কী কাজ হবে
- সাধারণ সদস্য কারা হতে পারবে
- সাধারণ সদস্যদের অধিকার ও কর্তব্য কী থাকবে

সে বিষয়ে প্রস্তাবনা তৈরি করলো এবং দলগতভাবে উপস্থাপন করলো। সবাই মিলে আলোচনা করে একটা সাধারণ কাঠামো ও অধিকার এবং দায়িত্বের বিবরণী তৈরি করলো। তারা ভেবে দেখলো যে কাজটি বেশ চ্যালেঞ্জিং। এ কাজে তাদের মাঝে মাঝে বড়দের পরামর্শ প্রয়োজন হতে পারে। কাজেই তারা ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষককে উপদেষ্টা হিসেবে কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করলো, কেননা তাঁরা বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের সাথে যুক্ত বিষয়গুলো ভালো জানেন।

এরপর তারা নির্বাচনের মাধ্যমে তাদের কমিটি গঠন সম্পন্ন করলো। নতুন কমিটি দ্রুতই তাদের প্রথম মিটিং এর তারিখ নির্ধারণ করলো এবং প্রথম মিটিং এ তারা পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ শুরু করে দিলো।

চলো আমরাও আমাদের বন্ধুদের সাথে মিলে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ক্লাবের কমিটির গঠন কেমন হবে তা ঠিক করি এবং নির্বাচনের মাধ্যমে কমিটির সদস্য বাছাই করি।

মূল্যায়ন:

এবার চলো আমরা নিচে যুক্ত আত্মমূল্যায়নের ছকের মাধ্যমে বন্য প্রাণী সংরক্ষণ ক্লাবের সাথে আমাদের কার্যক্রমের মূল্যায়ন করি।

ক্রম	ক্লাব কার্যক্রমে অংশগ্রহণের পর	সম্পূর্ণ একমত	মোটামুটি একমত	একমত নই
১।	আমি অন্তত: পক্ষে ৩টি স্থানীয় বিলুপ্তপ্রায় প্রাণী সম্পর্কে জানতে পেরেছি			
২।	আমি/আমরা-প্রাণী/বন্যপ্রাণি/পরিবেশ রক্ষায় অন্তত: পক্ষে ১টি উদ্যোগ গ্রহণ করেছি			
৩।	বন্যপ্রাণি সম্পর্কে আমার আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে			
৪।	বন্যপ্রাণির প্রতি আমার ভালবাসা আগের চেয়ে বেড়েছে			
৫।	আমি ভবিষ্যতে বন্যপ্রাণি ও পরিবেশ রক্ষায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ			
৬।	আমি বিশ্বাস করি আমার কাজে ক্লাব উপকৃত হয়েছে			
৭।	বন্যপ্রাণি ও পরিবেশ কেন আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তা বুঝতে পেরেছি			
৮।	বন্যপ্রাণি ও পরিবেশের বিলুপ্তির অন্তত: ৩টি কারণ সম্পর্কে আমি ব্যাখ্যা করতে পারি			

আমাদের এলাকায় মুক্তিযুদ্ধ

একদিন নিসর্গ ও অন্বেষা তাদের বন্ধুদের সাথে গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে বিলের ধারে ঘুরতে গেল। সেখানে হঠাৎ একটা জরাজীর্ণ স্তম্ভের মতো দেখে তাদের কৌতূহল হলো। একজন বয়স্ক মানুষকে জিজ্ঞাসা করে তারা জানতে পারলো ওটা আসলো একটা বধ্যভূমি। এই এলাকায় একসময় একটা যুদ্ধ হয়েছিল। তখন নাকি অনেক মানুষকে কারা এখানে হত্যা করেছিলো। সেজন্যই এই জায়গাটার নাম বধ্যভূমি। তাদের স্মৃতি ধরে রাখার জন্যই এই স্তম্ভ তৈরি করা হয়েছিল। এখন আর এটার কথা কেউ তেমন মনে করে না। যত্নের অভাবে এটা হারিয়ে যেতে বসেছে। ফেরার পথে সবাই বেশ চুপচুপ হয়ে থাকলো। কবে কখন যুদ্ধ হয়েছিলো? কাদের সাথে যুদ্ধ হয়েছিল? কেনই বা যুদ্ধ হয়েছিল? মানুষগুলোকে কেনই বা হত্যা করা হলো এই সব প্রশ্ন তাদের আচ্ছন্ন করে রাখলো সারাক্ষণ।

মুক্তিযুদ্ধকে আমরা জানতে চাই

পরদিন স্কুলে ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান ক্লাসে খুশি আপাকে পেয়ে তারা সবাই একসাথে অনেক প্রশ্ন করতে শুরু করলো। খুশি আপা একটু থেমে বললেন, থামো! থামো! আমাকে বুঝতে দাও আগে। তার মানে তোমরা আমাদের গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে বিলের ধারে মুক্তিযুদ্ধের সময়কার যে বধ্যভূমি আছে সেখানে গিয়েছিলে। খুব ভালো একটা কাজ করেছ তোমরা। আচ্ছা, তোমরা তো জানো যে, ১৯৭১ সালে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধ হয়েছিল পাকিস্তানিদের সাথে। তোমাদের প্রশ্নগুলো শুনে মনে হচ্ছে তোমরা আমাদের এলাকায় মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানতে চাচ্ছো। কিন্তু কীভাবে আমরা এ বিষয়ে জানতে পারি বলো তো?

নিসর্গ ও অন্বেষার বন্ধু স্বাধীন বলে উঠলো, কীভাবে আর, অনুসন্ধানী কাজের মাধ্যমে।

খুশি আপা বললেন যে, চমৎকার! তাহলে চলো আমরা একটি অনুসন্ধানমূলক প্রকল্পভিত্তিক কাজের মাধ্যমে এ সম্পর্কে জানার চেষ্টা করি!

জয় বললো, অনুসন্ধানমূলক কাজ তো আমরা জানি। কিন্তু প্রকল্পভিত্তিক কাজটা আবার কী?

খুশি আপা বললেন, তোমাদের কি ক্লাব কার্যক্রম বিষয়ক আলোচনায় শ্যামলী গল্পের (পৃ....) কথা মনে আছে? চলো আমরা নিচের প্রশ্নগুলো অনুসরণ করে "শ্যামলী" গল্পে শিক্ষার্থীরা যে পদ্ধতিতে কাজ করেছে তার যেসব ফলাফল পেয়েছিল সেসব আরেকবার পড়ে নেই।

কাজ শেষে জয় বললো, খেয়াল করেছো, গল্পের শিক্ষার্থীরা প্রথমে সমস্যা চিহ্নিত করেছে, তারপর অনুসন্ধানের ধাপ অনুসরণ করে প্রশ্নের উত্তর বা সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করেছে। কাজটি করতে তাদের তুলনামূলকভাবে দীর্ঘ সময় লেগেছে। গ্রামবাসী ও বনের পশুপাখিরা এ উদ্যোগের ফলে সরাসরি উপকৃত হয়েছে।

প্রকল্পভিত্তিক কাজে মূলত সক্রিয় অনুসন্ধানের মাধ্যমে আমরা কোনো বাস্তব সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করি অথবা কোনো চ্যালেঞ্জিং প্রশ্নের উত্তর খুঁজি। সাধারণত এই কাজগুলো তুলনামূলকভাবে দীর্ঘসময় ধরে করে থাকি। অনুসন্ধানমূলক কাজের মাধ্যমে আমরা যে ফলাফল পাই তা সমস্যাটির সাথে সংশ্লিষ্ট মানুষের কাছে উপস্থাপন করি যাতে তারা উপকৃত হতে পারে।

কিন্তু একটা বিষয় আমাদের পরিষ্কারভাবে জেনে রাখতে হবে যে, প্রকল্পভিত্তিক কাজ মানেই সব সময় অনুসন্ধানমূলক কাজ নয়। প্রকল্পে অনুসন্ধান থাকতে পারে কিন্তু কোন মডেল তৈরি করা বা কোন কিছু সৃষ্টি করা বা কোন বাস্তব সমস্যার সমাধানও প্রকল্পভিত্তিক কাজ হতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, বাগান করা, দেয়াল পত্রিকা তৈরি করা, শহিদ মিনার বা স্মৃতি সৌধ, পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার, সৌর জগৎ প্রভৃতির মডেল তৈরি করা বা কোনো এলাকার মানচিত্র প্রস্তুত করাও প্রকল্পভিত্তিক কাজের উদ্দেশ্য হতে পারে। অনেক সময় আবার তা অল্প সময়েও করা যেতে পারে।

মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আলোচনা

সমস্যা চিহ্নিতকরণ/অনুসন্ধানের জন্য প্রশ্ন

এরপর খুশি আপা বললেন, এবার এসো আমরা আমাদের সবার আগ্রহের বিষয় মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে ভাবি। সবাইকে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক কিছু প্রশ্ন করলেন, যার কিছু আমাদের জানা, কিছু অজানা। তিনি বললেন,

তোমরা কি জানো-

ক) আমাদের দেশ কীভাবে স্বাধীনতা পেয়েছে?

খ) কেনো মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে?

গ) কখন এবং কত দিন ধরে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে?

গ) কার নেতৃতে, কীভাবে সংঘটিত হয়েছে?

ঘ) শুধু কি বিখ্যাত মানুষেরাই মুক্তিযুদ্ধে অবদান রেখেছিলেন? আমাদের মতো সাধারণ মানুষেরা কী কোন অবদান রেখেছিলেন? তোমাদের পরিচিত কেউ কি মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ অথবা সহযোগিতা করেছিলেন?

ঙ) করলে, কী ধরনের ভূমিকা রেখেছিলেন?

শহিদ আজাদের গল্প শুনি

এই প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনার এক পর্যায়ে খুশি আপা মুক্তিযুদ্ধে সাধারণ মানুষের অবদান নিয়ে বলতে গিয়ে শহিদ আজাদের গল্প বললেন-

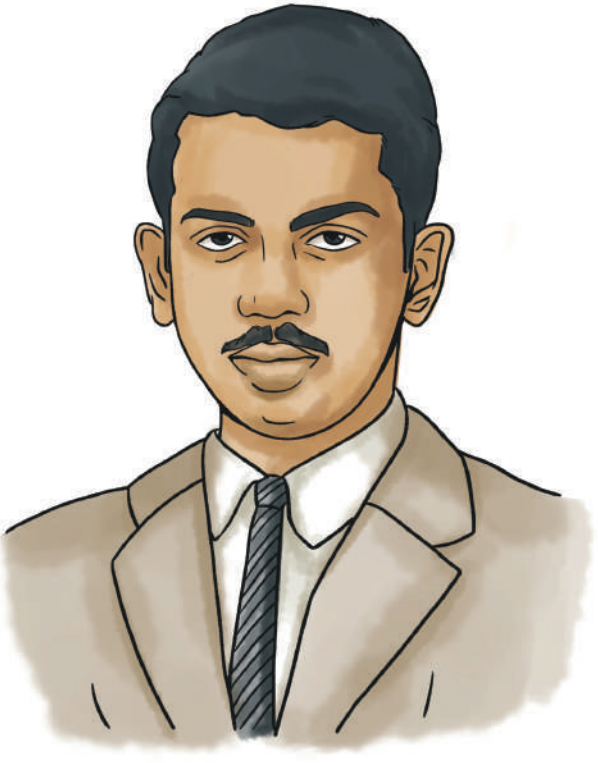

তোমরা হয়তো অনেকে শহিদ আজাদ এর কথা শুনেছো। মুক্তিযুদ্ধের সময় আজাদ ছিল তরতাজা এক তরুণ। কম বয়স হলেও সে ছিল ক্র্যাক-প্ল্যাটুন নামে একটি গেরিলা দলের ভীষণ সাহসী এক সদস্য। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর উপর গেরিলা আক্রমণ চালাতে বিন্দুমাত্র ভয় পেত না। যুদ্ধের এক পর্যায়ে আজাদ পাকিস্তানি বাহিনীর কাছে ধরা পড়ে যায়। আজাদের মা অনেক খোঁজাখুঁজি করে জানতে পারেন যে, আজাদকে রমনা থানায় আটকে রাখা হয়েছে। তিনি গিয়ে দেখেন আজাদকে এমনই অত্যাচার করা হয়েছে যে আজাদ উঠে দাঁড়াতে পারছে না। মাকে দেখে আজাদ বলল যে, বলেছে যদি আজাদ তার গেরিলা দলের বাকি সদস্যদের খবর জানায় তাহলে তাকে ছেড়ে দেবে। আজাদের মা তখন আজাদকে বলেন জীবন গেলেও যাতে আজাদ অন্য মুক্তিযোদ্ধাদের নাম ঠিকানা না বলে। আজাদ সম্মত হয়। দীর্ঘ অনাহারে শীর্ণ আজাদ মায়ের কাছে ভাত খেতে চেয়েছিল। আজাদের মা ভাত নিয়ে ফেরৎ এসে আজাদকে আর খুঁজে পান নি কখনও। আজাদের মা এরপর যে ১৪ বছর বেঁচে ছিলেন কখনও আর ভাত খান নি।

এ তো গেল এক শহিদ আজাদের কথা। এরকম হাজারো শহিদ আজাদ আমাদের প্রতিটি এলাকায় ছড়িয়ে আছে। আমরা কি কখনও জানবো না আমাদের এলাকায় ছড়িয়ে থাকা এমন বীর শহিদদের কথা? এমন বীর মায়েদের কথা?

নিশ্চয়ই জানবো। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, জানবো কীভাবে? আমাদের এলাকার এই ইতিহাস তো কোথাও লেখা নেই। আমরা কি শুধু অন্যদের খুঁজে পাওয়া ইতিহাস পড়াতেই সীমাবদ্ধ থাকবো ? না নিজেরাই বিস্মৃতির অতল থেকে হারাতে বসা ইতিহাস খুঁজে বের করে আনবো? কেমন হয়, যদি আমরা আমাদের এলাকায় মুক্তিযুদ্ধে সাধারণ মানুষের ভূমিকা অনুসন্ধান করে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে নতুন অধ্যায় যুক্ত করি?

- ক্লাসের সবাই একসাথে বলে উঠলো, আমরা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে নতুন অধ্যায় যুক্ত করতে চাই!
- খুশি আপা তখন বললেন, আমাদের এলাকার মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে তোমরা কী কী জানতে চাও?
- অনুসন্ধান বললো-কী ঘটেছিল, পাকিস্তানিরা এই এলাকায় কী অত্যাচার করেছিল?
- প্রকৃতির প্রশ্ন, এলাকায় মুক্তিযোদ্ধারা কী করেছিল?
- স্বাধীনের জানতে চাওয়া-সাধারণ মানুষ কী করেছিল?

সবার প্রশ্ন বোর্ডে লিখে নিয়েছিলেন খুশি আপা। আলোচনা শেষে সবার প্রশ্নগুলোকে কয়েকটি মূল প্রশ্নে ভাগ করা হল। সবাই মিলে এই প্রকল্পের মধ্য দিয়ে এগুলোর উত্তর খুঁজে বের করবে। যেমন-

১. মুক্তিযুদ্ধের সময় এই অঞ্চলের সাধারণ মানুষের উপর কিরকম অত্যাচার হয়েছিল?

২. মুক্তিযোদ্ধারা কীভাবে পাকিস্তানি সেনাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল?

৩. সাধারণ মানুষ কীভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করেছিল?

চলো প্রকৃতি, অনুসন্ধান ও তার বন্ধুদের মতো আমরাও এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার জন্য আমাদের প্রকল্পভিত্তিক কাজের পরিকল্পনা করি।

প্রস্তুতি (দলগঠন ও কর্মপরিকল্পনা)

মিলি জানতে চাইলো যে, কাজটি আমরা কীভাবে করবো? একা একা না সবাই মিলো?
খুশি আপা বললেন, তোমরা কীভাবে করলে ভালো হবে বলে মনে করো?
স্বাধীন বললো: একা একা কাজটি করা আমাদের জন্য বেশ চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। আবার সবাই মিলে করতে গেলেও গোল বেধে যেতে পারে। তাহলে মনে হয়ে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে করলে ভালো হয়।
জয় বললো: ক্লাসে তো আমরা এক এক জন ভিন্ন ভিন্ন এলাকা থেকে এসেছি। আমার মনে হয় একই এলাকায় বাস করে এমন সবাইকে একই দলে রাখলে কাজ করতে সুবিধা হবে। আরেক বন্ধু মোবারক যুক্ত করলো- তবে সংখ্যাটি ৬ থেকে ৮ জনের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকলেই ভালো হয়। বেশি হলে সবার অংশগ্রহণ কষ্টকর হতে পারে। এবারে মিলি বললো, তবে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবাই যাতে একই দলে কাজ করতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে। খুশি আপা বললেন, এই তো তাহলে আমরা এসব বিবেচনায় নিয়ে চল এবার দল গঠন করে ফেলি। সবাই তখন যার যার এলাকা অনুযায়ী ৬ থেকে ৮ জনের দল গঠন করে ফেললো।
দল গঠনের আলোচনা শেষে খুশি আপা জানতে চাইলেন, ক্লাসে কারো পরিবারের কেউ মুক্তিযুদ্ধে শহিদ

হয়েছেন কিনা?
রবিন বললো, আমার বড় চাচা মুক্তিযুদ্ধে শহিদ হয়েছেন।
খুশি আপা রবিনকে তার চাচার শহিদ হওয়ার ঘটনা সবাইকে শোনানোর অনুরোধ করলে রবিন সবাইকে ঘটনাটা বললো।
এ পর্যায়ে খুশি আপা জানতে চান যে, মুক্তিযুদ্ধের সময়ে এই অঞ্চলে যে এরকম আরও অনেক ঘটনা ঘটেছিল সেসব কথা কোথা থেকে জানা যেতে পারে?
মুক্তি বললো, এলাকার বিভিন্ন বয়স্ক মানুষের কাছ থেকে।
স্বাধীন- পাঠ্যবইয়ে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে যেসব তথ্য আছে সেখান থেকে।
অনুসন্ধান বলল, স্থানীয় লাইব্রেরি থেকে। প্রকৃতির উত্তর, ওই সময়ের পত্রপত্রিকা থেকে। মিলি বলল, শুনেছি ইন্টারনেটে বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকেও অনেক তথ্য জানা যায় ইত্যাদি।
খুশি আপা এবার চিন্তিত ভঙ্গিতে বললেন, এসব উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য সঠিক কিনা তা কীভাবে জানব?
সবাই বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লো। জয় বললো, আমরা কয়েক জায়গা থেকে তথ্য নিয়ে মিলিয়ে দেখতে পারি, যদি মিলে যায় তাহলে বুঝবো প্রাপ্ত তথ্য সঠিক।
খুশি আপা বললেন, এবার পরিকল্পনার পালা। তোমরা নিশ্চয় ভুলে যাও নি এর আগে আমরা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধন পদ্ধতির ধাপসমূহ শিখেছিলাম। এখানে পরিকল্পনা করার জন্য আমরা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধন পদ্ধতির ধাপসমূহ ব্যবহার করতে পারি। এবার আমাদের এলাকায় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রকল্পের কাজটি কীভাবে করা যেতে পারে খুশি আপার সহযোগিতায় অনুসন্ধান ও তার বন্ধুরা তার একটি পরিকল্পনা তৈরি করলো।

এবারে চলো আমরাও ওদের মতো প্রকল্পভিত্তিক কাজের মাধ্যমে আমাদের এলাকায় মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস খুঁজে বের করার জন্য পরিকল্পনা তৈরি করি।

দলের নিয়ম-নীতি

খুশি আপা মূল কাজ শুরু করার পূর্বে দীর্ঘমেয়াদি এই কাজে দলের সদস্যরা কোনো নিয়ম-নীতি মেনে চলবে কিনা জানতে চাইলে সবাই নানা রকম মতামত দিলো। সেসব মতামত যাচাই-বাছাই করে শিক্ষার্থীদের পালনীয় নিয়ম-নীতির একটি তালিকা তৈরি করলো এবং সকলে অনুসরণ করার জন্য একমত হলো। প্রকৃতি ও তার বন্ধুরা যে তালিকা তৈরি করলো তার কয়েকটি নিয়ম নিচে উল্লেখ করা হলো। এগুলো নিয়ম-নীতির কিছু উদাহরণ মাত্র, অন্যরা চাইলে অন্যভাবেও পরিস্থিতি অনুযায়ী তাদের নিয়ম-নীতি তৈরি করে নিতে পারে। এবারে চলো আমরাও আমাদের কাজের জন্য সুবিধাজনক একটি নিয়ম-নীতির তালিকা তৈরি করি।

শিক্ষার্থীদের পালনীয় নিয়ম-নীতি

১.	কাজ করার সময় সকল সদস্যের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা
২.	দলের সবার মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে নিজের মতামত যৌক্তিকভাবে দৃঢ়তার সাথে তুলে ধরা
৩.	নিজের মতামত প্রকাশে কখনও কোনো কারণেই দ্বিধা না করা

৪.	অন্যের মতামত শ্রদ্ধার সাথে যৌক্তিক বিচার-বিশ্লেষণ করে গ্রহণ করা
৫.	দলীয় কাজে ছেলে-মেয়ে ও সক্ষমতার ধরন নির্বিশেষে দলের সকল সদস্যের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা
৬.	সাক্ষাৎকার নেওয়ার আগেই সাক্ষাৎকারদাতার অনুমতি নেওয়া
৭.	
৮.	
৯	
১০	

বিদ্যমান তথ্য পর্যালোচনা (লিটারেচার রিভিউ)

আজ খুশি আপা জানতে চাইলেন যে, এই অঞ্চলের মুক্তিযুদ্ধের সময়কার যেসব ঘটনা ইতোমধ্যে সংরক্ষণ করা হয়েছে সেসব কোথায় পাওয়া যাবে? এর উত্তরে সবাই মিলে যা বললো তা একটা তালিকা করলে দাড়ায়-বই, পত্রিকা, ডকুমেন্টারি, দলিলপত্র ইত্যাদি। সবাই মিলে আলোচনা করে তখন ঠিক করলো যে, সব দল প্রয়োজনীয় তথ্যের সম্ভাব্য উৎসের তালিকা তৈরি করবে এবং তালিকা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মাঝে উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করবে এবং তথ্য উৎসের তালিকা, অনুসন্ধান প্রক্রিয়াসহ প্রাপ্ত তথ্যাবলি নিয়ে খুশি আপার সাথে আলোচনা করবে।

পরদিন কাজের অবসরে অন্বেষার বাসায় নিসর্গ গিয়ে হাজির। ওরা সময় নষ্ট না করে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক প্রকল্পের কাজ শুরু করে দিতে চায়।

অন্বেষা বলল, এর আগে যে পদ্ধতি অনুসরণ করে আমরা অনুসন্ধান করেছি, এই কাজেও সেই একই পদ্ধতি অনুসরণ করলেই আমাদের হবে। আমার মনে হয় শুধু একটা বিষয় নিয়ে আলাদা করে ভাবা দরকার।

নিসর্গ : কী সেটা?

অন্বেষা: মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে অনুসন্ধান করতে হলে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো আগে জেনে নেয়া দরকার। যদিও এর আগে অনুসন্ধানমূলক কাজের ক্ষেত্রে যে মৌলিক ধাপগুলোর কথা জেনেছিলাম সেখানে বিদ্যমান তথ্য পর্যালোচনা (লিটারেচার রিভিউ) বা ছাপানো বই, পত্র-পত্রিকা, দলিলপত্র পড়ে তথ্য সংগ্রহের ধাপটি ছিল না। অনুসন্ধানমূলক কাজের ক্ষেত্রে অনেক সময় বিদ্যমান তথ্য জানা থাকলে নতুন কী তথ্য সংগ্রহ করতে হবে তা নির্ধারণ করা সহজ হয়।

নিসর্গ : তুমি ঠিকই বলেছো। আমার মনে হয় আমরা এ বিষয়ে কিছু বই পড়তে পারি। আর এমন কারো সাথে কথা বলতে পারি যে এ বিষয়ে খুব ভালো জানে। তাহলে তার কাছ থেকে কোনো বই, পত্রিকা এসবও পাওয়া যেতে পারে।

দুজনে মুক্তিদের বাসায় গিয়ে মুক্তিকে বলতেই সেও উৎসাহী হয়ে উঠলো। তারপর তিনজনে মিলে মুক্তির দাদাকে গিয়ে ধরলো। মুক্তির দাদা বই পড়তে খুবই পছন্দ করেন। মুক্তি, প্রকৃতি আর অনুসন্ধানের কৌতূহল শুনে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত লাইব্রেরি থেকে একগাদা মুক্তিযুদ্ধের বই বের করে আনলেন। তারপর সেগুলো থেকে মজা করে প্রশ্ন করে করে তার উত্তর বলার ঢংয়ে পড়ে শোনাতে লাগলেন।

মুক্তিযুদ্ধ যেন কবে হয়েছিল?

তোমরা বোধহয় শুনে মুচকি হাসছ। কে না জানে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল ১৯৭১ সনে। তবুও জানতে ইচ্ছে করে এটি কেন মুক্তিযুদ্ধ? কেন?

খুব সহজ কথা-মুক্তির জন্য যুদ্ধ। হ্যাঁ, এবার প্রশ্ন উঠবে, কার মুক্তি? কার কাছ থেকে? কেনইবা মুক্তির প্রশ্ন উঠল?

তোমরা আসলে জানো সবই। আমাদের মুক্তি, এই বাংলার অর্থাৎ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের, জনগণের মুক্তি। মুক্তি চেয়েছি আমরা পাকিস্তানের কাছ থেকে। কেন চেয়েছি মুক্তি, তার অনেক কারণ আছে। সেই কারণগুলোও যে তোমরা জানো না তা নয়। একটু ভাব, কিংবা চলো নিজেদের মধ্যে আলোচনা করি। ঠিক বেরিয়ে আসবে কারণগুলো।

সেটা বুঝতে হলে যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা জরুরি তা হলো—

- মাতৃভাষার অধিকার রক্ষার আন্দোলন
- বৈষম্য ও বঞ্চনা
- প্রতিকারে ছয়দফার আন্দোলন
- উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান
- ১৯৭০ এর নির্বাচনে বিজয় ও পাকিস্তানের ষড়যন্ত্র

বিষয়গুলো নিয়ে এই সব বই থেকে সংক্ষেপে তোমাদের জানিয়ে দিচ্ছি। তোমাদের শিক্ষক এবং অন্যান্য আরও অনেক বই-পুস্তক বা এলাকার বয়স্কদের কাছ থেকেও কিছু জানতে পারবে।

হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত ও মোহাম্মদ সুলতান কর্তৃক প্রকাশিত ১৯৫৩ সালের ঐতিহাসিক সংকলন একুশে ফেব্রুয়ারী বইয়ের কয়েকটি সংগ্রামী ছবি। (শিল্পী মুর্তজা বশীর)

ভাষা আন্দোলন

ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে তোমরা অনেকটাই জান। তবুও ছোট্ট করে বলি। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরপরই নতুন দেশের রাষ্ট্রভাষা কী হবে সেই প্রশ্নটা ওঠে। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের চাপ ছিল উর্দু ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষা করার। অথচ বাংলা ছিল পূর্ববাংলা তথা পাকিস্তানের বেশির ভাগ মানুষের মাতৃভাষা। পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে পূর্ব বাংলার জনসংখ্যা ছিল অনেক বেশি, তারপরও রাষ্ট্রভাষার বিষয়ে তাদের দাবি উপেক্ষিত হয়, এটা অন্যায়! দেশের বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, সাহিত্যিকরা তাই প্রতিবাদ জানান সঙ্গে সঙ্গে। ছাত্র-ছাত্রীরাও প্রতিবাদে ফেটে পড়েছিল। কিন্তু পাকিস্তান সরকারের জেদ এতটাই ছিল যে, রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে আয়োজিত ছাত্রদের সমাবেশে পুলিশ গুলি চালিয়েছিল, তাতে কয়েকজন নিহত হন। এঁরা হলেন ভাষা শহীদ—আবুল বরকত, আব্দুস সালাম, রফিকউদ্দিন আহমেদ, আব্দুল জব্বার ও শফিউর রহমান প্রমুখ।

শেষ পর্যন্ত বাংলাভাষার অধিকার রক্ষার দাবি পাকিস্তান সরকার মানতে বাধ্য হয়েছিল। অন্যায়ের কাছে মাথা নত না করে আমরা বিজয়ী হয়েছিলাম। সাহিত্যিক আবুল ফজল তাই লিখেছিলেন—একুশ মানে মাথা নত না করা।

বঞ্চনা ও বৈষম্য

গোড়া থেকেই পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার বাঙালিদের প্রতি বৈষম্য চালিয়ে আসছিল। কয়েকটা হিসেব তোমাদের দিচ্ছি, তা থেকে বিষয়টা স্পষ্ট বুঝতে পারবে। তবে তার আগে বুঝে নেওয়া দরকার বৈষম্য বলতে কী বোঝায়? সহজ কথায় বৈষম্য মানে কোনো বিষয়ে সমতা বা ন্যায়সঙ্গত ভাগ না হয়ে অন্যায়ভাবে প্রভেদ করা বা অসমভাবে বন্টন করা। কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিলেই কথাটা পরিষ্কার হবে।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে:

প্রথমত: পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকেরা প্রথম থেকেই পূর্ব পাকিস্তানকে স্বায়ত্বশাসন দিতে অনীহা দেখায়।

দ্বিতীয়ত: পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ বাঙালী হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তানের মন্ত্রীসভায় বাঙালীর সংখ্যা ছিল খুবই কম।

১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের সরকারকে অন্যায়ভাবে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেয়া হয়।

প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বৈষম্য

১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় প্রশাসনের ৪২০০০ জন কর্মকর্তার মধ্যে বাঙালী ছিল মাত্র ২৯০০ জন। ১৯৬২ সালে পাকিস্তানের মন্ত্রণালয়গুলোতে ৯৫৪ জন শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তার মধ্যে বাঙালী ছিলেন মাত্র ১১৯ জন।

সামরিক ক্ষেত্রে বৈষম্য

সামরিক বাহিনীতে নিয়োগের কোটা ছিল পাঞ্জাবী ৬০%, পাঠান ৩৫% এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য অংশ ও পূর্ব পাকিস্তান মিলে অবশিষ্ট ৫%। অবশ্য বাঙালীর দাবীর মুখে এ সংখ্যা পরবর্তীতে কিছুটা পরিবর্তন করা হয়।

১৯৬৬ সালে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর মোট ১৭ জন শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তার মধ্যে বাঙালী ছিলেন মাত্র ১ জন।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্য

১৯৪৯-৫০ অর্থবছরে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের মাথাপিছু আয় ছিল ৩০৫ টাকা আর পশ্চিম পাকিস্তানের ছিল ৩৩০ টাকা। ১৯৬৭-৬৮ সালে এই বৈষম্য বেড়ে পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষেত্রে হয় ৩৫২ টাকা অথচ পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষেত্রে এটা বেড়ে দাঁড়ায় ৫৩০ টাকায়।

পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ব্যাংকসহ প্রায় সকল ব্যাংক, বীমা ও বাণিজ্য কোম্পানীর সদর দফতর ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। পাকিস্তানের প্রথম পাঁচ বছর মেয়াদি পরিকল্পনায় পূর্বপাকিস্তানের বা বর্তমান বাংলাদেশের জন্য বরাদ্দ ছিল ১১৩ কোটি রুপি। অথচ পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ ছিল ৫০০ কোটি রুপি। ১৯৫৬ সালে শুধু করাচির

উন্নয়নের জন্য ব্যয় করা হয় বাজেটের মোট ব্যয়ের ৫৬.৪% (৫৭০ কোটি টাকা) অথচ পুরো পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ব্যয় করা হয় বাজেটের মাত্র ৫.১০%। নতুন রাজধানী ইসলামাবাদ নির্মাণের জন্য ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত ব্যয় করা হয় ৩০০ কোটি টাকা। অথচ ঢাকা শহরের জন্য ব্যয় কর হয় মাত্র ২৫ কোটি টাকা।

পাকিস্তান সরকার এরকম অসংখ্য বৈষম্য সৃষ্টি করে রাষ্ট্র পরিচালনায়। ফলে এর প্রতিবাদে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে স্বাধিকার ও স্বাধীনতা আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে।

প্রতিকারে ছয়দফা

পূর্বপাকিস্তানের জনগণ ও রাজনীতিকদের মধ্যে তখন সাহস ও উদ্যমে আস্থাভাজন নেতা শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি এই বৈষম্য ও বঞ্চনার অবসান চেয়েছিলেন। তিনি চেয়েছেন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সম্পদ, সুযোগ ও অন্য সব বিষয়ে সমতা থাকুক। কেন আমরা অন্যায় মেনে নেব? এটা তিনি মানতে পারেন নি। তাই তিনি ঘোষণা করলেন বিখ্যাত ছয়দফা দাবি। এটা ১৯৬৬ সালের কথা। এতে প্রত্যেক প্রদেশ যাতে যার যার সম্পদ ভোগ করতে পারে, রপ্তানি করে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা নিজেদের কাছে রাখতে পারে, খাজনার টাকায় প্রদেশের খরচ নির্বাহ করতে পারে এমন সব দাবি ছিল।

গণঅভ্যুত্থান

তখন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট একজন সামরিক কর্মকর্তা—জেনারেল আইয়ুব খান। তিনি অস্ত্রের ভাষায় জবাব দেওয়ার হুমকি দিলেন। পরে শেখ মুজিবকে প্রধান করে ৩৫ জন আসামীর বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার মামলা ঠুকে দিলেন। এটি ঐতিহাসিক আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে পরিচিত। তাতে অবশ্য উল্টো ফল হলো। জনগণ তাদের প্রিয় নেতার মুক্তির জন্যে এমন আন্দোলন শুরু করল যে আইয়ুব খানকেই ক্ষমতা ছাড়তে হলো। তখন মানুষের মুখে মুখে শ্লোগান ছিল—জেলের তালা ভাঙবো, শেখ মুজিবকে আনবো। এটিই ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, এই আন্দোলনে ছাত্র-ছাত্রী ও জনতা একেবারে রাজপথ কাঁপিয়ে দিয়েছিল। তরুণ আসাদ ও কিশোর মতিউরসহ অনেকেই শহিদ হয়েছিল। পুলিশ, মিলিটারি নামিয়েও আন্দেলন থামানো যায় নি। এমনকি ছাত্র ও শ্রমিকের মৃত্যুতেও মানুষ পিছপা হয় নি। এই সময়ে মুক্ত শেখ মুজিবকে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করেছিল।

সত্তরের নির্বাচন

আইয়ুব খানের পরে আরেক সামরিক কর্মকর্তা জেনারেল ইয়াহিয়া খান এলেন ক্ষমতায়। তিনি বুঝলেন আগের মতো চললে হবে না। তাই নতুন সংবিধান রচনা ও দ্রুত একটি জাতীয় নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি দিলেন। নির্বাচন হলো ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরের ৭ তারিখ। সরকার ভেবেছিল শেখ মুজিবের দল আওয়ামী লীগ কিছু আসন পেলেও দুই প্রদেশ মিলিয়ে সরকার গঠনের মতো সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে না। কিন্তু হলো কি, নিরঙ্কুশ বিজয় (অর্থ হচ্ছে বিরাট ব্যবধানে একচেটিয়া বিজয়। ইংরেজিতে landslide victory, শাব্দিক মানে ভূমিধ্বস বিজয়) পেল আওয়ামী লীগ। পাকিস্তানের জাতীয় সংসদের মোট ৩০০ জন প্রতিনিধির মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ ছিল মোট ১৬৯ জন। এই ১৬৯ জনের মধ্যে ২টি ছাড়া বাকি ১৬৭ জন সদস্যই নির্বাচিত হয়েছিলেন আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের মধ্য থেকে। দ্যাখো পাকিস্তান জাতীয় সংসদের মোট সদস্য সংখ্যা হলো ৩০০, তাহলে ১৫১ প্রার্থী বিজয়ী হলেই তো একটি দল সরকার গঠন করতে পারে। আওয়ামী লীগের ১৬৭ জন প্রার্থী জয় লাভ করেছে। ফলে তারাই কেন্দ্রে সরকার গঠন করার ন্যায্য দাবিদার। বঙ্গবন্ধু হবেন পাকিস্তানের প্রথম নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু এটা পাকিস্তানি অধিকাংশ রাজনীতিক,মিলিটারি বা সামরিক কর্মকর্তা, সরকারি কর্মকর্তা, আমলাতন্ত্র কিছুতেই মানতে পারে নি। ফলে তারা নানা রকম ষড়যন্ত্র পাকাতে শুরু করে।

ওদের ষড়যন্ত্র আমাদের অসহযোগ

এইভাবে এসে গেল ১৯৭১ সাল। ঠিক হলো পয়লা মার্চ ঢাকায় জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন বসবে। কিন্তু পাকিস্তানের তো সেই এক রোগ—বাঙালির নেতৃত্ব মানবে না। পাকিস্তানের রাজনীতিবিদ জুলফিকার আলী ভুট্টো ছিলেন অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী। তিনি কয়েকজন সামরিক কর্মকর্তার সাথে গোপন ষড়যন্ত্র আঁটলেন, তাতে রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খানকেও যুক্ত করে নেয় তারা। মূল লক্ষ্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের হাতে পাকিস্তানের ক্ষমতা না দেওয়া। ভুট্টোর চাপে পয়লা মার্চের অধিবেশন বন্ধ করেন ইয়াহিয়া খান। আর তাতে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ক্ষোভে ক্রোধে রাজপথে নেমে আসে। বঙ্গবন্ধুও জোরালো ভাষায় প্রতিবাদ জানালেন আর শুরু করলেন অসহযোগ আন্দোলন। অসহযোগ আন্দোলন নিয়ে দুটো কথা বলে নিই। অসহযোগ মানে সহযোগিতা না করা। আর তা আন্দোলনে রূপ নেয় যখন কোনো জনগোষ্ঠী কোনো কর্তৃপক্ষের সাথে অসহযোগিতা শুরু করে। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান সরকারের সাথে অসহযোগিতার ডাক দিয়েছিলেন। অর্থাৎ সরকারি কর্মীরা কাজে যোগ দেবেন না, সব অফিস-

আদালত, স্কুল-কলেজ বন্ধ থাকবে। এভাবেও সরকারকে দাবি মানতে বাধ্য করা যায়। ব্রিটিশ আমলে মহাত্মা গান্ধি এ ধরনের আন্দোলন প্রথম শুরু করেছিলেন।

৭ই মার্চের পর বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে বাংলাদেশের সকল স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত, কল-কারখানা বন্ধ হয়ে যায়। খাজনা ট্যাক্স আদায় বন্ধ হয়ে যায়। ক্যান্টনমেন্ট ব্যতীত সমস্ত দেশে বঙ্গবন্ধুর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭১ এর মার্চে বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে বাংলাদেশের মানুষ পাকিস্তান সরকারের নির্দেশনা অমান্য করে পূর্ণ অসহযোগিতা করে। ইতিহাসে এটা মার্চের অসহযোগ আন্দোলন নামে পরিচিত।

৭ই মার্চের ভাষণ

এই সময়ের আরেকটি বড় ঘটনা হল ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চে রেসকোর্স ময়দানে লাখো জনতার সামনে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ। নেতার ওপর জনতার চাপ ছিল স্বাধীনতা ঘোষণার। আর পাকিস্তান এমন সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। বঙ্গবন্ধু সরাসরি স্বাধীনতার ঘোষণা দিলে তারা জনতা ও নেতা সবার ওপরই অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিল। তবে আমাদের নেতা ছিলেন দূরদর্শী অভিজ্ঞ মানুষ। তিনি সুকৌশলে এমনভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে সভা শেষ করলেন যে তাতে সাপও মরল লাঠিও ভাঙল না—কথাটা বলা হলো, আবার ঠিক সরাসরি ঘোষণাও হলো না। বললেন—'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' এটিই ছিল সবার কাছে স্বাধীনতার বার্তা। আজ তাঁর এই ১৭ মিনিটের তাৎক্ষণিক বলা ভাষণটিকে ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যের স্বীকৃতি দিয়েছে।

আলোচনা, অপারেশন সার্চলাইট ও গণহত্যা

পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে এবার তারা আন্দোলন থামাতে আলোচনার প্রস্তাব দিলো। গণতন্ত্রে বিশ্বাসী বঙ্গবন্ধু তাতে সায় দিলেন। কিন্তু আলোচনার আড়ালে তারা পূর্ব পাকিস্তানের সেনানিবাসগুলোতে সৈন্য সমাবেশ আর অস্ত্র জমা করেছে।

এক সময় তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী আলোচনা ভেঙে দিয়ে ২৫ মার্চ সন্ধ্যার মধ্যে ইয়াহিয়া খানসহ ওরা ফিরে গেল পশ্চিম পাকিস্তানে। আর সেদিন মধ্যরাতে শুরু হলো ইতিহাসের ভয়ঙ্কর নির্মম হত্যাযজ্ঞ—অপারেশন সার্চলাইট। হানাদার পাক সেনাদের আক্রমণের শিকার হলেন ছাত্র-তরুণ, অধ্যাপক, বুদ্ধিজীবী, বিভিন্ন পেশার মানুষ, লেখক, কবি, শিল্পীরা। তারা বিশেষভাবে টার্গেট করেছিল সংখ্যালঘু হিন্দুদের আর আওয়ামী লীগের কর্মী-সমর্থকদের। নয়মাস ধরে এ-ই চলেছে। এভাবে নয়মাসে ৩০ লক্ষ মানুষ শহিদ হয়েছেন। বাঙালি নারীদের নির্যাতনেও তারা পিছিয়ে ছিল না।

বঙ্গবন্ধুর সিদ্ধান্ত ও স্বাধীনতার ঘোষণা

এদিকে বঙ্গবন্ধু সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি নিজ বাড়িতে অবস্থান করে ভাগ্যে যা থাকে তা বরণ করবেন। এ ব্যাপারে তাঁর দুটি বিবেচনা কাজ করেছে—প্রথমত, তিনি মনে করলেন হানাদার বাহিনী তাঁকে না পেলে ঢাকা শহরে ধ্বংসযজ্ঞ চালাবে। দ্বিতীয়ত, তাঁর মনে হয়েছে তিনি এতই পরিচিত একটি মুখ যে তাঁর পক্ষে আত্মগোপন করা সম্ভব নয়। পলাতক অবস্থায় ধরা পড়লে তা হবে লজ্জাজনক। এর চেয়ে সাহসিকতার সঙ্গে ওদের মুখোমুখী হলে সেটা সবার জন্যে মঙ্গলজনক হবে। তবে গ্রেফতার হবার আগে ২৫ মার্চ রাত ১২টার পর অর্থাৎ ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে তিনি স্বাধীনতার একটি ঘোষণা প্রচারের জন্যে ইপি আর বাহিনীর কাছে প্রেরণ করেন। এই ঘোষণা ইপি আর-এর ওয়্যারলেসের মাধ্যমে প্রথমে চট্টগ্রামে প্রেরণ করা হয়। পরে দেশের অন্যান্য জায়গাতেও এটি পাঠানো হয়েছিল। এটিই আমাদের স্বাধীনতার ঘোষণা। ঘোষণায় তিনি উল্লেখ করেন দখলদার পাকিস্তান বাহিনীর শেষ সৈন্যটিকেও বাংলার মাটি থেকে বিতাড়িত না করা পর্যন্ত যেন বাংলাদেশের জনগণ লড়াই চালিয়ে যায়। শুরু হয় আমাদের মুক্তিযুদ্ধ।

স্বাধীন বাংলা বেতার

চট্টগ্রাম বেতারের কয়েকজন কর্মী প্রবীণ শিল্পী বেলাল মোহাম্মদের নেতৃত্বে কালুরঘাট থেকে স্বাধীনতার পক্ষে একটি বেতারকেন্দ্র চালানোর সিদ্ধান্ত নেন। সে অনুযায়ী তাঁরা কাজ শুরু করেন এবং অনেকেই তাঁদের সঙ্গে যুক্ত হন। এই কেন্দ্র থেকে ২৭ মার্চ সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম. এ. হান্নান সর্বপ্রথম বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণাটি পাঠ করেন। পরে এটি আরও অনেকেই পাঠ করেছেন। প্রথমদিকে এই কেন্দ্রের নাম রাখা হয়েছিল স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতারকেন্দ্র। পরে যখন কলকাতায় একটি পূর্ণাঙ্গ বেতার কেন্দ্র স্থাপিত হয় তখন এর নাম থেকে বিপ্লবী শব্দটি বাদ দেওয়া হয়। সারাদেশ থেকে শিল্পী-সাহিত্যিক-সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীরা কলকাতায় এসে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে যুক্ত হন। যুদ্ধের নয় মাস ধরে এই কেন্দ্র থেকে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সঙ্গীত, কথিকা, নাটক এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জনগণ ও মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দীপ্ত রাখা হয়। চট্টগ্রাম বেতারের কয়েকজন কর্মী প্রবীণ শিল্পী বেলাল মোহাম্মদের নেতৃত্বে কালুরঘাট থেকে স্বাধীনতার পক্ষে একটি বেতারকেন্দ্র চালানোর সিদ্ধান্ত নেন। সে অনুযায়ী তাঁরা কাজ শুরু করেন এবং অনেকেই তাঁদের সঙ্গে যুক্ত হন। এই কেন্দ্র থেকে ২৭ মার্চ সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম. এ. হান্নান সর্বপ্রথম বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণাটি পাঠ করেন। পরে এটি আরও অনেকেই পাঠ করেছেন। প্রথমদিকে এই কেন্দ্রের নাম রাখা হয়েছিল স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতারকেন্দ্র। পরে যখন কলকাতায় একটি পূর্ণাঙ্গ বেতার কেন্দ্র স্থাপিত হয় তখন এর নাম থেকে বিপ্লবী শব্দটি বাদ দেওয়া হয়। সারাদেশ থেকে শিল্পী-সাহিত্যিক-সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীরা কলকাতায় এসে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে যুক্ত হন। যুদ্ধের নয় মাস ধরে এই কেন্দ্র থেকে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সঙ্গীত, কথিকা, নাটক এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জনগণ ও মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দীপ্ত রাখা হয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রথম সরকার

তাজউদ্দীন আহমদ দলের জ্যেষ্ঠ নেতা ও সংসদ সদস্যদের সাথে যোগাযোগ করে সরকার গঠনের উদ্যোগ নেন। এই উদ্যোগের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রথম সরকার গঠিত হয়। ১৭ এপ্রিল কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলায় এই সরকার শপথ গ্রহণ করে। এই সরকারকে মুজিবনগর সরকার বা প্রবাসী সরকারও বলা হয়। বঙ্গবন্ধুকে তাঁর অনুপস্থিতিতে রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করা হয় এবং সৈয়দ নজরুল ইসলামকে তাঁর অবর্তমানে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়। তাজউদ্দীন আহমদ প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, এ. এইচ. এম কামারুজ্জামান, ইউসুফ আলীসহ কয়েকজনকে নিয়ে মন্ত্রী পরিষদ গঠিত হয়। কর্ণেল ওসমানিকে জেনারেল পদ দিয়ে সেহাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি ঘোষণা করা হয়। এভাবে আনুষ্ঠানিকভাবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যাত্রা শুরু হল।

নয়মাসের যুদ্ধ ও বিজয়

যুদ্ধের সময় প্রাণ বাঁচাতে প্রায় এক কোটি মানুষ ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল। ভারত কেবল তাদের আশ্রয়ই দেয় নি, বাংলাদেশ যে প্রবাসী সরকার গঠন করেছিল তাকে অফিসের জায়গা দিয়েছিল, গেরিলাদের প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র দিয়েছিল, নৌ কমান্ডো গঠন, বিমান বহর তৈরি, নিয়মিত বাহিনী গঠনে সর্বাত্মক সহযোগিতা দিয়েছিল। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ভারসাম্য রক্ষা ও অন্যান্য দেশের সমর্থন আদায়েও ভারত সরকার সচেষ্ট ছিল। শেষে বাংলাদেশের সাথে যৌথ বাহিনী গঠন করে সরাসরি যুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তানের পরাজয়ে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। তাদেরও প্রায় ৬-৭ হাজার সৈনিক এই যুদ্ধে প্রাণ হারায়। অবশেষে নয়মাস পরে ১৬ ডিসেম্বর বিকেল বেলা ঢাকায় রেসকোর্স ময়দানে আনুষ্ঠানিকভাবে পাকিস্তানি বাহিনী যৌথ বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। আমরা হানাদার মুক্ত হলাম। বঙ্গবন্ধুর ভাষায় ওরা আমাদের দাবায়ে রাখতে পারে নি। আমরা বিজয়ী হলাম, স্বাধীন হলাম। বিশ্বের মানচিত্রে লাল-সবুজ পতাকার নতুন রাষ্ট্র মাথা তুলে দাঁড়াল।

সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণ

একটু খেয়াল করে দ্যাখো পাকিস্তানি সেনাবাহিনী যখন হত্যা চালিয়েছে তখন কিন্তু ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-নিরক্ষর, ধর্ম-বর্ণ-জাতি, নারী-পুরুষ এসব বিচার করে নি। তারা বাঙালিদের হত্যা করেছিল। পঁচিশে মার্চ রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্বখ্যাত পণ্ডিতদের যেমন মেরেছে তেমনি নিরক্ষর দরিদ্র রিক্সাচালক বা বস্তিবাসীদেরও গুলি করে হত্যা করেছে।

পাকিস্তান আমলে ২২ পরিবারের কথা বলা হতো। এরা ছিল অতিধনী। এই তালিকায় একজন মাত্র বাঙালি ছিলেন। তাঁকেও কিন্তু একাত্তরে নিজের বাড়ি ছেড়ে পরিবার নিয়ে পালাতে হয়েছিল। আবার ছাত্র, শিক্ষক, মজুররাও পালিয়ে ছিল। মোটকথা সর্বস্তরের বাঙালিকেই সেদিন বাড়িঘর-দেশ ছেড়ে শরণার্থী হতে হয়েছিল।

আবার এদের মধ্য থেকেই তরুণ-তরুণীরা দলে দলে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছে। গেরিলা যুদ্ধে, নৌ কমান্ডো হিসেবে বা নিয়মিত বাহিনীর সদস্য হিসেবে সর্বস্তরের তরুণ-তরুণীরা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল।
তোমরা একটা কাজ করতে পার। প্রত্যেক পরিবারেই খোঁজ করলে মুক্তিযোদ্ধার খবর পেয়ে যাবে। তাঁদের অভিজ্ঞতাগুলো শুনে লিখে ফেলবে। তারপর স্কুলে এসে পরস্পরের লেখাগুলো শুনে নিতে পারো। তাহলেই বুঝতে পারবে সমাজের সব স্তরের সব ধর্মের মানুষ এতে যুক্ত হয়েছিলেন। এমনকি নারীরাও পিছিয়ে থাকেন নি। তোমরা নিশ্চয় তারামন বিবি, কাঁকনবিবি এঁদের নাম শুনেছো।

গেরিলা যুদ্ধ:

আরেকটা বিষয়ও খুব গুরুত্বপূর্ণ। মুক্তিযুদ্ধে দুই পক্ষের সেনাদের মধ্যে সনাতন ধারার যুদ্ধ হয়েছে শেষের দিকে। তার আগে মূলত চলেছে গেরিলা যুদ্ধ। গেরিলারা ছদ্মবেশে সাধারণ মানুষের মধ্যে মিশে থেকে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী হঠাৎ করেই আক্রমণ চালিয়ে আবার ভীড়ের মধ্যে মিশে যায়। একে বলে ‘হিট অ্যান্ড রান’ পদ্ধতি, অর্থাৎ আক্রমণ করেই পালিয়ে যাও। ফলে গেরিলাদের দেশের ভিতর গোপন আস্তানা দরকার ছিল, গোলাবারুদ রাখার নিরাপদ স্থানের দরকার ছিল, অনেক সময় চলাচলের জন্য নির্ভরযোগ্য মানুষের গাড়ি, নৌকা বা রিক্সারও প্রয়োজন হতো। তাই মনে রাখতে হবে অনেক পরিবার এভাবে মুক্তিযুদ্ধে অবদান রেখেছেন। গৃহিণীরা গেরিলাদের খাবার ব্যবস্থা করেছেন, আবার ছোট ছেলেমেয়েরা খবর আদান-প্রদানে সহায়তা করেছে। ফলে অস্ত্র হাতে যুদ্ধ না করেও মুক্তিযুদ্ধে ভূমিকা রেখেছেন অনেকে। তোমরা হয়তো শহিদ সুরকার আলতাফ মাহমুদের কথা জানো। ইনিই আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি— এই বিখ্যাত গানে সুর দিয়েছিলেন। শহিদ জননী জাহানারা ইমামের একাত্তরের দিনগুলো থেকে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে গেরিলা আক্রমণের ঘটনাটাও পড়ে নিতে পারো। পাশাপাশি একজন গেরিলা বা এ ধরনের অভিযানে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালনকারী মানুষের কাছ থেকে সরাসরি তাঁর অভিজ্ঞতা শুনতে পারলে তাও হবে এক বিরাট প্রাপ্তি। চেষ্টা করে দেখতে পারো এমন কাউকে খুঁজে পাও কিনা।

প্রকৃতি ও জলবায়ুর ভূমিকা

আরেকটা বিষয় জানলে ভালো লাগবে। জানোই তো বাংলাদেশ হলো নদীমাতৃক দেশ। এদেশে সাতশয়ের বেশি নদনদী-খাল আছে। এর বাইরে বিল, ঝিল আর জলাভূমি তো অসংখ্য। সব গাঁয়েই যেন নদী নয়ত খাল রয়েছে, তার ওপরে আছে বর্ষার প্রকোপ। একাত্তরে বর্ষা ছিল অনেকদিন, তাতে বছরের বেশির ভাগ সময় নদী-খাল-বিল ছিল ভরাট, কাদায় পথচলা ছিল কষ্টকর। গেরিলা যুদ্ধের জন্যে এমন ভূপ্রকৃতি আর জলবায়ু খুব উপযোগী। পাকিস্তানিরা কিন্তু গেরিলা যোদ্ধা ছিল না, তারা সনাতন পদ্ধতির সৈনিক। তার ওপর ওদের দেশ হচ্ছে রুক্ষ, শুষ্ক, ওখানে এতো নদী-নালা-খাল-বিল নেই। ওরা জানত না সাঁতার, ফলে পানিতে ওদের খুব ভয়। এই প্রাকৃতিক পরিবেশও আমাদের জন্যে যুদ্ধে খুব সহায়ক হয়েছিল। এদেশীয় দালাল আলবদর রাজাকার আর শান্তি কমিটির মত বিশ্বাসঘাতকরা না থাকলে ওরা নয়মাসও টিকতে পারতো না, অন্তত গ্রামগঞ্জ সবসময় স্বাধীন থাকতো।

হানাদারদের দোসর

তবে দুর্ভাগ্যের বিষয় আত্মসমর্পণের আগে পাকবাহিনীর সহযোগী এদেশীয় দোসর আলবদর-রাজাকাররা বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ কিছু সন্তানকে হত্যা করে। আসলে ১৯৭১ এ সারা বছর ধরে তারা মানুষ হত্যা করে গেছে। জামায়াতে ইসলামি ও মুসলিম লীগসহ কয়েকটি রাজনৈতিক দল হানাদার পাকিস্তানিদের পক্ষ নিয়েছিল। এদের নেতৃত্বেই গঠিত হয়েছিল শান্তি কমিটি—হানাদারদের দালাল ও দোসরের ভূমিকা পালনের জন্যে। এছাড়াও এরা রাজাকার, আলবদর, আল শামস বাহিনী গঠন করে মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, চিকিৎসক, সাংবাদিক, লেখক শিল্পীদের হত্যার কাজে লাগিয়েছিল। আমরা জানি ৩০ লক্ষ শহিদের বিনিময়ে আমরা এই স্বাধীন দেশ পেয়েছি। তার সাথে যোগ করতে হবে দুই থেকে তিন লক্ষ নারীকে নির্মমভাবে নির্যাতনের ঘটনা। ফলে এই স্বাধীনতা বহু মানুষের আত্মত্যাগে অর্জিত হয়েছে। একদিকে লক্ষ প্রাণের আত্মত্যাগ এবং অন্যদিকে বহু মানুষের বীরত্বব্যঞ্জক ভূমিকায় আমরা লাভ করেছি লাল-সবুজের এই পতাকা। এই পতাকার সম্মান এবং দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করা আমাদের সবার পবিত্র দায়িত্ব।

যুদ্ধদিনের বাংলাদেশ

একটা কথা মনে রেখো এই যুদ্ধে যেমন সর্বস্তরের মানুষ যোগ দিয়েছিল তেমনি দেশের ৬৪ হাজার গ্রামের কোনোটিই হয়তো বাদ ছিল না এ যুদ্ধ থেকে। পাকিস্তানি হানাদাররা প্রায় প্রত্যেক গ্রামে হিন্দু পাড়ায় আগুন দিয়েছে, আওয়ামী লীগের সমর্থকদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে, কোথাও গণহত্যা চালিয়েছে। সারা দেশে কত বধ্যভূমি ছড়িয়ে আছে! ত্রিশ লক্ষ মানুষ হত্যা তো সহজ কাজ নয়। সারা দেশ জুড়ে পুরো নয়মাসব্যাপী এই নির্মম হত্যাযজ্ঞ চলেছে।

ফলে এরকম পরিবেশে ঈদ, পূজা, পার্বণগুলো যথাযথ উৎসবের মতো পালনের মনোভাব মানুষের মধ্যে ছিল না। থাকবেই বা কী করে! বাড়ির সন্তান হয়তো যুদ্ধে গেছে, আবার কোথাও সন্তান খবর পাঠিয়েছে তার দল রাতে খাবে, কোথাও আহত যোদ্ধার সেবার ব্যবস্থা করতে হবে, কাউকে বা অস্ত্রগুলো নিরাপদে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দিতে হবে। অনেক বাড়ির এক বা একাধিক সদস্য তো শহিদ হয়েছিলেন। তাদের পক্ষেও শোক কাটিয়ে

উৎসব পালন ছিল কঠিন। প্রতি মুহূর্তে ছিল মৃত্যুর ভয়। দেশ তখন ছিল যেন এক মৃত্যুপুরী। যুদ্ধ তো ঈদ-পার্বণের দিনেও থেমে থাকে নি। ফলে এ ছিল ভিন্ন রকম ঈদ বা পূজা। হ্যাঁ বাড়ির বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্যদের কাছ থেকে একাত্তরের উৎসবের দিনগুলোর কথাও জেনে নিতে পারো। সেই বছর একুশে ফেব্রুয়ারি ছিল যুদ্ধের আগে আগে, তাই খুব জোশের সঙ্গে সেটি পালিত হয়েছিল। কিন্তু নববর্ষ পড়েছিল যুদ্ধের ভিতরে, সেটি সেভাবে পালিত হতে পারে নি। যেসব ক্ষুদ্র জাতি নববর্ষ উপলক্ষে বৈসাবি, সাংগ্রাই বা অন্য উৎসব পালন করে তাদের কী অবস্থা ছিল তাও জেনে নেওয়া যায়। এর ভিত্তিতে একাত্তরের উৎসব নামে একটা প্রকল্প তোমরা করতে পার।

একাত্তর সনে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষাও ঠিক মতো হতে পারে নি। কোথাও আগেই প্রচারপত্র বিলি করে পরীক্ষা না দিতে বলেছে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের মানুষজন, কোথাও পরীক্ষাকেন্দ্রের গেইটে লিখে দিয়েছে সে কথা। আর কোথাও কেন্দ্রের আশেপাশে গ্রেনেড হামলা হয়েছে। এ সময় পাকিস্তানের দখলদারিত্বে দেশের কিছুই যে স্বাভাবিক নেই সেটা প্রমাণ করতে হবে না বিশ্বের কাছে! তাই এই ব্যবস্থা।

শেষ কথা

যুদ্ধের নয়মাস দেশ অবরুদ্ধ ছিল, জীবন ছিল অস্বাভাবিক। মানুষ কেবল আতঙ্কের মধ্যেও স্বাধীনতার প্রহর গুনেছে, তার জন্যে কাজ করেছে। শামসুর রাহমানের বিখ্যাত 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে হে স্বাধীনতা' কবিতাটি পড়ে নিও তোমরা। এখানে কয়েক লাইন আমরা তুলে দিচ্ছি -

তুমি আসবে ব'লে, হে স্বাধীনতা,
সাকিনা বিবির কপাল ভাঙলো,
সিঁথির সিঁদুর গেল হরিদাসীর।
তুমি আসবে ব'লে, হে স্বাধীনতা,
শহরের বুকে জলপাই রঙের ট্যাঙ্ক এলো
দানবের মত চিৎকার করতে করতে
তুমি আসবে ব'লে, হে স্বাধীনতা,
ছাত্রাবাস বস্তি উজাড় হলো। রিকয়েললেস রাইফেল
আর মেশিনগান খই ফোটালো যত্রতত্র।
তুমি আসবে ব'লে, ছাই হলো গ্রামের পর গ্রাম।
তুমি আসবে ব'লে, বিধ্বস্ত পাড়ায় প্রভুর বাস্তুভিটার
ভগ্নস্তূপে দাঁড়িয়ে একটানা আর্তনাদ করলো একটা কুকুর।
তুমি আসবে ব'লে, হে স্বাধীনতা,

মুক্তির দাদার একনাগাড়ে বলা কথাগুলো তিনজনের মাঝেই একটা ঘোর তৈরি করে দিলো। মনের মধ্যে হাজার প্রশ্ন টগবগ করে ফুটতে শুরু করেছে সবার। প্রশ্নগুলো নিয়ে মনে মনে নাড়াচাড়া করতে করতে নিসর্গ আর অন্বেষা বাড়ি ফিরে এলো। ওরা ঠিক করলো এবার সুন্দর একটা পরিকল্পনা করে কাজে নেমে পড়তে হবে।

অনুসন্ধান ও তথ্য সংগ্রহ

নিসর্গ অন্বেষাকে বললো, খুব ভালো একটা কাজ হলো দাদা আর খুশি আপার সহযোগিতায় আমরা বই আর পত্র-পত্রিকা থেকে প্রয়োজনীয় অনেক তথ্য পেলাম। এবার চলো আমরা আমাদের পরিবার ও এলাকার বয়স্ক ব্যক্তি যারা মুক্তিযুদ্ধ দেখেছেন বা মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানেন তাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করি।

মালা বললো, সে না হয় করবো কিন্তু তাদের জিজ্ঞাসা করবোটা কী? অন্বেষা বললো, ভালো কথা বলেছ। তাহলে চলো আমরা একটা সাক্ষাৎকার গ্রহণের প্রশ্নমালা তৈরি করি।

সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য প্রশ্নমালা

অনুসন্ধানের জন্য প্রশ্ন	সাক্ষাৎকার গ্রহণের প্রশ্নমালা
১। মুক্তিযুদ্ধের সময় এই অঞ্চলের সাধারণ মানুষের উপর কীরকম অত্যাচার হয়েছিল?	১। মুক্তিযুদ্ধের সময় আপনি কোথায় ছিলেন? ২। তখন আপনার বয়স কত ছিল? ৩। আপনার জানা মতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কি এই এলাকায় এসেছিল? ৪। উত্তর হ্যাঁ হলে, তারা কী ধরনের অত্যাচার নিপীড়ন করেছিল? (উপরের নমুনা অনুসারে শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনীয় আরও প্রশ্ন তৈরি করে নিতে পারে।) ৫।.... ৬।....... ৭।...
২। মুক্তিযোদ্ধারা কীভাবে পাকিস্তানি সেনাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল?	উপরের নমুনা প্রশ্নের মতো শিক্ষার্থীরা তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের প্রশ্নমালা তৈরি করে নিতে পারে। ১। ২। ৩। ....
৩। সাধারণ মানুষ কীভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করেছিল?	উপরের নমুনা প্রশ্নের মতো শিক্ষার্থীরা তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের প্রশ্নমালা তৈরি করে নিতে পারে। ১। ২। ৩। ....
সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম: তারিখ:	

চলো নিসর্গ ও অন্বেষা আর তার বন্ধুদের মতো আমরাও আমাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের প্রশ্নমালা তৈরি করি এবং তথ্য সংগ্রহ করি।

এরপর নিসর্গ ও অন্বেষা আর তাদের বন্ধুগণ দলে ভাগ হয়ে প্রথমে নিজ পরিবার থেকে তথ্য সংগ্রহ করলো। দলের সব সদস্য তাদের প্রাপ্ত তথ্য একত্র করে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করলো। তারা এগুলো নিয়ে খুশি আপার সাথে আলোচনা করলো। এরপর খুশি আপা প্রতিটি দলকে বললেন, দলের সদস্যদের স্বজনদের ঘটনা থেকে অন্তত একটি বিশেষ ঘটনা ক্লাসের সবার সাথে শেয়ার করতে।

- প্রতি দলের উপস্থাপনার পর খুশি আপা তাদের সংগৃহীত ঘটনাবলিতে যেসব জায়গার উল্লেখ পাওয়া গেছে সেখান থেকে নতুন তথ্য পাওয়া যায় কিনা তা অনুসন্ধান করতে বললেন। এই প্রসঙ্গে এই এলাকায় প্রকৃতি ও পরিবেশগত কারণে (যেমন- নদী নালা বেশি থাকার কারণে, ইত্যাদি) পাকিস্তানিরা কোন বাধা পেয়েছে কিনা সেই তথ্যও অনুসন্ধান করতে বললেন। দলগুলো উক্ত জায়গাগুলো খুঁজে বের করলো এবং দলীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সেই জায়গা পরিদর্শন করে, প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষাৎকার নিয়ে কিংবা বর্ষীয়ান ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করলো। কাজে যাবার আগে দলগুলো শিক্ষকের সাথে দলীয় পরিকল্পনাও শেয়ার করলো।
- খুশি আপা দলগুলোর পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ এগুচ্ছে কি না তার খোঁজ-খবর রাখলেন এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সকল ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা দিলেন। কিন্তু কোন মতামত চাপিয়ে না দিয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিলেন এবং প্রয়োজনে কারিগরি (যেমন- তথ্য সংগ্রহের জন্য রেকর্ডার, ক্যামেরা ইত্যাদি) ও প্রশাসনিক (যেমন- কোন জায়গায় প্রবেশ করতে বিশেষ অনুমতি দরকার হলে প্রধান শিক্ষকের পরামর্শক্রমে চিঠি দেওয়া) সহায়তা দিলেন।
- দলগুলো নিজ নিজ এলাকায় /লোকালয়ে মুক্তিযুদ্ধকালীন অবস্থা/ ঘটনা/ উল্লেখযোগ্য স্থান/ সমাজের একক ব্যক্তি/পরিবার/দলগতভাবে মানুষের অবদান সম্পর্কে বর্ষীয়ান বা তথ্যজ্ঞ ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করলো। মুক্তিযুদ্ধকালীন স্থানীয় জনগণের বাস্তব অবস্থা, প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ এবং মুক্তিযুদ্ধের আন্তঃসম্পর্ক, অসাম্প্রদায়িক পরিবেশ, বিভিন্ন উৎসব উদযাপন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার মাঝে আন্তঃসম্পর্ক, মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ও ঘটনাবলি সম্বলিত স্থান বা প্রত্যক্ষদর্শী প্রভৃতি সম্পর্কে জানার চেষ্টা করলো এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ দলের সদস্যরা নোট করে নিলো। প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে তারা বিভিন্ন প্রতীক, চিহ্ন ব্যবহার করে এলাকায় মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সম্বলিত স্থানসমূহ চিহ্নিত করে মানচিত্র তৈরি করলো।

চলো আমরাও আমাদের কাজের একটি মানচিত্র তৈরি করি

দলের প্রত্যেক সদস্যই পর্যায়ক্রমে যাতে বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে, অবদান রাখতে পারে খুশি আপা সে বিষয়টি নিশ্চিত করলেন।

তথ্য যাচাই ও বিশ্লেষণ

- খুশি আপা বারবার দলগুলোর কাছ থেকে তথ্যের সঠিকতা যাচাই কীভাবে করবে তার ধারনা নিলেন ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিলেন। তবে দলগুলোর উপর কোন মতামত চাপিয়ে দিলেন না।
- সবাই দলগতভাবে প্রাপ্ত তথ্য যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে গ্রহণ-বর্জন করে বিশ্লেষণ করলো এবং নিজেদের কাজের অভিজ্ঞতাসমূহ শ্রেণিকক্ষে সবার সামনে উপস্থাপন করলো।

ফলাফল তৈরি ও উপস্থাপন

- এই পর্যায়ে খুশি আপা জানতে চাইলেন, এই কাজের মধ্য দিয়ে তোমরা মুক্তিযুদ্ধের যেসব ঘটনা খুঁজে এনেছো সেগুলো কীভাবে অন্যদের জানাতে পারো?
- সবাই দলে আলোচনা করে বিভিন্ন সৃজনশীল ও অভিনব উপায় পরিকল্পনা করলো। যেমন- ফটোবুক, ডকুমেন্টারি, দেয়ালিকা, পোস্টার, লিফলেট, ফটোগ্রাফি বা আঁকা ছবি প্রদর্শনী, বই, নাটক ইত্যাদি। খুশি আপা এই ক্ষেত্রে পুরোপুরি স্বাধীনভাবে তাদের পরিকল্পনা করতে দিলেন, শুধু সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ ও ইস্যুসমূহ সম্পর্কে সচেতন করলেন। খুশি আপার পরামর্শ নিয়ে দলগুলো তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করলো এবং কোন জাতীয় দিবসে তা অন্যান্য ক্লাসের শিক্ষার্থীদের সাথে শেয়ার করলো।
- এবার খুশি আপা বললেন, বিদ্যালয়ে উদযাপিত যেকোনো জাতীয় দিবস যেমন, ৭ই মার্চ, ১৭ই মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস, ২৫শে মার্চ গণহত্যা দিবস, ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা দিবস, ১৪ই এপ্রিল বা ১লা বৈশাখ বাংলা নববর্ষ, ১৫ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস, ১৪ই ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস, ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবস প্রভৃতি জাতীয় দিবসের সাথে মিলিয়ে বিদ্যালয়ে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও কমিউনিটির ব্যক্তিবর্গের সামনেও তোমাদের প্রাপ্ত ফলাফল উপস্থাপন করতে পারো। আমরা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক এসব তথ্য পরবর্তী গবেষণার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক বা জাতীয়ভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করবো।
- সংশ্লিষ্ট শিক্ষকগণের প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও ফিডব্যাক অনুসারে নিসর্গ ও অন্বেষারে বন্ধুরা তাদের প্রকল্পটি উপস্থাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করলো। অতিথি হিসেবে বিদ্যালয়ের শিক্ষক, থানা শিক্ষা কর্মকর্তা, অভিভাবক, স্থানীয় প্রবীণ ব্যক্তি / মুক্তিযোদ্ধারা উপস্থিত থাকলেন।

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণের উদ্যোগ

এরপর খুশি আপা মুক্তিযুদ্ধের এসব স্মৃতি ধরে রাখার স্থায়ী কোন উপায় করা যায় কিনা সে বিষয়ে প্রশ্ন করলেন। বললেন যে, প্রাপ্ত ফলাফলের প্রতিফলন হিসেবে তোমরা নিজ নিজ এলাকায় "শিক্ষার্থী কর্তৃক নির্মিত মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিস্তম্ভ"/ বিদ্যমান স্মৃতিস্তম্ভ/সৌধ আধুনিকায়ন / সংরক্ষণ বা পুনঃনির্মাণের নক্সা তৈরির পরিকল্পনা বা প্রস্তাবনা গ্রহণ করতে পারো এবং এগুলো বাস্তবায়নের জন্য বিদ্যালয় ও স্থানীয় প্রশাসনের (উপজেলা বা জেলা) সহযোগিতার আবেদন করতে পারো।

এবার চলো আমরা অধ্যায়ের শেষে সংযুক্ত সতীর্থ মূলায়নের ছক ব্যবহার করে আমাদের দলের সবাই সবার মূল্যায়ন করি।

ডকুমেন্টেশন

সবশেষে দলগুলো দলীয় কাজের বিভিন্ন ধাপের তথ্যসমূহ, আত্ম-প্রতিফলনের লিখিতরূপ এবং অর্জিত শিখনের সারসংক্ষেপ (ছবি/ভিডিও/লিখিতরূপ/ খসড়া এর হার্ড বা সফট কপি) খুশি আপার মাধ্যমে বিদ্যালয়ে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সংরক্ষণ করলো।

৪.১ রুব্রিক্স: শিক্ষার্থী কর্তৃক দলের সদস্যদের পারফরমেন্স মূল্যায়ন দল নং-

প্রকল্প শিরোনাম	
শ্রেণি: বিষয়:	সময়সীমা:

মূল্যায়নের ক্ষেত্র				দলের শিক্ষার্থীদের ক্রম									
	ক	খ	গ	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
আগ্রহ	প্রজেক্টের কাজ করতে খুবই আগ্রহী। দলের অন্য সদস্যদেরকেও আগ্রহী করতে চেষ্টা করে। দলে নিজের ভূমিকা পালন করে	কাজে খুব একটা আগ্রহী না হলেও নিজের অংশের কাজটুকু মোটামুটি করে রাখে।	প্রজেক্টের কাজে আগ্রহ তৈরি করা প্রয়োজন। অন্যদের সাথে মিলে আরও কাজ করতে হবে।										
দলীয় পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ	দলের সিদ্ধান্ত ও কাজের পরিকল্পনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করে এবং সেই অনুযায়ী নিজের কাজগুলো ঠিকঠাকভাবে পালন করে।	দলের সিদ্ধান্ত ও কাজে সক্রিয় অংশ নেয় না পরিকল্পনায় সক্রিয়ভাবে অংশ নেয় না, কাজ একাই করে, দলের অন্যদের সাথে মিলেমিশে নয়।	দলের সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করার জন্য বন্ধুটিকে আমরা আরও সাহায্য করবো।										
সময় ব্যবস্থাপনা	সময় ঠিক রেখে কাজ করে, সময়মত নিজের কাজ জমা দেয়।	মাঝে মাঝে সময়সীমা মেনে কাজ করে। সবসময় নয়	বন্ধুটি সময় মেনে কাজ জমা দিতে খুবই সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে।										

গণতন্ত্র চর্চা	নিজের বক্তব্য, মতামত, স্পষ্টভাষায় দলের সবার সাথে শেয়ার করে, এবং অন্যদের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনে	নিজের বক্তব্য বা মতামত কদাচিৎ প্রকাশ করে অথবা দলীয় আলোচনায় অন্যদের তুলনায় বেশি কথা বলে	দলের মিটিঙে মতামত দেয়ার অথবা অন্যদের কথা বলার সুযোগ দেয়ার অনুশীলন প্রয়োজন										
যৌক্তিক অবস্থান	যুক্তি দিয়ে নিজের মতামত দেয়, নিজের ভুল দলের অন্য কেউ দেখিয়ে দিলে সাথে সাথেই শুধরে নেয়। দলের অন্যদের তর্কবিতর্ক হলে তা সমাধানের চেষ্টা করে	তর্কে বা যুক্তিতে হেরে গেলে মেনে নেয়, কিন্তু ভালভাবে নিতে পারে না। অথবা যুক্তিতে হেরে গেলেও অনেক সময় তর্ক চালিয়ে যেতে চায়।	অন্যের যৌক্তিক মতামতকে শ্রদ্ধার সাথে মেনে নিতে, নিজের ভুল স্বীকার করতে আরও চর্চার প্রয়োজন										
পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে শ্রদ্ধা করে এবং অন্যের মতামতের গঠনমূলক সমালোচনা করে	অন্যদের মতামতে ভিন্নতা থাকলে তা মেনে নিলেও সেই অনুযায়ী নিজের অবস্থান পাল্টাতে চায় না।	ভিন্নমতের প্রতি শ্রদ্ধা দেখানোতে আরও চর্চার প্রয়োজন অন্যের ভিন্নমত থাকলে তাকে এড়িয়ে যায় কিংবা আক্রমণাত্মকভাবে তর্ক করে										

ফিডব্যাক প্রদান	অন্যদের কাজে সাহায্য করে ও কার্যকর, বাস্তবসম্মত ফিডব্যাক দেয়। অন্যের কাজে ভালো দিক, দুর্বল দিক যেমন সনাক্ত করে তেমনি কাজের উন্নয়নের দিক নির্দেশনা দেয়।	শুধুমাত্র অন্যের কাজের বা দুর্বল দিক শনাক্ত করে তবে উন্নয়নের দিক নির্দেশনাক্ত করে তবে উন্নয়নের দিক নির্দেশনা দিতে পারছে না।	অন্যের কাজের জন্য কার্যকর দিকনির্দেশনা/ ফিডব্যাক দেয়ার চর্চা প্রয়োজন										
ফিডব্যাক গ্রহণ	অন্যদের সনাক্ত করা ভুল থেকে শিক্ষা নেয় ও আরো ভাল করার চেষ্টা করে	সমালোচনা বা ফিডব্যাক গ্রহণ করে, কিন্তু সে অনুযায়ী কাজের উন্নয়ন করতে পারে না।	অন্যের দেয়া ফিডব্যাককে সহজভাবে নিয়ে সে অনুযায়ী নিজের কাজের উন্নয়নের চর্চা করতে হবে।										

দলের সকল শিক্ষার্থীর ক্রমানুযায়ী নাম, রোল ও স্বাক্ষর:

ক্রম	নাম	রোল	স্বাক্ষর
১			
২			
৩			
৪			
৫			
৬			
৭			

শিক্ষকের নাম: স্বাক্ষর ও তারিখ:

বই পড়া ক্লাব

খুশি আপা ক্লাসে ঢুকেই বললেন, কি সবাই প্রস্তুত? আমরা তো ইতোমধ্যে সক্রিয় নাগরিক ক্লাব আর বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ক্লাব গঠন করেছি। তাহলে চলো একই ভাবে আমরা ঝটপট আমাদের বই পড়া ক্লাব গঠন করে ফেলি। তার পর সবাই মিলে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য নিয়ে কমিটি গঠন করলো। নিয়মাবলী তৈরি করলো এবং সারা বছরের জন্য একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরি করে কাজ শুরু করে দিলো। প্রথম দিনেই তারা বই পড়া ক্লাবের কাজের অংশ হিসেবে খুশি আপাকে সাথে নিয়ে লাইব্রেরিতে গেল। সেখানে গিয়ে তারা লাইব্রেরির সদস্য হলো। যাতে সবাই নিজের পছন্দ মত লাইব্রেরি থেকে বই ধার করে পড়তে পারে। তারপর পুরো ক্লাসের সময় জুড়ে তারা লাইব্রেরিতে বসে মনের আনন্দে বই পড়লো।

এই ক্লাব গঠনের ফলাফল হলো অভূতপূর্ব। ক্লাসের সবাই এখন প্রতিদিন মনের আনন্দে বই পড়ে আর সীমাহীন আনন্দের জগতে ঘুরে বেড়ায়।

মূল্যায়ন:

এবার চলো আমরা নিচে যুক্ত আত্মমূল্যায়নের ছকের মাধ্যমে আমাদের বই পড়া ক্লাবের সাথে আমাদের কার্যক্রমের মূল্যায়ন করি

ক্রম	ক্লাব কার্যক্রমে অংশগ্রহণের পর	সম্পূর্ণ একমত	মোটামুটি একমত	একমত নই
১।	আমি অন্তত: ৩টি বই পড়েছি			
২।	বই পড়ার আগ্রহ আমার বাড়ছে			
৩।	বই পড়ে আমি যা জানতে পাড়ি তা অন্যদের সাথে আলোচনা করি			
৪।	ভবিষ্যতে কী কী বই পড়বো তার একটি তালিকা আমার আছে			
৫।	আমি অন্যদের বই পড়তে উৎসাহিত করি			
৬।	বই পড়তে আমার খুবই আনন্দ হয়			
৭।	বই পড়ে আমি অনেক নতুন নতুন বিষয় জানতে পেরেছি			
৮।	আমি বিশ্বাস করি আমার কাজে ক্লাব উপকৃত হয়েছে			

মূল্যায়ন:

আমাদের ক্লাব কার্যক্রম কেমন চলছে?

বছর শেষে নিচের ছক ব্যবহার করে শিক্ষকের সহায়তায় আমরা আমাদের ক্লাবের কার্যক্রম ও এ থেকে আমাদের শেখাকে বিচার বিশ্লেষণ করবো। এতে করে আমরা সামনে আরো দক্ষভাবে ক্লাবের কাজে অংশগ্রহণ করতে পারবো।

ক. ক্লাব কার্যক্রমের বিবরণ:

ক্লাবের নাম:..			
ক্লাবের লক্ষ্য:	১.	২.	৩.
অনুষ্ঠিত মিটিং সংখ্যা:			
কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের নাম:			

বর্তমান শিক্ষাবর্ষে পরিকল্পিত কাজের বিবরণ	পরিকল্পিত কাজের বর্তমান অবস্থা সমাপ্ত/চলমান	শিক্ষকের মন্তব্য

খ. ক্লাবের সভাপতি/সহ-সভাপতি/সচিব কর্তৃক পূরণীয় (প্রত্যেক সদস্যের জন্য):

ক্লাবের নাম	ভূমিকা (যেমন- সভাপতি/সহ-সভাপতি/সচিব/ সদস্য/সদস্য নয়)	সভাতে উপস্থিতি (যেমন-মোট ৭টির মধ্যে ৫টি)	ক্লাব কার্যক্রমে অংশগ্রহণের ধরণ			সভাপতি/ সহ-সভাপতি/ সচিব এর মন্তব্য ও স্বাক্ষর
			খুব সক্রিয়: উদ্যোগী, আলোচনায় অংশগ্রহণ করে, কাজে সক্রিয় থাকে	মোটামুটি সক্রিয়: কিছু কিছু কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছে	ভবিষ্যতে আরো সক্রিয় অংশগ্রহণ কাম্য: শুধু কিছু বাধ্যতামূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছে	
সুনাগরিক ক্লাব						
বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ক্লাব						
বই পড়া ক্লাব						

গোত্রবদ্ধ সমাজ থেকে স্বাধীন রাষ্ট্র

নীলান্ত বসেছে জানালার পাশের একটা সিটে। জানালা দিয়ে সে মুক্ত আকাশে এক ঝাঁক পাখির বাঁধাহীন উড়ে চলা দেখছে। অন্বেষা ওর পাশে এসে বসলো। নীলান্ত ফিরেও তাকালো না।

অন্বেষা জানতে চাইলো, কী রে, কী দেখছিস?

নীলান্ত চমকে উঠে ফিরে তাকায়। আনমনে উত্তর দিলো, খোলা আকাশ, মেঘের দেশ আর পাখিদের উড়াউড়ি দেখছি আর ভাবছি গতরাতে দাদুর মুখে শোনা ডালিমকুমারের গল্প।

অন্বেষা বলে, ডালিমকুমারের গল্প আমিও শুনেছি বহুবার। রাজার ছেলে ডালিমকুমার। বিশাল তাদের রাজ্য। হাতিশালায় হাতি, ঘোড়াশালায় ঘোড়া। এতো এতো সৈন্য নিয়ে যুদ্ধে যায়। বন্দী এক রাজকন্যাকে রাক্ষসের হাত থেকে উদ্ধার করে।

নীলান্ত তখনো ভাবনার জগতে বিচরণ করছে। অন্বেষার কাছে সে জানতে চাইলো, আগের দিনে সত্যিই কি এমন রাজা ছিল? রাজ্য এবং রাজকুমার ছিল? এখনও কি আছে? ডালিমকুমারের গল্প কি সত্যি?

পেছন থেকে ওদের আরেক বন্ধু সন্ধান হা হা করে হেসে উঠে বললো, তুই কি রাজকুমার হতে চাস নীলান্ত?

নীলান্ত হাসিতে যোগ দেয় না। আগের মতোই আনমনে বলে উঠে, না।

অন্বেষা এবার নীলান্তকে বলে, খুশি আপা ক্লাস নেবেন আমাদের। আপা সব জানেন। তার কাছে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবো সব সত্য। আমারও জানার খুব ইচ্ছে হচ্ছে এখন। অনেক আগে আমাদের এই দেশ কি রাজারা চালাতো? সেই রাজারা কেমন মানুষ ছিল? এতো এতো হাতি আর ঘোড়া নিয়ে সত্যি সত্যি তারা যুদ্ধ করতো? তাদের রাজ্যে সাধারণ প্রজারাই বা কেমন ছিল?

সত্যিই কি তারা ছিল, নাকি আমরা যেসব গল্প শুনি তা সবই মানুষের মনগড়া কিংবা রূপকথা?

ওদের কথা শুনে ক্লাসের অনেকেই বেশ আগ্রহ নিয়ে ফিরে তাকায়। তারাও এ-বিষয়ে এখন জানতে চায়। খুশি আপা ক্লাসে আসার পর নীলান্ত সবার আগে উঠে দাঁড়িয়ে এক এক করে প্রশ্নগুলো করলো। প্রশ্ন শুনে খুশি আপা মিষ্টি করে হাসলেন। বললেন, মানুষের মুখে মুখে এমন অনেক গল্প ছড়িয়ে থাকে যার কিছুটা হয়তো সত্য, আর কিছুটা হয়তো একেবারেই কাল্পনিক। তবে তোমরা যদি সত্যিই জানতে চাও মানুষের অতীতকালের কথা, তবে তা জানতে হলে ইতিহাস পড়তে হবে। জেনে রেখো, ইতিহাস আর রূপকথা কিন্তু এক নয়। রূপকথা হচ্ছে মানুষের মনগড়া কল্পকাহিনী। আর ইতিহাস হচ্ছে মানুষের অতীতের অভিজ্ঞতা। পৃথিবীতে আমাদের দাদা-দাদী, নানা-নানী ছাড়াও অনেক অনেক বছর আগে ছিলেন তাদেরও পূর্বসূরীরা। এই যে হাজার হাজার বছর ধরে আমাদের পূর্বসূরীরা এই পৃথিবীতে ছিলেন, তাদের কাজ, কর্মকাণ্ড বা জীবনধারার ধারাবাহিক বর্ণনা যখন আমরা নির্ভরযোগ্য উৎস ও প্রমাণের আলোকে জানার চেষ্টা করবো তখনই তা ইতিহাস হয়ে উঠবে। ইতিহাস কেবল রাজকুমার, রাজা বা রাজ্যের বর্ণনা নয়। ইতিহাস খুবই আনন্দদায়ক পাঠ। মানুষ লক্ষ কোটি বছর ধরে কীভাবে পৃথিবীর বুকে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে, কৃষি ও নগর বিপ্লব ঘটিয়েছে, ভাষা-সমাজ-সংস্কৃতি-ধর্ম উদ্ভাবন করেছে, রাজ্য-রাষ্ট্র নির্মাণ করে বর্তমানে এসে পৌঁছেছে তা ইতিহাস পড়ে জানা যায়। জানা যায়, আদি যুগে মানুষ কেমন ছিল, কীভাবে তারা অরণ্যে ঘুরে ঘুরে জীবজন্তু শিকার

করতো। নানা প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে টিকে থাকার জন্যে ছোট ছোট দল থেকে আস্তে আস্তে কীভাবে তারা গোত্র গড়ে তুলেছিল।

রেনু জানতে চায়, গোত্র কী আপা?

আপা বললেন, লক্ষ কোটি বছর আগে মানুষ আজকের মতো অবস্থায় ছিল না, আজকের দিনের সব অভিজ্ঞতাই ছিল তাদের কাছে অজানা। তারা বর্তমান মানুষের মতো ঘরবাড়ি তৈরি করতে জানতো না। দীর্ঘদিনের জন্যে কীভাবে খাদ্য সংগ্রহ করে রাখতে হয় সেই পদ্ধতি জানতো না। খাদ্য উৎপাদনও করতে পারতো না। বন-জঙ্গল থেকে বিভিন্ন পশু শিকার আর ফলফলাদি সংগ্রহ করে জীবন-ধারণ করতো। গুহার মধ্যে আশ্রয় নিতো। তবে আশ্রয় নেবার মতো গুহা সবখানে ছিল না। মানুষ বনের হিংস্র জীব-জন্তুর সাথে লড়াই করে এবং প্রকৃতির প্রতিকূলতাকে জয় করে বেঁচে থাকতো। এই বেঁচে থাকার প্রয়োজনেই তারা ছোট-বড় দল গঠন করে একসাথে ঘুরে বেড়াতো, খাদ্য সংগ্রহ করতো। এই দলকেই বলা হয় গোত্র। প্রতিটা গোত্রে দলপতি হিসেবে একজন বয়স্ক মানুষ থাকতেন। দলের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হলে তিনি মীমাংসা করতেন। দলের সবাই ঠিকমতো খাদ্য ও নিরাপত্তা পাচ্ছে কিনা দেখতেন। বড়রা যখন শিকারে যেতো, ছোটরা কোথায় থাকবে, কে তাদের পাহারা দিবে এইসব বিষয় তিনিই ঠিক করতেন। দীর্ঘদিন পর্যন্ত মানুষ চাষাবাদ করার কৌশল জানতো না। শিকারের অস্ত্রও ছিল ভোঁতা। বিভিন্ন বনের দাবানল, আগ্নেয়গিরি থেকে লাভা উদগীরণ দেখে দেখে মানুষ ক্রমেই আগুন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ করে। পাথরে পাথর ঘষে তারা আগুন জ্বালানোর কৌশল রপ্ত করে নেয়। তারা বুঝতে পারে, আগুন শীতের রাতে উত্তাপ, রাতের অন্ধকারে আলো দেয়। বন্য জীব-জন্তু আগুন দেখলে ভয়ে পালিয়ে যায়। আগুনে পোড়ালে খাবারের স্বাদ বেড়ে যায়। এইসব দেখে দেখে মানুষ তাদের দৈনন্দিন জীবনে আগুনের ব্যবহার শেখে। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে আগুন ছিল মানুষের অন্যতম প্রধান অস্ত্র ও আশ্রয়। আদিম পৃথিবীতে মানুষের জীবন ছিল খুবই ধীর গতিসম্পন্ন। প্রকৃতিতে যা কিছুই তারা দেখেছে, আস্তে ধীরে নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে সেগুলোকে নিজেদের কাজে লাগানোর মতো করে ব্যবহার করেছে। হাজার বছর ধরে তারা এইভাবে জীবন-যাপন করেছে, সঞ্চয় করেছে নানা অভিজ্ঞতা।

এতক্ষণ তোমরা আগুনের ব্যবহার সম্পর্কে মানুষ কীভাবে ধারণা লাভ করলো তা জানতে পেরেছো। এবার চলো নতুন একটি মজার বিষয় তোমাদের সাথে আলোচনা করা যাক। শুরুর সময়ে মানুষের বেঁচে থাকার প্রধানতম সংগ্রামই ছিল খাদ্য সংগ্রহ করা। এরপর কৃষি ও চাষাবাদের কৌশল আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো খাদ্য উৎপাদনের সংগ্রাম। মানুষের জীবন গেলো বদলে। জীবনে এই পরিবর্তন আনতে মানুষকে লক্ষ লক্ষ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে। মানুষের জীবনে প্রথম বিপ্লব (কৃষির আবিষ্কার) ঘটেছিল নারীর হাতে। পুরুষ যেতো শিকারে, আর নারী তাদের বসতির আশে-পাশে শস্য থেকে উৎপাদনের কৌশল আয়ত্ত করেছিল। শিকার করতে গিয়ে অনেক মানুষ বিষাক্ত সাপ ও পোকার কামড়ে, বন্য জীব-জন্তুর আঘাতে মারা যেতো। আবার সব সময়ই যে পর্যাপ্ত পরিমানে খাদ্য সংগ্রহ করা যেতো তাও বলা যাবে না। প্রতিটা গোত্র এই খাদ্য সংগ্রহ করতে গিয়েই সমস্ত মেধা ও শক্তি ব্যয় করে ফেলতো। কিন্তু তারা যখন ধীরে চাষাবাদ শিখে গেলো তখন খাদ্য নিয়ে উদ্বেগ গেলো কমে। আগে যখন শিকার করতো, বনের পশু আর ফল কমে গেলে সেই জায়গা ত্যাগ করে নতুন জায়গায় চলে যেতে হতো খাদ্য সংগ্রহের আশায়। সবশেষে শিকারি ও অস্থায়ী জীবনের নিরন্তর ছুটে চলার বদলে মানুষ মোটামুটিভাবে একটি স্থানে স্থায়ী হতে শুরু করে। গোত্রীয় ব্যবস্থা এভাবেই এগিয়ে চলে। পশু শিকার থেকে পশু পালন শুরু হয়, চাকার আবিষ্কার মানুষের জীবনকে সম্পূর্ণভাবে বদলে দেয়। গবেষণা থেকে আমরা জানতে পারি, আজ থেকে প্রায় দশ হাজার বছর আগে পৃথিবীর বেশ কিছু অঞ্চলে মানুষ প্রথম শিকার জীবন ত্যাগ করে স্থায়ী বসতি স্থাপন ও চাষাবাদ করতে শুরু করেছিল। কৃষি কাজ বা চাষাবাদ শুরু করা ছিল মানুষের ইতিহাসে প্রথম যুগান্তকারী ঘটনা। ইতিহাসের আলোচনায় এই সময়টাকে

তাই 'কৃষি বিপ্লব'-এর সময় বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

এতক্ষণ তোমরা মানুষের খাদ্য সংগ্রহ ও উৎপাদন সম্পর্কে ধারণা লাভ করেছো। উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ তা মজুদ করাও শিখে যায়। মানুষ যখন খাদ্য মজুদ করে রাখা শুরু করে, তখন গোত্রে ও সমাজে খাদ্য বন্টন নিয়ে দেখা দিতে শুরু করে বৈষম্য। এই বৈষম্য মানুষের টিকে থাকার ইতিহাসে নতুন মাত্রা যুক্ত করে। যে গোত্র যতো বেশি খাদ্য/ সম্পদ মজুদ করতে থাকে, মানুষের উপর তাদের ততো বেশি ক্ষমতা-প্রতিপত্তি ও আধিপত্য বিস্তার করার প্রবণতা বাড়তে থাকে। খাদ্য মজুদ করেই একশ্রেণীর মানুষ অভিজাত হয়ে ওঠে এবং অপরাপর সাধারণ মানুষের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করতে শুরু করে।

কৃষি বিপ্লবের পর আসে নগর বিপ্লব। এই সময় থেকে মানুষ অক্ষরের আবিষ্কার ও ব্যবহার করতে শুরু করে। মানুষের কর্মকাণ্ডের লিখিত দলিল তৈরি হয়। এই সময় থেকেই ইতিহাসে নগর সভ্যতার সূচনা হয়েছিল বলে ইতিহাসবিদগণ বলে থাকেন। নগরগুলোতে রাজা, রাজপরিবার, এবং তথাকথিত অভিজাত শ্রেণির জন্ম হয় যারা তৎকালীন সময়ের সুবিধাভোগী বাছাইকৃত একটি অংশ। তোমরা এটি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে, এই বাছাইকৃত অংশে তারা স্থান পেয়েছে তাদের সম্পদ, শক্তি ও ক্ষমতার বিবেচনায় যেখানে সাধারণ মানুষের কথা নেই বললেই চলে।

চলো এবার পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে গড়ে উঠা নগর সভ্যতা যেমন মিশরীয় সভ্যতা, সুমেরীয় সভ্যতা, মায়া সভ্যতা, চৈনিক সভ্যতা এবং ভারতীয় উপমহাদেশের হরপ্পা সভ্যতার মতো আমাদের বাংলা অঞ্চলেও আদিকালে কীভাবে সভ্যতার সূচনা হয়েছিল তা জানা যাক। এ-সকল সভ্যতা এবং বাংলা যে একটি অঞ্চল সে সম্পর্কে তোমরা তোমাদের অনুসন্ধানী বইয়ে বিস্তারিত জানতে পারবে। তবে এখানে বলে রাখা ভালো যে, বাংলা ভূ-প্রাকৃতিক সীমানা দিয়ে ঘেরা একটি ভৌগোলিক অঞ্চল যার মধ্যে রয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশ, ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা রাজ্য, এবং বিহার-উড়িষ্যা-আসাম-মেঘালয় রাজ্যের অংশবিশেষ। এই ভূ-খণ্ডেই ইতিহাসের হাজার বছরের পথ পরিক্রমায় নগর গড়েছে, বাংলা ভাষা-সমাজ-সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে, কতিপয় অভিজাত শ্রেণী ভূ-খণ্ড ও মানুষ দখল করে রাজা-রাজ্য বানিয়েছে, ক্রমাগত যুদ্ধ করেছে, আবার উচ্চাভিলাষী সুবিধাবাদীদের হারিয়ে সাধারণ মানুষের জয়ও সূচিত হয়েছে। এ-রকম ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় বাংলা ভূ-খণ্ডের পূর্বপ্রান্তের একটি রাজনৈতিক সীমানায় ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর নেতৃত্বে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে।

এবার আমরা জানবো এই বাংলা অঞ্চলের দু/একটি নগর এবং সেই নগরকেন্দ্রিক আদিকালের সভ্যতা সম্পর্কে। বাংলার ইতিহাসে এগুলো গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণ হিসেবে পাণ্ডুরাজার ঢিবি এবং পুণ্ড্রনগরের নাম বলা যেতে পারে। পাণ্ডুরাজার ঢিবি গড়ে উঠেছিল বাংলা অঞ্চলের পশ্চিমাংশে, বর্তমান ভারতের পশ্চিমবঙ্গ-এর বর্ধমান জেলায় অজয় নদের তীরে। বাংলা অঞ্চলে বসবাসকারী আদি অনার্য ভাষাভাষী মানুষের হাতেই এর সূচনা। আর পুণ্ড্রনগর গড়ে উঠেছিল বর্তমান বাংলাদেশের বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়ে, করতোয়া নদীর তীরে।

একটা ব্যাপার তোমরা খেয়াল করে দেখবে, সেই সময় প্রতিটা বিখ্যাত নগরীই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কোন না কোন নদীর তীরে। নদী ছিল যোগাযোগের প্রধানতম মাধ্যম। এই নদী পথেই বিভিন্ন এলাকা থেকে নগরে পণ্য এবং মানুষ যাতায়াত করতো। নদী ও সমুদ্রপথে মানুষ এক স্থান হতে অন্য স্থানে ছড়িয়ে পড়তো, চলতো ব্যবসা-বানিজ্য। তোমরা শুনে অবাক হবে যে, আজ থেকে দুই-আড়াই হাজার বছর আগে বাংলার নগরগুলির সাথে ইউরোপসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সমুদ্রপথে এই বাণিজ্য যোগাযোগ শুরু হয়েছিল। ইউরোপ থেকে যেসব নাবিক ও ব্যবসায়ীরা বাংলায় ব্যবসা করতে আসতেন তাদের সাথে অনেক জ্ঞানী-গুণী মানুষেরাও আসতেন। সেইসব মানুষদের লেখা পাণ্ডুলিপিও আমরা পেয়েছি। পাণ্ডুলিপিগুলো পাঠ করে প্রাচীনকালে

বাংলা অঞ্চলের মানুষ সম্পর্কে অনেক আকর্ষনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গেছে।

ক্লাসের সবাই গভীর মনোযোগ দিয়ে আপার কথা শুনছিল। খুশি আপা বললেন, এখন নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পারছো, প্রাচীন মানুষ কীভাবে শিকার ও সংগ্রহভিত্তিক যাযাবর জীবন ত্যাগ করে স্থায়ী বসতি ও নগর জীবনে প্রবেশ করেছিল। আমাদের বাংলা অঞ্চলে ইতিহাসের সূচনাকালীন সময়ের আরো বর্ণনা আমরা এখন জানতে শুরু করবো। বাংলার ইতিহাসের বিস্তারিত বিবরণ জানার আগে প্রাচীন মানুষ নিয়ে আরও দুয়েকটা কথা তোমাদের জানাতে চাই। ইতিহাস যে বিভিন্ন প্রমাণ বা উৎসের মাধ্যমে জানতে হয় সেই বিষয়টাও তোমরা খুব সহজে বুঝতে পারবে। এই বিষয়েও তোমরা অনুসন্ধানী পাঠ বইয়ে বিস্তারিত জানতে পারবে। যাই হোক, তোমাদের মধ্য থেকে যদি পারো কেউ একজন আমাকে বলোতো, বাংলা অঞ্চলে প্রথম কবে মানুষের বসতি শুরু হয়? সেই মানুষের কথা কীভাবে জানতে পারি আমরা?

ক্লাসের পেছনের সারিতে বসা সামিলা বললো, 'ফসিল উড'!

খুশি আপা বললেন, হ্যাঁ, 'ফসিল উড'!

ক্লাসের বাকি সবার দিকে তাকিয়ে আপা জানতে চাইলেন, তোমরা কি কেউ বলতে পারবে 'ফসিল উড' কী?

চার-পাঁচজন হাত উঁচু করলো।

ক্লাসের মাঝামাঝি সারিতে বসা নন্দিতার দিকে তাকিয়ে আপা বললেন, তুমি বলো তো 'ফসিল উড' কী?

নন্দিতা বললো, 'ফসিল উড' হচ্ছে এমন এক ধরণের কাঠ যা হাজার বছর ধরে প্রকৃতিতে থাকার ফলে আস্তে আস্তে পাথরের মতো কঠিন রূপ ধারণ করে। প্রাচীনকালে যে সকল এলাকায় পাথর সহজলভ্য ছিল না সেখানকার মানুষ হাতিয়ার তৈরিতে 'ফসিল উড' ব্যবহার করতো। উত্তর শুনে আপা খুবই খুশি হলেন।

নন্দিতাকে বসতে বলে তিনি নিজেই বলতে শুরু করলেন, ফসিল উডের আরেক নাম হচ্ছে জীবাশ্ম কাঠ। আদি কালে মানুষ জীবজন্তু শিকার এবং আত্মরক্ষার জন্যে নানারকম হাতিয়ার ব্যবহার করতো। হাতিয়ার পাথরে হতো, কাঠের হতো, আবার ফসিল উডও হতো। আমাদের দেশে যেহেতু পার্বত্য ভূমি এবং পাথর নেই তাই এ অঞ্চলে মানুষ অস্ত্র হিসেবে পাথরের মতো শক্ত ফসিল উড দিয়ে অস্ত্র বানিয়ে তা ব্যবহার করেছিল। মানুষের ব্যবহার করা হাতিয়ার পাওয়া গিয়েছে বাংলা অঞ্চলের বেশ কয়টি স্থানে। পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও বর্ধমান জেলায় প্রাচীন মানুষের ব্যবহৃত পাথরের হাতিয়ার পাওয়া গিয়েছে। এইসব হাতিয়ার নিয়ে পণ্ডিতগণ পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। তাদের ধারণা এইসব পাথুরে হাতিয়ার ব্যবহারকারী মানুষ প্রায় দশ হাজার বছর আগে বাংলায় বসতি স্থাপন করেছিল। হবিগঞ্জের চাকলাপুঞ্জি এবং কুমিল্লার লালমাই-ময়নামতিতে কিছু ফসিল উড পাওয়া গিয়েছে যা প্রায় ১৫০০ সাধারণ পূর্বাব্দে মানুষ ব্যবহার করতো বলে পণ্ডিতগণ গবেষণা করে জানতে পেরেছেন। আরো বিস্তারিত জানার জন্য তোমরা অনুসন্ধানী বই দেখতে পারো।

সুপ্রাচীন কাল থেকেই বাংলা অঞ্চলের ভূমি ছিল উর্বর। নদীতে ছিল প্রচুর মাছ। বনে-জংগলে ছিল নানা ফলমূল। আবার মানুষের জন্যে এখানে বেশ বিপদও ছিল। নদীতে ছিল কুমির। বনে ছিল বিষাক্ত সাপ, বাঘ, অন্যান্য হিংস্র প্রাণী ও পোকা-মাকড়। মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে এখানে ঝড়-তুফানও হতো বেশি। এইসব প্রতিকূলতার মধ্যেই টিকে থাকার যোগ্যতা অর্জন করতে হয়েছে বাংলা অঞ্চলের মানুষকে। বাংলার যেইসব স্থানে প্রাচীন মানুষের হাতিয়ার পাওয়া গিয়েছে সেগুলো সবই দেখবে আশেপাশের এলাকা থেকে একটুখানি উচ্চভূমি হিসেবে চিহ্নিত। প্রাচীনকালে বাংলার নদীগুলো ছিল আরও বেশি প্রমত্তা। জালের মতো ছড়িয়ে

থাকা অসংখ্য নদী যেমন ছিল, তেমনই ডাঙায় ছিল ঘন অরণ্য ও জংগল। মানুষ তাই নদীর তীর ঘেঁষে বনের সীমানা ধরে উঁচু ভূমিগুলোকে বসবাসের স্থান হিসেবে বেছে নিয়েছিল।

বন-জংগল কেটে নগর প্রতিষ্ঠার বর্ণনা কোনো রূপকথা নয়, বাংলা অঞ্চলের ইতিহাসে মানুষের জীবনের চরম সত্য। সংস্কৃত ভাষায় লেখা মহাকাব্যগুলো থেকে আমরা জানতে পারি, প্রাচীন কালে বাংলায় রাজ্য বা রাষ্ট্র গড়ে উঠার আগেই গড়ে উঠেছিল কিছু জনপদ। সংস্কৃত ভাষায় লেখা বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে জানা যায়, এখানে বঙ্গ, পুণ্ড্র, রাঢ়, গৌড়, সমতট, হরিকেল নামে অনেকগুলো জনপদ ছিল। জনপদগুলোকে বলা হয়ে থাকে একেকটা ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক ইউনিট বা একক। ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক একক মানে হলো, জনপদগুলো ছিল একটি জনগোষ্ঠীর বসতি কিন্তু একটি থেকে আরেকটি নানাভাবে পৃথক অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। ভৌগোলিকভাবেও ছিল আলাদা। এদের প্রত্যেকের সুনির্দিষ্ট সীমানা বলে কিছু ছিল না। যেমন ধরো, পুন্ড্র। একটু আগেই পুণ্ড্রনগরের কথা জেনেছো। বাংলার প্রাচীনতম নগর 'পুণ্ড্র'। পুণ্ড্র নামের মানুষেরাই ছিল পুণ্ড্র জনপদের বাসিন্দা। আর তাদের নগরের নাম ছিল পুণ্ড্রনগর। প্রাচীনকালে গড়ে ওঠা এই নগর বর্তমান বাংলাদেশের বগুড়া জেলায় পড়েছে। আবার বঙ্গ নাম পরিচয়ের মানুষ নিয়ে গড়ে উঠেছিল 'বঙ্গ' জনপদ। বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল নিয়ে গড়ে উঠেছিল বঙ্গ জনপদ। পশ্চিমে এর সীমানা বর্তমানের কোলকাতা পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছে কখনো কখনো। বঙ্গের পূর্বদিকে ছিল আরেকটি প্রাচীন জনপদ 'সমতট'। জনপদটি গড়ে উঠেছিল বর্তমান বাংলাদেশের কুমিল্লা-নোয়াখালি এবং ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের প্রধান অংশ নিয়ে। ছোট ছোট এই জনপদগুলোই ছিল বাংলা অঞ্চলের প্রথম রাজনৈতিক একক। জনপদগুলোতে যারা বাস করতেন তারা ছিলেন প্রধানত অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ। তাদের পাশাপাশি ছিল দ্রাবিড়, চৈনিক, তিব্বতী-বর্মী ভাষায় কথা বলা আরও দু/তিনটি ভাষাগোষ্ঠী। এরা হাজার বছর ধরে নিজেদের ভাষা, লোকজ ধর্ম ও সংস্কৃতি নিয়ে নিজেদের মতোই জনপদ গড়ে তুলে বসবাস করছিল। যতোদূর জানা যায়, এরাই ছিল বাংলার আদি বাসিন্দা। তোমাদের জেনে রাখা প্রয়োজন, বাংলা অঞ্চলের (বর্তমান বাংলাদেশ এবং ভারতের পশ্চিমবংগ, ত্রিপুরা ও অন্যান্য অংশ) বহু স্থানে এখনো কোল, ভিল, সাঁওতাল, শবর, পুলিন্দ, নিষাদ নামের আদিবাসী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী রয়েছে। এইসব পূর্বসুরিদের হাত ধরেই বাংলার প্রাচীন জনপদগুলো দীর্ঘদিন পর্যন্ত ইতিহাসের পথ ধরে সামনে এগিয়ে গেছে। তোমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, আদিবাসী ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মানুষেরা এখন তাহলে এতো কম কেন? এই জনগোষ্ঠীর বাইরে যে বাংলা ভাষাভাষী কোটি কোটি মানুষ রয়েছে তাদের আগমন কখন কীভাবে হয়েছে? কী তাদের পরিচয়?

নীলান্তসহ ক্লাসের সকলে গভীর মনোযোগ দিয়ে খুশি আপার মুখে ইতিহাসের বর্ণনা শুনছিল। আপা এবার বললেন, বাংলা অঞ্চলে বর্তমানে প্রায় ৩০ কোটির উপরে মানুষ বসবাস করছে। এর মধ্যে কেবল আমাদের বাংলাদেশে রয়েছে ১৭ কোটির মতো মানুষ। এই মানুষের বেশিরভাগ বাংলা ভাষাভাষী বাঙালি। হাজার বছরের পথ পরিক্রমায় বাংলা ভূ-খণ্ডে প্রবেশকারী নানান দৈহিক গড়ন ও ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ মিলে-মিশে বাঙালি জনগোষ্ঠী গড়ে তুলেছে। এই জনগোষ্ঠীর বয়স কয়েক হাজার বছর। কিন্তু ভাষা গঠন প্রক্রিয়ার বিচারে বাংলা ভাষার বয়স মোটামুটিভাবে দেড় হাজার বছর।

প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে ভাগ্য অনুসন্ধানে, খাবারের প্রয়োজনে, ব্যবসা-বাণিজ্যের কারণে বাংলায় আগত নানান ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি ও জনধারার মানুষ মিলনে-বিরোধে একসাথে বসবাস করেছে। সকল মানুষের মধ্যে মিলন-মিশ্রণ ঘটলেও কিছু কিছু আদিবাসী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী নিজেদের আদি সংস্কৃতি ধরে রাখতে পেরেছে। বাঙালিরাও হাজার বছর ধরে তাদের ভাষা-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা করে চলেছে। জল-জংগলের প্রতিকূলতা জয় করে পৃথিবীর বুকে টিকে থাকার যোগ্যতাসম্পন্ন বাংলা অঞ্চলের সকল মানুষ ভিন্নতর অভিজ্ঞতা নিয়ে এই ভূ-খণ্ডে ইতিহাস রচনা করেছে। এই ইতিহাসে তাই ভৌগোলিক বিষয়াবলীর প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

অন্বেষা দাঁড়িয়ে জানতে চাইলো, আচ্ছা আপা বাংলা অঞ্চলের পূর্ব অংশে আমাদের বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে ১৯৭১ সালে। তার আগে এই অঞ্চলে কি রাজা, রাজ্য ছিল? যদি থাকে কী ছিল তাদের পরিচয়? তারাও কি সব সময় যুদ্ধ করতো? খাবার আর সম্পদ দখল করতো?

খুশি আপা হাসতে হাসতে বললেন, তোমাদের মাথায় এখনো ঘুরছে রাজপুত্র আর রাজার সেই কাহিনী। তিনি বলে চললেন, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের প্রাচীন ইতিহাসে বিভিন্নভাবে রাজা, রাজপুত্র, রাজকন্যা আর রাজ্যের দেখা পাওয়া যায়। আমাদের বাংলা অঞ্চলও এর ব্যতিক্রম নয়। তবে সম্রাট, রাজা, বাদশাহ, সুলতান, নবাব উপাধীধারীরা ছিলেন তথাকথিত অভিজাত এবং নিজেদের নাম, যশ, খ্যাতি, আর গৌরব প্রচারে ব্যতিব্যস্ত। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে উচ্চাভিলাষী অভিজাত যোদ্ধাদের অনেকেই বাংলা অঞ্চলে প্রবেশ করেছেন, ভূখন্ড ও সম্পদ দখল করেছেন এবং সাধারণ মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো মূল্য না দিয়ে তাদের ভাষা-ধর্ম-রাজনীতি এখানকার মানুষের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। যেমন মৌর্য রাজা, গুপ্ত রাজা, সেন রাজা, খলজী রাজা, হোসেন শাহ সুলতান, নবাব মুর্শিদ কুলী খান, বৃটিশ এবং পাকিস্তানি শাসক। স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন একমাত্র নেতা যিনি বাংলা অঞ্চলের কাদা-মাটি, নদী-নালা, বিল, হাওর-বাওর, বৃষ্টি আর সবুজের ভেতর দিয়ে উঠে এসে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাঁর পূর্বে বাংলার ইতিহাসে এই ভূ-খন্ড থেকে উঠে আসা আর কোনো নেতা সাধারণ মানুষের মুক্তির জন্যে, সকল ধর্মের সকল মানুষের মধ্যে ভালোবাসা ও সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্যে জীবন বাজি রেখে কাজ করেন নি।

প্রাচীন কাল থেকে ১৯৭১ সাল অবধি কীভাবে নতুন নতুন রাজশক্তি, জনধারা, নতুন নতুন ভাষা ও ধর্ম-সংস্কৃতির মানুষ এসে বাংলা অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করেছে তার কিছুটা ধারণা তোমরা পেয়েছো। দখলদারিত্ব ও আধিপত্য বিস্তার করতে গিয়ে অনেকেই অবশ্য প্রতিরোধের মুখে পরেছে। এই সব অভিজাত উচ্চাকাংখী মানুষের অনেক বাঁধার মুখেও এখানকার সকল মানুষ ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে হাজার বছর যাবত মিলে-মিশে জীবন কাটিয়ে চলেছে। অনেক বাঁধা-বিপত্তি পেরিয়ে সাধারণ মানুষ নিজের ভাষা, সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি নির্মাণ করেছে।

অন্বেষা আর নীলান্তকে লক্ষ করে খুশি আপা বললেন, তোমরা জেনেছো যে বাংলার প্রাচীন জনপদগুলো গড়ে তুলেছিল প্রধানত অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, চৈনিক ও তিব্বতী-বর্মী ভাষার মানুষেরা। এইসব জনপদে প্রথম বড় একটা ধাক্কা আসে যখন আর্য ভাষার মানুষেরা উত্তর ভারতে মৌর্য সাম্রাজ্য নামে একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। তোমরা অনেকেই হয়তো শুনে থাকবে, ৩২৭ সাধারণ পূর্বাব্দে উত্তর-পশ্চিম ভারতে গ্রিক যোদ্ধা আলেকজান্ডার আক্রমণ করেছিলেন। ভারতের উত্তর-পশ্চিম দিকে কিছু অংশ জয় করেই তাঁর ভারত অভিযান শেষ হয়েছিল। আলেকজান্ডারের চলে যাওয়ার কিছুকাল পরেই উত্তর ভারতে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য নামে একজন সম্রাটের উত্থান হয়। তিনি মৌর্য নামে একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্য গড়ে তুলেন। মৌর্যরা ছিল আর্য ভাষাভাষী অভিজাত মানুষ। আনুমানিক ৩৫০০ সাধারণ পূর্বাব্দে তারা মধ্য এশিয়া থেকে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিল। ধীরে ধীরে তারা ভারতের আদি অধিবাসীদের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে করতে পূর্ব দিকে বাংলা অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হতে থাকে।

মৌর্যদের আলোচনা প্রসংগে আর্য ভাষা এবং এই ভাষায় লেখা কয়েকটি গ্রন্থ সম্পর্কে তোমাদের জানা প্রয়োজন। আর্য ভাষাভাষী মানুষের হাতে রচিত হয়েছিল রামায়ণ, মহাভারত, বেদ, পুরাণ নামক সংস্কৃত গ্রন্থ। ভারতবর্ষে আর্যরাই প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেছিল। এই ধর্মের রয়েছে নিজস্ব গ্রন্থ, নিজস্ব সংস্কৃতি। সেকালে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম-সংস্কৃতির মানুষেরা নিজ সমাজের বাইরের সবাইকে তুচ্ছ জ্ঞান করতো। তারা নতুন অঞ্চল দখল করে সেখানে নিজেদের ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতে থাকে প্রবলভাবে। আর্য

ভাষাভাষী মানুষের হাতে রচিত মহাভারতে বাংলার প্রাচীন দুইটি জনপদ 'বঙ্গ' এবং 'পুণ্ড্র'-এর নাম পাওয়া যায়। আর্য ভাষাভাষীদের রচিত অন্য কয়েকটি গ্রন্থে বঙ্গ এবং পুণ্ড্রের মানুষদেরকে 'দস্যু', 'অসভ্য', 'নিচু' শ্রেণীর বলে অভিহিত করা হয়েছে। আসলেই কি কোনো অঞ্চলের অধিবাসীদেরকে এইভাবে হেয় করা যায়? সকলেই তো আমরা মানুষ। মানুষ পরিচয় সবার আগে। আভিজাত্য, ক্ষমতা এবং ভাষা-ধর্ম-সংস্কৃতির বড়াই করে কাউকে হেয় বা অসম্মান করা একেবারেই অনুচিত। আর্য ভাষায় রচিত গ্রন্থগুলো সব সময়ই নিজেদের ভাষা-ধর্ম-সংস্কৃতিকে 'শ্রেষ্ঠ' এবং অনার্য ভাষা-ধর্ম-সংস্কৃতিকে 'ছোট' দৃষ্টিতে দেখেছে। অথচ এই অনার্য ভাষা গোষ্ঠীর মানুষেরাই বাংলা অঞ্চলে সুসংগঠিত সমাজ ও সভ্যতা রচনা করেছিল। যার প্রমাণ পাণ্ডু রাজার ঢিবি, যা কিছু আগেই তোমরা জেনেছো। কিন্তু তোমরা দেখবে, বাংলার দূরবর্তী ভূ-খণ্ড থেকে যখনই নতুন কোনো ভাষা, রাজশক্তি এবং ধর্ম ভারতের পূর্বাংশ তথা বাংলা অঞ্চলে প্রবেশ করেছে, তখনই সেখানকার মানুষদেরকে অনার্য বলে হেয় করেছে, অসম্মান করে তাদের গ্রন্থগুলোতে উল্লেখ করেছে। অভিজাত শ্রেণীর আর্য ভাষাভাষী কতিপয় মানুষের এই বড়াই ইতিহাসে গ্রহণযোগ্য নয়।

যাহোক, শক্তিশালী মৌর্য সাম্রাজ্যের আলোচনায় ফেরত যাওয়া যাক। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য, বিন্দুসার, অশোক ছিলেন এই বংশের সবচেয়ে ক্ষমতাবান সম্রাট। মৌর্য সম্রাটগণ বাংলার উত্তর অংশ দখল করে তাদের রাজ্যভুক্ত করেছিলেন - এই খবর আমরা জানতে পেরেছি মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত একটি শিলালিপি থেকে। প্রাচীনকালে রাজারা তাদের আদেশ পাথরে খোদাই করে বিভিন্ন প্রদেশে প্রেরণ করতেন। এমনই একটি আদেশনামা পাওয়া গিয়েছে মহাস্থানগড় প্রত্নস্থলে। শিলা বা পাথরের গায়ে লিপি খোদাই করে লেখা হতো বলেই একে আমরা শিলালিপি বলে থাকি। মৌর্যদের পর উত্তর ভারতে শক্তিশালী সাম্রাজ্য স্থাপন করে গুপ্ত বংশের সম্রাটগণ। এই বংশের সম্রাটদের মধ্যে ছিলেন প্রথম চন্দ্রগুপ্ত, সমুদ্রগুপ্ত, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত প্রমুখ। চতুর্থ শতকের মাঝামাঝি সময়ে সমুদ্রগুপ্ত বাংলা অঞ্চলে অভিযান চালিয়ে বঙ্গ, পুণ্ড্র প্রভৃতি জনপদ দখল করেন। সমুদ্রগুপ্তের পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময় মেঘনা নদীর পূর্ব তীরে সমতট পর্যন্ত গুপ্তদের আধিপত্য বিস্তৃত হয়। আর্য ভাষার মানুষেরা এই সময় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম নিয়ে বাংলায় ব্যাপকভাবে তৎপরতা চালায়। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের দেবদেবী বাংলা অঞ্চলের সাধারণ মানুষের লোকধর্ম চর্চার উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। এই অঞ্চলের ধর্মীয় রীতি-নীতি ও প্রথা-পদ্ধতিতে লোকজ উপাদানের প্রভাব সব চাইতে বেশি। তারা বৃক্ষ, পাথর, আগুন ও সাপ-সহ প্রকৃতির পূজা করতো। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনুসারী মানুষেরা প্রকৃতির এইসব উপাদানকে বাতিল করে নিজস্ব ধর্ম ও দেবদেবী প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত উদ্যোগ নেয়। বাংলা অঞ্চলে আদি বসতি স্থাপনকারীদের অনেকেই তা মেনেও নেয়। আবার প্রাচীনকাল থেকে যেসব প্রাকৃতিক শক্তি পূজার লোকজচর্চা চলতো তাও অনেকটাই টিকে থাকে। এইভাবেই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম-সংস্কৃতির সাথে আদি অধিবাসীদের পুরনো ধর্ম-সংস্কৃতি মিলেমিশে চলতে থাকে।

এতক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো, মৌর্য এবং গুপ্তদের আগ্রাসনের ফলে জনপদগুলো তাদের নাম ও অস্তিত্ব হারিয়ে উত্তর ভারতে শক্তিশালী সাম্রাজ্যের অধীনে চলে গিয়েছিল। গুপ্ত সম্রাটগণ এক সময় দুর্বল হতে থাকে। তাদের সাম্রাজ্য ভেঙে যায়। বাংলা অঞ্চলে তখন 'বঙ্গ' এবং 'গৌড়' নামে দুটি রাজ্য গড়ে ওঠে। বঙ্গ রাজ্যের কেন্দ্রস্থল ছিল বর্তমান বাংলাদেশের গোপালগঞ্জ জেলার কোটালিপাড়া। গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য, দ্বাদশাদিত্য এবং সমাচারদেব ৬ষ্ঠ শতাব্দী থেকে এখানে রাজত্ব করেছেন। অন্যদিকে গৌড় রাজ্যটির অবস্থান ছিলো বর্তমান ভারতের পশ্চিম বাংলার মালদা, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বর্ধমান এলাকা জুড়ে। তবে হ্যাঁ, এদের সীমানা যে সব সময় একই ছিল তা কিছুতেই বলা যাবে না। রাজাদের শক্তি ও ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সীমানাও বদল হয়ে যেতো। কখনও এইসব রাজ্যের রাজারা অভিযান চালিয়ে নতুন এলাকা দখল করেছে, আবার কখনও অন্য এলাকার রাজাদের আক্রমণের ফলে নিজ রাজ্যের সীমানা সংকুচিত হয়েছে। গৌড়ের বিখ্যাত রাজার নাম ছিল শশাংক।

খুশি আপা প্রাচীন প্রশাসন ব্যবস্থার প্রতি শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করে বললেন, তোমাদের মনে রাখতে হবে, মৌর্য ও গুপ্তরা এখানে আধিপত্য বিস্তারের পর নতুন কিছু প্রশাসনিক ইউনিট গড়ে তুলে তাদের শাসনকাঠামো রচনা করেছিলেন। বর্তমানে যে রকম বিভাগ, জেলা, ইউনিয়ন নামে প্রশাসনিক কাঠামো তোমরা দেখতে পাও, তেমনিভাবে সেই সময়ে ছিল ভুক্তি, বিষয়, মণ্ডল, বিথী, ও গ্রাম নামে প্রায় একই ধরণের প্রশাসনিক ইউনিট। আর শাসনকাজ পরিচালনার জন্যে সাম্রাজ্যের কেন্দ্র থেকে সম্রাট বড় বড় যোদ্ধা এবং সেনাপতিদের পাঠাতেন। উচ্চ পদস্থ এই শাসকরা বাংলা অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন। এদের পাশাপাশি আসতো নতুন ধর্ম-সংস্কৃতি আর অনেক বিদ্বান, পুরোহিত, ব্যবসায়ী মানুষজন। রাজ্য বিস্তারের পাশাপাশি নতুন ধর্ম-সংস্কৃতি বিস্তারেও তারা কাজ করতেন। এইভাবে দীর্ঘকাল চলতে থাকে। কোনো এক সময় কেন্দ্রীয় সাম্রাজ্যে গোলযোগ দেখা দিলে কিংবা সম্রাট দুর্বল হয়ে পড়লে বাংলা অঞ্চলের উচ্চপদস্থ সামরিক ব্যক্তিদের অনেকেই নিজেদেরকে স্বাধীন ঘোষণা দিয়ে কেন্দ্রের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলতেন। বাংলা অঞ্চলে যেসব রাজার নাম তোমরা পাবে তাদের অধিকাংশই দেখবে বাংলা ভূ-খণ্ডের সীমানার বাইরে বহুদূর থেকে এই অঞ্চলে প্রবেশ করেছেন। তার মানে কি জানো? তার মানে হচ্ছে, বাংলায় আদি যে অধিবাসীরা ছিলেন রাজক্ষমতা তাদের হাতে ছিল না। তারা ছিলেন সাধারণ। প্রতিকূল প্রকৃতি আর হিংস্র জীব-জন্তু হতে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে জীবন ধারণ করাই ছিল তাদের জন্য সবচাইতে বড় চ্যালেঞ্জ। বাংলা অঞ্চলে তাই যখনই কোনো রাজ্য প্রতিষ্ঠা হয়েছে, তার নেতৃত্ব দিয়েছেন বহু দূরবর্তী অঞ্চল থেকে আসা এলিট/ অভিজাত প্রশাসক অথবা উচ্চাভিলাষী কোনো যোদ্ধা। প্রাচীনকাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বাংলার ইতিহাসের গোটা সময়কালে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারত, তুরস্ক, পারস্য (ইরান), উজবেকিস্তান এবং পরবর্তীকালে ইউরোপ ও পাকিস্তানের নাম-যশ-খ্যাতি বিস্তারে ব্যতিব্যস্ত কতিপয় উচ্চাভিলাষী অভিজাত শ্রেণী বাংলা অঞ্চলকে বারবার দখল ও আধিপত্য বিস্তার করেছে। দখলদারদের নিয়োজিত সভাকবি বা ইতিহাসবিদদের লিখে যাওয়া বিবরণ অনুসরণ করে বর্তমানেও এক শ্রেণীর ইতিহাসবিদ ঐ সকল দখলদারেরই 'শ্রেষ্ঠত্ব' আর 'গৌরব'-এর ইতিহাস রচনা করে চলেছেন, যেখানে বাংলা ভূ-খণ্ডের সাধারণ মানুষের অর্জিত অভিজ্ঞতার বর্ণনা বলতে গেলে প্রায় পুরোটাই অনুপস্থিত। এইসব তোমরা যখন বড় হয়ে আরও বিস্তর এক পরিসরে ইতিহাস পড়বে, তখন জানতে পারবে। বুঝতে পারবে, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এলিট শ্রেণীর অল্প কিছু মানুষ কীভাবে বারবার এই ভূ-খণ্ডের সাধারণ মানুষের ভাগ্য নির্ধারণের খেলায় মেতেছিল। বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস এই ধরণের ঘটনার পুনরাবৃত্তির ইতিহাস।

অন্বেষা দাঁড়িয়ে খুশি আপার কাছে জানতে চাইলো, প্রাচীনকালে বাংলা ভূ-খণ্ডে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম-সংস্কৃতির বাইরে আর কোনো ধর্ম কি ছিল? উত্তরে খুশি আপা বললেন, তোমাদেরকে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের কথা বলেছি। আমাদের ভূ-খণ্ডের সাধারণ মানুষেরা লোকজ ধর্মের চর্চা করতেন তাও তোমরা জেনেছো। এইবার চলো, আরও একটি জনপ্রিয় ধর্ম-সংস্কৃতির কথা সংক্ষেপে জেনে নেই। এটি হচ্ছে বৌদ্ধ ধর্ম। এটিও একটি প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম এবং এর রয়েছে একটি শক্তিশালী সাংস্কৃতিক দিক। ৬০০ সাধারণ পূর্বাব্দে সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধের মাধ্যমে বৌদ্ধ ধর্মের উদ্ভব হয়। দেব, পাল এবং চন্দ্র রাজাদের সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম বাংলা অঞ্চলে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। পাল বংশ প্রায় চারশো বছর বাংলার উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম অংশে শাসনকার্য পরিচালনা করে। এই সময় বাংলা অঞ্চলে অনেকগুলো শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। এই শিক্ষাকেন্দ্রগুলোকে বলা হতো বিহার। বিহারে প্রধানত বৌদ্ধ ধর্মসহ অন্যান্য শাস্ত্র শিখানো হতো। বৌদ্ধ ধর্ম-সংস্কৃতিকে বাংলা অঞ্চলের নগরে বসবাসকারী মানুষ ধীরে ধীরে গ্রহণ করতে শুরু করে। এই প্রবণতা সাধারণ মানুষের মধ্যে দ্রুতই ছড়িয়ে পড়েছিল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলার আদি লোকজ ধর্মচর্চার নানাবিধ দিক বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে প্রবেশ করে। এভাবে বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মের রূপান্তরিত অনেকগুলো ধারা চালু হয় যা ছিল অন্যান্য অঞ্চলের বৌদ্ধ ধর্ম থেকে আলাদা। বাংলা অঞ্চলের আদি অধিবাসীরা বিভিন্ন দেবদেবী ও প্রাকৃতিক শক্তির পূজা করতো। বৌদ্ধ ধর্মে ঈশ্বর এবং মূর্তি

পূজার নিয়ম ছিল না। কিন্তু বাংলা অঞ্চলের মানুষ বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে স্বয়ং গৌতম বুদ্ধের বিভিন্ন মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে। এইভাবে দেখা যায়, নতুন ধর্ম সংস্কৃতি যখনই বাংলায় এসেছে, বাংলা অঞ্চলের মানুষ তা নিজের মতো করে গড়ে নিয়েছে এবং নতুন ধর্ম-সংস্কৃতির পাশাপাশি হাজার বছরের পুরনো সংস্কৃতিকে ধরে রেখেছে। এরই ধারাবাহিকতায় প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মগুলো যখনই বাংলায় প্রবেশ করেছে, ধর্মের কঠোর বিধি-নিষেধ উপেক্ষা এবং লোকজ রীতি-নীতি গ্রহণ করে এটিকে লৌকিক ধর্মে রূপদান করেছে।

পালদের পর একাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ভারতের দাক্ষিণাত্য থেকে আসা সেন রাজারা বাংলা অঞ্চল দখল করে নেয়। প্রাচীনকালে বিজয়সেন-ই প্রথম রাজা যিনি বাংলার গোটা অঞ্চলকে একত্রিত করে শাসন করতে সক্ষম হয়েছিলেন বলে ইতিহাসে জানা যায়। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনুসারী সেন রাজারা একদিকে যেমন ধর্মীয় কঠোরতা আরোপ করেছিলেন অন্যদিকে তেমনই সংস্কৃত সাহিত্যের স্বর্ণযুগ রচনা করেছিলেন। সেন যুগে তাই বাংলার নগর জীবনে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব কমে গিয়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আধিপত্য বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে ব্রাহ্মণ্যবাদের গোঁড়ামি ও কঠোরতা আরোপের ফলে গ্রামীণ জীবনে সাধারণ মানুষের মধ্যে এক সামাজিক বিপ্লবের জন্ম হয়। এই বিপ্লবে নিম্নবর্ণের হিন্দু এবং বৌদ্ধদের একটি অংশ ইসলামে ধর্মান্তরিত হয় বলে পণ্ডিতগণ মনে করেন।

১২০৪ সাধারণ অব্দে বাংলার পশ্চিম অংশে আবারো নতুন একটি রাজশক্তির উত্থান হয়। সুদূর তুরস্ক থেকে আগত একজন উচ্চাভিলাষী যোদ্ধা আমাদের বাংলা অঞ্চলের বৃহত একটি অংশ দখল করে নেন। তিনি হলেন ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজি। কয়েকটি বিহার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ধ্বংস এবং রাজা লক্ষণসেনকে পরাজিত করে নদীয়া ও গৌড় দখলকারী বখতিয়ার প্রতিষ্ঠা করেন খলজি বংশ। লখনৌতিতে স্থাপিত হয় তাদের রাজধানী। খলজি রাজাদের ভাষা, ধর্ম এবং সংস্কৃতি ছিল বাংলা অঞ্চলের সাধারণ মানুষের ভাষা, ধর্ম এবং সংস্কৃতি থেকে একেবারেই ভিন্ন। খলজি যোদ্ধা এবং রাজারা ছিলেন ইসলাম ধর্ম অনুসারী। কিন্তু বাংলা অঞ্চলের মানুষ ছিলেন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, শৈব ধর্ম, বৈষ্ণব ধর্ম এবং জনপ্রিয় লোকধর্ম-এর অনুসারী। ধীরে ধীরে পীর, সুফি, দরবেশ ও সুলতানদের প্রচারনায় ইসলাম বাংলার সাধারণ মানুষের কাছে দ্রুতই পরিচিতি লাভ করতে শুরু করে। দিল্লির সুলতান এবং মোগল শাসকগণ বাংলার জল-জংগলে ইচ্ছাকৃতভাবে নিয়মিত নিষ্কর জমি দান করতেন। এইভাবে তাদের ভূমি সম্প্রসারণ নীতি বাংলা অঞ্চলে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে। পরবর্তীকালে আরো নানান রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘটনা ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রচার ও বিকাশে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। হাজার বছর পূর্বে এই ভূমিতে প্রথম বসতি স্থাপনের সময় যে রীতি-নীতি প্রথা ও সংস্কৃতির চর্চা শুরু হয়েছিল সাধারণ মানুষ তা কখনোই সম্পূর্ণ রূপে ত্যাগ করেনি। এই কারণেই দেখা যায় বাংলায় নানা ধর্ম-বর্ণ-ভাষা-সংস্কৃতি থাকা সত্ত্বেও এই ভূমির সকল মানুষ সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের এক আশ্চর্য বন্ধনে আবদ্ধ। ধর্মের চেয়ে মানুষ পরিচয় সব সময়ই এখানে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। চন্ডিদাস থেকে শুরু করে লালন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম- সবাই মানবতার জয়গান করেছেন। মধ্যযুগের বিখ্যাত কবি চন্ডিদাস লিখেছেন,

'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'!

তোমরা যখন আরও বড় হবে বাংলা অঞ্চলের রাজনৈতিক ইতিহাস আরও বিস্তৃত পরিসরে পাঠ করার সুযোগ পাবে। কিন্তু একটা কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে, কেবল রাজা-বাদশাহদের ইতিহাস পাঠ করে এই ভূমির মানুষকে তুমি মোটেই জানতে ও বুঝতে পারবে না। মানুষকে জানতে হলে মানুষের সংস্কৃতি, রীতিনীতি, প্রথা-পদ্ধতি - সবই জানতে হবে। তোমরা দেখবে, বিভিন্ন শতাব্দীতে বিভিন্ন রাজবংশের উত্থান হচ্ছে। উত্তর ভারতের সাথে চলছিল বাংলার আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লড়াই। বাংলার একেকটি অংশে আলাদা রাজবংশ শাসন

করছে। বাইরে থেকে ভাগ্যান্বেষী নানা যোদ্ধা দল এসে দখল করে নিচ্ছিল বাংলা অঞ্চল। এইভাবেই কালক্রমে বাংলা অঞ্চলের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস পরিবর্তিত হয়েছে।

১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধের কথা তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। এই যুদ্ধের পর ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার ক্ষমতা দখল করে নেয়। কোম্পানির লোকেরা একশো বছর বাংলা সহ ভারতবর্ষ শাসন করেছে। ১৮৫৮ সালে কোম্পানিকে সরিয়ে সরাসরি ব্রিটিশ রাজের অধীনে নেওয়া হয় বাংলার শাসন ক্ষমতা। ইংরেজরা প্রায় দুইশো বছর বাংলা দখল করে রাখে। পূর্বে যেসব ভাগ্যান্বেষী যোদ্ধা ও নানান রাজশক্তি বাইরে থেকে বাংলায় এসেছে তারা অধিকাংশ সময়েই এখানে বসতি স্থাপন করে স্থানীয় মানুষের সাথে মিশে গিয়েছে। এর ফলে মানুষের প্রতিবাদ ছিল কম, কিন্তু জীবনাচারে সেইসব শক্তির প্রভাব পড়েছে ব্যাপকভাবে। ইংরেজরা এখানে এসে স্থায়ী হবার পরিবর্তে এই ভূমির সম্পদ আহরণে বেশি মনযোগী ছিল তারা। বেশি বেশি রাজস্ব আদায়, জোর করে সাধারণ মানুষকে দিয়ে জমিতে নীল চাষ করিয়েছে। এর ফলে ইংরেজদের বিরুদ্ধে মানুষ ব্যাপকভাবে বিদ্রোহ করতে শুরু করে। এইসব বিদ্রোহ এবং প্রতিরোধ আন্দোলনের ফলে এক সময় ইংরেজরা উপমহাদেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। এতদসত্ত্বেও আমাদের মনে রাখতে হবে, পূর্ববর্তী অভিজাত ক্ষমতাবান রাজশক্তির মতো এদের সাথেও উপমহাদেশে নতুন এক ধর্ম-সংস্কৃতি প্রবেশ করেছিল। বাংলার মানুষের মুখের ভাষায়, খাদ্যাভাসে, জামাকাপড়ে তাই ইউরোপীয় সংস্কৃতির অনেককিছুই এখন সকলের কাছে পরিচিত বলে অনুভূত হয়।

শুরু থেকেই তোমরা দেখেছো, বাংলা অঞ্চলের মানুষের উপর ভূ-মধ্যসাগরের আশে-পাশের অঞ্চল, পারস্য (ইরান) এবং অন্যান্য অঞ্চলের তথাকথিত অভিজাত শ্রেণী দখলদারিত্ব এবং আধিপত্য বিস্তার করেছে। বাংলা অঞ্চলের মানুষের ভাগ্য প্রায় সব সময়ই বহু দূরের ভূ-খন্ড হতে আগত সুবিধাবাদী তথাকথিত অভিজাত শ্রেণী নির্ধারণ করেছে। এই ভূ-খন্ডের অনার্য ভাষা-সংস্কৃতির মানুষেরা বারবার শোষিত হয়েছে। ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে যারা অবস্থান করেছে তারা কেবল নিজেদের নাম-যশ-খ্যাতি ও সুবিধা লাভের চিন্তায় থেকেছে বিভোর। ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার বানিয়ে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করেছে। ক্ষমতালিপ্সু অভিজাত সম্প্রদায় প্রাচীনকাল থেকেই ধর্ম-কে ব্যবহার করেছে নিজেদের প্রয়োজনে। এর প্রমাণ পাওয়া যাবে পাল, সেন যুগের রাজকীয় দলিলে, সুলতান ও মোগল শাসকদের ভূমি কেনা-বেচা ও লেনদেনের দলিলে, ব্রিটিশ এবং পাকিস্তান আমলের সরকারি দলিলপত্রে। ইংরেজরা ১৯৪৭ সালে যখন ভারত ভাগ করে ফেরত চলে যায়, তখন এখানকার অভিজাত রাজনীতিবিদগণ বাংলার হাজার বছরের ঐতিহ্যকে অনুসরণ না করে কেবল ধর্মের ভিত্তিতে নতুন রাজনৈতিক পরিচয় নির্মাণের উদ্যোগ নেন। ইতিহাসের সাথে সম্পূর্ণ সংগতিবিহীনভাবে বাংলা অঞ্চলের পূর্বাংশের নাম করা হয় পূর্ব পাকিস্তান। বাংলা ভূ-খন্ডের আদিকালীন নাম 'বংগ' হারিয়ে যায় কতিপয় এলিট রাজনীতিবিদের সুবিধাবাদী রাজনীতির অন্ধকারে। অথচ 'বংগ' নামটির হাজার বছরের পথ পরিক্রমায় নির্দিষ্ট একটি ভূ-খন্ডে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর বহু-বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এবং নানা ঘটনার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর নেতৃত্বে স্বাধীন সার্বভৌম 'বাংলাদেশ'-এর অভ্যুদয় ঘটে।

সামাজিক পরিচয়

গ্রীষ্মের ছুটিতে অন্বেষাদের ক্লাসের সবাই স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ ও অস্ট্রেলিয়া জাতীয় পুরুষ ক্রিকেট দলের খেলা দেখতে গিয়েছে। তাদের সঙ্গে খুশি আপাও আছেন। খেলার দিন পরিকল্পনা অনুসারে সকাল নয়টার মধ্যে সবাই স্টেডিয়ামে পৌঁছে গেল। নির্দিষ্ট সময়ে শুরু হলো খেলা। বাংলাদেশ টসে জিতে বোলিং নিল। টস জেতায় সবাই খুব খুশি। অস্ট্রেলিয়ার ওপেনিং জুটি দারুণ খেলছে। প্রথম ওভারেই পরপর তিনটা বাউন্ডারি হাঁকাল।

স্কুলের সব বন্ধু হঠাৎ চুপ হয়ে গেল। মন খানিকটা খারাপ হতে শুরু করেছে।

এমন সময়ই একটা উইকেট পড়ল। উইকেট কিপার দুর্দান্ত একটা 'কট বিহাইন্ড' করলেন। গ্যালারিতে শুরু হলো আনন্দের ঢেউ। পাশেই একজন বাদামবিক্রেতা চিৎকার করে সেই আনন্দে যোগ দিলেন। তারপর খুশি আপা সেই আনন্দে সবাইকে বাদাম খাওয়ালেন। আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে বেজে উঠল ঢোল আর বাঁশি। শুরু হলো গ্যালারি জুড়ে মেক্সিকান ওয়েভ।

অস্ট্রেলিয়া পরপর দুটো ছক্কা মারলে কয়েকজন অস্ট্রেলিয়ান দর্শক ৬ লেখা প্ল্যাকার্ড তুলে ধরল। পরের তিনটে বল পরপর ডটবল হলো। তার পরের বল লাগল প্যাডে। হাউ-ইজ-দ্যাট! প্রত্যেকের চোখ তখন অস্ট্রেলিয়ার সমর্থকদের দিকে। না, আম্পায়ার মাথা নাড়লেন-নট আউট।

এরপর একে একে বল হাতে মাশরাফি, মুস্তাফিজ, তাসকিন বা সাকিবরা যখন এগিয়ে আসেন, সবাই চোখের পলক ফেলতে ভুলে যায়, আশা করে যেন ওদের উইকেট পড়ে।

অস্ট্রেলিয়া দলের ব্যাটিং শেষে বাংলাদেশের সাকিব, মুশফিক, মাহমুদুল্লাহ যখন চার-ছয় মারে, ক্লাসের সবাই উল্লাসে চিৎকার করে ওঠে। বাংলাদেশ দলের উইকেট পড়ে গেলে সবাই একসঙ্গে হতাশ হয় আর আফসোস করে।

বাংলাদেশ জাতীয় দলের ক্রিকেটারদের ছবি

খেলা নিয়ে আলোচনা

খুশি আপা: কাল যে আমরা বাংলাদেশ দলের ক্রিকেট খেলা দেখলাম, তোমাদের সবার কেমন লাগল?

মিলি: আমার খুব ভালো লেগেছে।

দীপঙ্কর: আমারও ভীষণ ভালো লেগেছে, বিশেষ করে সাকিব আল হাসান যখন ব্যাটিং করছিলেন!

দীপা: আমারও খুব ভালো লেগেছে; কিন্তু যখন আমাদের উইকেট পড়ে যাচ্ছিল তখন খুব খারাপ লাগছিল।

খুশি আপা: তোমরা সবাই কোন দল সমর্থন করেছ?

সবাই চিৎকার করে বলল, বাংলাদেশ!!

খুশি আপা: হুম! অস্ট্রেলিয়া দল তো খুব ভালো খেলেছে, তবু তোমরা সবাই বাংলাদেশ দলকে সমর্থন করেছ?

সবাই সমস্বরে বললো হ্যাঁ, কারণ বাংলাদেশ আমাদের দল।

খুশি আপা: কেন তোমাদের এমন মনে হয়?

সৃজন: খেলোয়াড়েরা আমাদের মতোই একই রকম দেখতে। আমরা সবাই বাংলা ভাষা বলতে, বুঝতে ও লিখতে পারি, বাংলায় ভাব প্রকাশ করতে পারি এবং তাদের চেহারা ও আকারও আমাদের মতোই।

মামুন ও নাজিফা যোগ করল,

ওরা ভালো খেললে আমাদের ভালো লাগে। আমরা আরও জোরে সমর্থন দেই। খেলোয়াড়েরা তাতে আরও উৎসাহ পান।

গণেশ ও শামীমা বলল,

খেলোয়াড়দের জার্সি বাংলাদেশের পতাকার রঙে রাঙানো। বাংলাদেশকে তা প্রতিনিধিনিত্ব করে। ঐ জার্সি দেখলে আমাদের গর্ব হয়। মনে হয় আমরাই খেলছি।

ফ্রান্সিস মনে করিয়ে দিল,

যখন খেলার শুরুতে বাংলাদেশের পতাকা মেলে ধরা হলো আর জাতীয় সংগীত বাজতে শুরু করল, তখন খেলোয়াড়েরা সবাই দাঁড়িয়ে জাতীয় সঙ্গীত গাইতে শুরু করলেন, আমরাও দাঁড়িয়ে গেলাম, সবাই দাঁড়িয়ে গেল। যেন আমরা সবাই এক!

আনুচিং বলল, একটা ব্যাপার আছে, এই এগারো জন আমাদের সেরা এগারো জন। খেলোয়াড়দের সঙ্গে আমরা এমনই একাত্ম হয়ে যাই যে, তাদের দুঃখ যেন আমাদের দুঃখ। তাদের আনন্দ যেন আমাদের আনন্দ। তারা জিতলে আমরা জিতে যাই। জিতে যায় পুরো বাংলাদেশ।

এবার খুশি আপা প্রশ্ন করলেন, কেন মনে হয়, বাংলাদেশের খেলোয়াড় ও দর্শক আলাদা নয়?

রহিমা বলল, তারা বাংলাদেশের সব মানুষকে প্রতিনিধিত্ব করেন, সব অঞ্চলকে প্রতিনিধিত্ব করেন। মাশরাফি নড়াইলের, তামিম চট্টগ্রামের, মুস্তাফিজ সাতক্ষীরার, লিটন দিনাজপুরের। প্রতিটি বিভাগের মানুষ এই দলের

মিল-অমিলের খেলা

খুশি আপা: বই থেকে বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের সদস্যদের ছবি দেখিয়ে খেলোয়াড়দের সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। শিক্ষার্থীরা দলে বসে আলোচনার মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করছে কেন তারা বাংলাদেশ দলকে সমর্থন করছে।

নিসর্গ বলল: বাংলাদেশ তো আমাদের দল। ক্রিকেটাররা আমাদের দেশের জন্য খেলছেন।

আয়েশা বলল: আমরা দেখতে একই রকম। অস্ট্রেলিয়া দলের খেলোয়াড়েরা আমাদের থেকে বেশ আলাদা।

আদনান বলল, তোমরা দেখেছ খেলার শুরুতে আমাদের জাতীয় সংগীত বাজানো হয়েছিল, যেমন আমরা স্কুলের শুরুতে প্রতিদিন জাতীয় সংগীত গাই। যখন আমি জাতীয় সংগীত শুনি, তখন আমার ভীষণ ভালো লাগে।

দীপা বললো, আমরা সবাই বাংলাদেশী। আমি মনে করি এ কারণে আমাদের খেলোয়াড়েরা জিতলে আমাদের ভালো লাগে।

ওরা সবাই তখন গোল হয়ে বসে বই থেকে সাকিব, তামিম, মুশফিক, মাশরাফিদের ছবি দেখে ও আলোচনা করে মিলগুলো খুঁজে বের করতে থাকে। কথা বলতে বলতে তারা সবাই মিলগুলো খাতায় নেয় লিখে।

বাংলাদেশ জাতীয় পুরুষ ক্রিকেট দলের খেলোয়াড়দের সঙ্গে আমাদের মিল-অমিলের ছক:

১	
২	
৩	
৪	

দেখা গেল, ক্লাসের সবাই বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের সঙ্গে কোনো না কোনো মিল খুঁজে পেয়েছে। কেউ বলেছে ভাষার কথা, কেউ বলছে জাতীয়তা ও দেশের কথা, কেউ হয়তো ভৌগোলিক পরিচয়ের কথা, আবার কেউ লিখেছে খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-আশাক ও সংস্কৃতির কথা।

চলো ওদের মতো আমরাও বাংলাদেশ জাতীয় পুরুষ ক্রিকেট দলের খেলোয়াড়দের সঙ্গে আমাদের যেসব মিল খুঁজে পাওয়া যায় সেগুলো এখানে লিখি:

মিল-অমিলের কার্ড

খুশি আপা সবার খুঁজে পাওয়া মিলগুলো শুনে শুনে বোর্ডে লিখবেন। এরপর তিনি সবাইকে পোস্টার পেপারে লেখা মিল-অমিলের একটি তালিকা দেখালেন। সবাই খুব মনোযোগ দিয়ে দেখে এবং পোস্টার পেপারে লেখা কোন কোন উপাদানের সঙ্গে আমাদের মিল আছে তা বলে। সে অনুযায়ী খুশি আপা পোস্টার পেপারে টিক বা ক্রস চিহ্ন দেন। শেষ হলে দেখা গেল, আসলেই বাংলাদেশ জাতীয় দলের ক্রিকেটারদের সঙ্গে আমাদের অনেক মিল রয়েছে। এ কারণে আমরা তাদের সঙ্গে একাত্মবোধ করি।

সামাজিক পরিচয়ের তালিকা

বিষয়	বাংলাদেশ	অস্ট্রেলিয়া
জাতীয়তা		
সংস্কৃতি		
ভাষা		
ভৌগোলিক পরিচয়		
আর্থ-সামাজিক পরিচয়		
খাদ্যাভ্যাস		
নৃগোষ্ঠী		
জাতীয় সংগীত		
জাতীয় পতাকা		
জাতীয় প্রতীক		
ধর্মীয় ও অন্যান্য আধ্যাত্মিক বিশ্বাস		

মেয়েদের ফুটবল

পরদিন ক্লাসে এসে খুশি আপা জানতে চাইলেন, তোমরা কি ফুটবল খেলা পছন্দ করো?

ফাতেমা, দীপা, নিসর্গ, হারুন, বুশরা সবাই সমস্বরে বলে উঠল, হ্যাঁ, ফুটবল আমাদের খুব ভালো লাগে।

খুশি আপা বললেন, আজ আমরা সবাই ক্লাসে ফুটবল খেলা নিয়ে কথা বলব। সবাই খুশিতে হাততালি দিল।

খুশি আপা সবাইকে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব নারী ফুটবল দলের সঙ্গে ভারত দলের ম্যাচ রিপোর্ট পড়তে দিলেন। ক্লাসের সবাই ৫/৬ জনের দলে বসে ম্যাচ রিপোর্ট পড়তে লাগল এবং বাংলাদেশের মেয়েরা লড়াই করে কীভাবে জিতেছে তা জেনে উল্লসিত হলো।

ভারতকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশের মেয়েরা

বুধবার (২২ ডিসেম্বর): কমলাপুর বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ সিপাহী মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল স্টেডিয়ামে সাফ অনূর্ধ্ব-১৯ মহিলা চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ভারতকে হারিয়ে শিরোপা ধরে রাখলো বাংলাদেশ। খেলার শুরু থেকেই আক্রমণ করে আসছিল বাংলাদেশ। বাংলাদেশ পুরো ম্যাচে আধিপত্য বিস্তার করে খেলেছে। তবে বাংলাদেশ ম্যাচের ১৬ মিনিটেই লিড পেতে পারত। ভারতের গোলরক্ষক ভুল করে বল গ্রিপে নিতে পারেননি। তহুরার নেওয়া শট ভারতের গোলরক্ষক গোল লাইনে সেভ করে। বাংলাদেশের ফুটবলারদের দাবি ছিল বল লাইন ক্রস করেছে। রেফারি অবশ্য তার অবস্থানে অনড় থাকেন। রিপ্লেতে অবশ্য দেখা গেছে বল লাইনের ওপর ছিল। তবে ৭৬ মিনিটে বল গোললাইন ক্রস করে জালেও গিয়েছিল কিন্তু সহকারী রেফারি অফসাইডের পতাকা তুললে সেই গোলটিও বাতিল হয়ে যায়।

ফাইনালে ভারতের পাশাপাশি বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ ছিল ক্রসবারও। ২৫ মিনিটে বাংলাদেশের থ্রো ইন থেকে করা আক্রমণ সাইডপোস্টে লেগে ফেরত আসে। দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম মিনিটে শামসুন্নাহার জুনিয়রের শটও পোস্টে লাগে। তবে প্রথমবারের মতো দেশে অনুষ্ঠিত অনূর্ধ্ব-১৯ মহিলা চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে বাংলাদেশকে খালি হাতে ফিরতে হয়নি।

ভারতীয় মেয়েদের কাছ থেকে বারবার বল কেড়ে নিলেও শেষ পর্যন্ত গোলের দেখা মিলছিল না বাংলাদেশের। শেষ পর্যন্ত ৭৯ মিনিটে আনাই মগিনি এগিয়ে দেন বাংলাদেশকে। রিপা ব্যাকহিল পাস করেন। আনাই মগিনি বক্সের বাইরে থেকে শট নেন। ভারতের গোলরক্ষক বলের ফ্লাইট বুঝতে পারেননি। তিনি বলে হাত লাগালেও গোল লাইন অতিক্রম করা থেকে বিরত রাখতে পারেননি। সঙ্গে সঙ্গেই উল্লাসে মেতে ওঠে পুরো কমলাপুর স্টেডিয়াম। শেষ পর্যন্ত এই এক গোলই বাংলাদেশের শিরোপা নির্ধারণ করে দেয়।

রিপোর্ট পড়ে সবাই খুব উত্তেজিত হয়ে খুশি আপাকে জানাল যে, তারা খেলাটা ভিডিওতে দেখতে চায়! খুশি আপা হেসে বললেন যে, খুবই ভালো প্রস্তাব! কিন্তু আমাদের তো সময় কম। আমরা পুরো খেলাটা সবাই একসঙ্গে ক্লাসে দেখতে পাবো না। তবে খেলার গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো আমরা ভিডিওতে সবাই একসঙ্গে শ্রেণিকক্ষে দেখতে পারি। এরপর তারা তুমুল উত্তেজনার সঙ্গে সাফ অনূর্ধ্ব-১৯ মহিলা চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২১ এর ফাইনালে বাংলাদেশ বনাম ভারত ম্যাচটি উপভোগ করল।

ফুটবল খেলা নিয়ে মিল-অমিলের খেলা

খুশি আপা বললেন, এবার চলো আমরা কিছু প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করি। বাংলাদেশের মেয়েদের কেন সবাই সমর্থন করছি তা বোঝার জন্য দলে আলোচনা করব।

প্রশ্ন:
১. আমরা কোন দল সমর্থন করেছি?
২. আমাদের দল কোনটি?
৩. আমরা কেন এই দলকে সমর্থন করেছি?

ক্লাসের সবাই ফুটবলার মেয়েদের সঙ্গে নিজেদের মিলে যাওয়া বৈশিষ্ট্য নিয়ে কথা বলছিল, যেভাবে জাতীয় দলের ক্রিকেটারদের সঙ্গে মিলগুলো তারা খুঁজে বের করেছিল। তবে দেখা গেল, তারা ফুটবলার মেয়েদের সঙ্গে বেশ কিছু অমিলও খুঁজে পাচ্ছে।

চলো ওদের মতো আমরাও উপরে দেওয়া ছকের প্রশ্ন তিনটির উত্তর খোঁজার চেষ্টা করি!

আমরা আলাদা হলেও একই

খুশি আপা তখন সবাইকে বই থেকে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব ১৯ জাতীয় নারী ফুটবল দলের মেয়েদের ছবি দেখালেন। সবাই মারিয়া, আনাই, ঋতুপর্ণা, তহুরা, আঁখিসহ সবার সাথে পরিচিত হলো।

বাংলাদেশ অনূর্ধ ১৯ নারী ফুটবল দল

বাংলাদেশ দল: রুপনা চাকমা, মারিয়া মান্দা (অধিনায়ক), শামসুন্নাহার সিনিয়র, আনাই মগিনি, আঁখি খাতুন, মনিকা চাকমা, তহুরা খাতুন, ঋতুপর্ণা চাকমা, নীলুফার ইয়াসমিন, শাহেদা আক্তার, শামসুন্নাহার জুনিয়র।

সাফ অ-১৯ মহিলা চ্যাম্পিয়নশীপ ২০২১
চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ অ-১৯ মহিলা জাতীয় ফুটবল দলের নামের তালিকা

রূপনা চাকমা
গোলকিপার
রাঙ্গামাটি

ইয়াসমিন আক্তার
গোলকিপার
কুষ্টিয়া

ইতি রানী
গোলকিপার
মাগুরা

আঁখি খাতুন
ডিফেন্ডার
সিরাজগঞ্জ

শামসুন্নাহার
ডিফেন্ডার
ময়মনসিংহ

আনাই মগিনী
ডিফেন্ডার
খাগড়াছড়ি

নাসরিন আক্তার
ডিফেন্ডার
ঢাকা

নিলুফা ইয়াসমিন নিলা
ডিফেন্ডার
কুষ্টিয়া

আফঈদা খন্দকার
ডিফেন্ডার
সাতক্ষীরা

উন্নতি খাতুন
ডিফেন্ডার
ঝিনাইদহ

কোহাতি কিসকু
ডিফেন্ডার
ঠাকুরগাঁও

মারিয়া মান্দা
মিডফিল্ডার
ময়মনসিংহ

মনিকা চাকমা
মিডফিল্ডার
খাগড়াছড়ি

সোহাগী কিসকু
মিডফিল্ডার
ঠাকুরগাঁও

শাহেদা আক্তার রিপা
মিডফিল্ডার
কক্সবাজার

ঋতুপর্ণা চাকমা
মিডফিল্ডার
রাঙ্গামাটি

মার্জিয়া
ফরওয়ার্ড
ময়মনসিংহ

স্বপ্না রানী
ফরওয়ার্ড
ঠাকুরগাঁও

তহুরা খাতুন
ফরওয়ার্ড
ময়মনসিংহ

আনুচিং মগিনী
ফরওয়ার্ড
খাগড়াছড়ি

মোসাঃ হালিমা
আক্তার
ফরওয়ার্ড
ময়মনসিংহ

শামসুন্নাহার
ফরওয়ার্ড
ময়মনসিংহ

রেহেনা আক্তার
ফরওয়ার্ড
ঝালকাঠি

খুশি আপা শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করলেন ফুটবলার মেয়েদের সঙ্গে আমাদের সবার মিল ও অমিলগুলো খুঁজে বের করতে। সবাই দলে বসে খুব উৎসাহ নিয়ে ফুটবলার মেয়েদের পরিচয় পড়ে ও ছবি দেখে।

নাজিফা: চলো বন্ধুরা, ফুটবলার মেয়েদের সঙ্গে আমাদের কী কী মিল, অমিল আছে তা খুঁজে বের করি।

নিসর্গ: হ্যাঁ, চলো আমরা একসঙ্গে খুঁজি। কাজের সুবিধার্থে চলো আমরা একটা মিল-অমিল ছক বানাই।

সবাই খুব খুশি হয়ে রাজি হলো এবং কী ধরনের মিল-অমিল তা বোঝার জন্য একটা ছক বানিয়ে ফেলল।

ছক: মিল-অমিলের ছক

বিষয়/বৈশিষ্ট্য	কী ধরনের মিল	কী ধরনের অমিল
জাতীয়তা		
সংস্কৃতি		
ভাষা		
ভৌগোলিক পরিচয়		
লৈঙ্গিক পরিচয়		
জেন্ডার		
আর্থ-সামাজিক পরিচয়		
খাদ্যাভাস		
নৃগোষ্ঠী		
বর্ণ		
জাতীয় সংগীত		
জাতীয় পতাকা		
জাতীয় প্রতীক		

কাজ শেষে প্রতিটি দল ছকে লেখা মিল-অমিলগুলো অন্য সবার সামনে উপস্থাপন করছে। খুশি আপা সবার কাজের প্রশংসা করলেন এবং প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক দিলেন। ক্লাসের অন্যরাও নিজেদের কাজে ফিডব্যাক দিল।

নিসর্গ: আচ্ছা বন্ধুরা তোমাদের কি মনে হচ্ছে না, মেয়ে ফুটবলারদের সঙ্গে আমাদের বেশ কিছু অমিল আছে? কিছু অমিল থাকার পরও আমরা তাদের কেন সমর্থন করছি?

মাহবুব: হ্যাঁ, কিছু মিল আছে, কিছু অমিলও আছে। তবু আমরা বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলের সঙ্গে একাত্মবোধ করছি।

দীপা: আমার মনে হয়, ভৌগোলিক পরিচয়, ভাষা, লিঙ্গ, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, খাদ্যাভ্যাস, জাতিসত্তা ইত্যাদি উপাদান এই 'আমরা বোধ' তৈরিতে কাজ করছে। ভারত দলের সঙ্গে আমাদের এসব বৈশিষ্ট্যের মিল নেই বলে তাদের সঙ্গে আমরা একাত্মবোধ করছি না। আর এটাই আমাদের সামাজিক পরিচয়।

খুশি আপা: আমিও তোমাদের সঙ্গে একমত। কিছু কিছু অমিল থাকা সত্ত্বেও আমাদের বৃহত্তর স্বার্থ, দেশ, ভূখণ্ড, রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিচয় একই হওয়ার কারণে আমরা ফুটবলার মেয়েদের সঙ্গে 'আমরা' বোধ করছি।

চলো ওদের মতো আমরাও উপরের মিল-অমিলের ছক অনুযায়ী কাজ করি

সামাজিক পরিচয়ের নানা উপাদান

খুশি আপা বললেন, সামাজিক পরিচয়ের উপাদানগুলো কেমন করে তৈরি হয় এবং কীভাবে কাজ করে, চলো আজ আমরা সেটা নিয়ে অনুসন্ধান করি।

এরপরে আপা বললেন, গত কয়েক দিনে আমরা ভিন্ন ভিন্ন মানুষরা কীভাবে 'আমরা' হই তা নিয়ে অনেক কাজ করেছি। এভাবে নিজেদের সামাজিক পরিচয়ের বিভিন্ন উপাদান খুঁজে পেয়েছি। চলো আজ আমরা সামাজিক পরিচয়ের উপাদানগুলো কাগজে লিখে ক্লাসরুমের বিভিন্ন জায়গায় টাঙ্গাই।

নাজিফা, টুকটুক, রাজীব, দীপা, নিসর্গ, জামাল, হাচ্চা, আনুচিং সবাই কাজে লেগে পড়ল। প্রত্যেকেই সাদা কাগজে এক একটি উপাদানের নাম লিখছিল। নাজিফা লিখল ভাষা, নিসর্গ লিখল দেশ, জামাল লিখল জাতীয়তা, টুকটুক লিখল খাদ্যাভ্যাস এবং হাচ্চা লিখল নৃগোষ্ঠী। সবাই মিলে মজা করে ক্লাসরুমের বিভিন্ন স্থানে কাগজগুলো লাগিয়ে দিল।

আমার সামাজিক পরিচয়

খুশি আপা: এখন আমরা 'সামাজিক পরিচয়ের রেলগাড়ি' খেলা খেলব। আর ঐ যে দেয়ালে কতকগুলো বিষয়ের নাম লিখে কাগজ লাগিয়ে দিলে ওগুলো হলো বিভিন্ন স্টেশন। কী বলো তোমরা?

সবাই একসঙ্গে উল্লসিত হয়ে বলল, হ্যাঁ আপা, আমরা খেলতে চাই।

সবাই ক্লাসের দেয়ালের পাশ দিয়ে একজনের ঘাড়ে অন্যজন হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। খুশি আপা ক্লাসের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বললেন, এবার রেলগাড়ি চলতে শুরু করবে। তার আগে তোমাদের জন্য একটি প্রশ্ন।

খুশি আপা: মনে করো, এশিয়া একাদশ আর অবশিষ্ট বিশ্ব একাদশের মধ্যে ক্রিকেট খেলা হচ্ছে। তুমি কোন দলকে সমর্থন করবে?

সবাই সমস্বরে বলল, এশিয়া একাদশ।

খুশি আপা: আচ্ছা। এবার বলো তাহলে, এক্ষেত্রে তোমাদের সামাজিক পরিচয়ের কোন উপাদান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে

সবাই একসঙ্গে বলল, 'ভৌগোলিক পরিচয়।'

মিলি: আসলেই 'ভৌগোলিক পরিচয়' আমাদের সামাজিক পরিচয়ের অনেক গুরুত্বপূর্ণ অংশ, আগে এভাবে আমি ভাবিনি।

খুশি আপা: তোমরা ঠিক বলেছ! আমার ছোট্ট বন্ধুরা, এবার তোমাদের রেলগাড়ি চলতে শুরু করো। তারপর রেলগাড়ি বিভিন্ন 'ভৌগোলিক পরিচয়' স্টেশনে থামবে।

সবাই কু ঝিক ঝিক ঝিক... কু ঝিক ঝিক ঝিক....কু ঝিক ঝিক ঝিক বলে চলতে শুরু করল।

কিছুক্ষণ পর রেলগাড়ি প্রথম 'ভৌগোলিক পরিচয়' স্টেশনে থেমে গেল।

খুশি আপা: এবার তোমাদের কাছে জানতে চাই, আমরা যখন পহেলা বৈশাখ, বৈসু, সাংগ্রাই, বিজু (বৈসাবি) উদযাপন করি, তখন সামাজিক পরিচয়ের কোন উপাদান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে?

মুনিয়া: আমার মনে হয়, তখন আমাদের নৃগোষ্ঠী পরিচয় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

রাজীব: আমারও তাই মনে হয় কারণ, আমরা সব ধর্ম, বর্ণের বাংলাদেশের মানুষ একসঙ্গে পহেলা বৈশাখ উদযাপন করি।

খুশি আপা: তোমরা ঠিক ঠিক বলছ। খেলাটা তোমাদের কেমন লাগছে?

সবাই সমস্বরে বলল, খুব ভালো লাগছে আপা। আমরা আরও কিছুক্ষণ খেলতে চাই।

খুশি আপা: ঠিক আছে, চলো আবার শুরু করি।

সবাই আবারও কু ঝিক ঝিক ঝিক... কু ঝিক ঝিক ঝিক....কু ঝিক ঝিক ঝিক বলে চলতে শুরু করল।

কিছুক্ষণ চলার পর খুশি আপা বললেন, রেলগাড়ি এবার 'নৃগোষ্ঠী' স্টেশনে থামবে।

সবাই আবারও একইভাবে স্টেশনে দাঁড়িয়ে পড়ল।

খুশি আপা: পৃথিবীতে নানান ভাষাভাষী মানুষ থাকে। আমরা সবাই জানি ১৯৫২ সালে রাষ্ট্রভাষার জন্য এদেশের মানুষেরা জীবন দিয়েছিল। এখন ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। প্রত্যেকের মাতৃভাষাই সুন্দর এবং মর্যাদাপূর্ণ। এখন বলো তো, যারা বাংলায় কথা বলে তাদের কী বলা হয়?

নাজিফা: আমি বাংলায় কথা বলি, আমি বাঙালি।

আনাই: আমি চাকমা ভাষায় কথা বলি। আমি চাকমা।

হাচ্চা: আমি গারো বা আচিকু ভাষায় কথা বলি, আমি গারো।

খুশি আপা: ভাষা কি তাহলে আমাদের পরিচয় বহন করে?

সবাই একসঙ্গে বলল, হ্যাঁ আপা, ভাষা আমাদের সামাজিক পরিচয়ের খুব গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

খুশি আপা: আমিও তোমাদের সাথে একমত। চলো রেলগাড়ি আবার চলতে শুরু করো।

সবাই সঙ্গে সঙ্গে কু ঝিক ঝিক ঝিক... কু ঝিক ঝিক ঝিক....কু ঝিক ঝিক ঝিক বলে রেলগাড়ি চলতে শুরু করলো। কিছুক্ষণ চলার পর, খুশি আপা বললেন এবার রেলগাড়ি ভাষা স্টেশনে থামবে।

সবাই দাঁড়িয়ে গেল।
খুশি আপা: খুব ভালো। এখন বলো দেখি, যখন আমরা ঈদ, পূজা, বুদ্ধপূর্ণিমা, বড়দিন উদযাপন করি, তখন সামাজিক পরিচয়ের কোন উপাদান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে?
নিসর্গ: আমার মনে হয়, এক্ষেত্রে আমাদের ধর্মীয় পরিচয় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।
হাচ্চা- প্রতিটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে কিছু আচার-রীতিনীতি আছে, যা কেবলমাত্র ওই ধর্মের অনুসারীরাই পালন করেন। তবে উৎসবে অন্য ধর্মের অনুসারীদেরকেও নিমন্ত্রণ করা যায়।
খুশি আপা: তোমাদের সঙ্গে আমিও একমত। চলো, রেলগাড়ি আবার চলতে শুরু করি। রেলগাড়ি এবার 'ধর্ম' স্টেশনে থামবে। সবাই আবার কু ঝিক ঝিক ঝিক... কু ঝিক ঝিক ঝিক....কু ঝিক ঝিক ঝিক বলে চলতে শুরু করল। কিছুক্ষণ পর রেলগাড়ি 'ধর্ম' স্টেশনে দাঁড়িয়ে গেল।
খুশি আপা: মনে করো, তোমাদের কোনো একজন বন্ধু খেলোয়াড় হিসেবে অলিম্পিক গেমসে অংশ নিতে গেল। সেখানে তার কোন পরিচয়টা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হবে?
আদনান: আমার মনে হয় তার জাতীয় পরিচয় ও নাগরিকত্ব এখানে গুরুত্বপূর্ণ হবে। আমরা সবাই বাংলাদেশের মানুষ, এদেশের নাগরিক।
খুশি আপা: সবাই খুব ভালো বলেছ। আমি তোমাদের সবার সাথে একমত।
শেষবারের মতো আবার রেলগাড়ি চলতে শুরু করো এবং এবার রেলগাড়ি 'জাতীয়তা' স্টেশনে থামবে।
কু ঝিক ঝিক ঝিক... কু ঝিক ঝিক ঝিক....কু ঝিক ঝিক ঝিক....
বেশ কিছুক্ষণ পর সবাই থেমে গেল জাতীয়তা' স্টেশনে।
খেলা শেষ করে সবাই যে যার জায়গায় বসে পড়ল।
খুশি আপা: সামাজিক পরিচয়ের সব উপাদানই আমাদের সামাজিক পরিচয় গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ, সেটা নিশ্চয়ই তোমরা সবাই উপলব্ধি করতে পারছ।
রহিমা: জি আপা। আমি বুঝতে পারছি অবস্থা, সময় ও প্রেক্ষাপট বিবেচনায় এক একটি পরিচয় একেক সময় আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।
খুশি আপা: হ্যাঁ,আর ব্যক্তিগত পরিচয়ের ভিত্তিতে আমাদের সামাজিক পরিচয় গড়ে ওঠে।

আমাদের নৃগোষ্ঠীগত পরিচয়

খুশি আপা: আমরা আজ খুব মজার একটা কাজ করব। তার আগে চলো, আমরা সবাই নিচের ছবিগুলো দেখে নেই।

চাকমা

গারো

মারমা

সাঁওতাল

হাজং

মনিপুরী

তঞ্চঙ্গ্যা

বাঙালি

খুশি আপা: ছবিগুলো দেখে তোমাদের কার কী মনে হচ্ছে?

সুমন: এখানে আমাদের দেশের বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর মানুষদের ছবি দেখা যাচ্ছে।

দীপা: হ্যাঁ, আমরা আগের শ্রেণিতে এদের সম্পর্কে জেনেছি।

খুশি আপা: তোমরা ঠিক বলেছ। চলো আজ আমরা বাংলাদেশের বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর মানুষের সংস্কৃতি নিয়ে কাজ করি।

নীলা, ফাতেমা, মাহবুব, নিসর্গ, সুমন ওরা সবাই দলে বসে গেল। ওরা বই থেকে বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মানুষের ছবি নিয়ে তাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো বোঝার চেষ্টা করল। ওরা ঠিক করল, ওরা বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর মানুষের নামের সঙ্গে তাদের বিশেষ সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য সাজিয়ে একটা ছক বানাবে। দলে মিলে ওরা কাজ করল । পরে দলে আলোচনা করে বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর মানুষের মূল সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে একটা ছক বানিয়ে ফেলল। এরপর অনুসন্ধানের ধাপ অনুসরণ করে ওরা আরও তথ্য সংগ্রহ করে ছক পূর্ণ করল।

বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর মানুষের মূল বৈশিষ্ট্য কী কী? চলো মিলিয়ে দেখি:

নৃগোষ্ঠীর নাম	মূল বৈশিষ্ট্য (পোশাক, লিঙ্গ, বাসস্থান, জাতীয়তা, খাদ্যাভ্যাস, বিশেষ দিবস ইত্যাদি

বাড়িতে গিয়ে ওরা প্রাথমিকের পাঠ্যপুস্তক বা ছোট বেলার বই এবং বড়দের সাহায্যে ইন্টারনেট থেকে বিভিন্ন নৃগোষ্ঠী সম্পর্কে আরও তথ্য সংগ্রহ করল। ওরা দলেও আলোচনা করল, এভাবে ওরা ছকটি পূর্ণ করল।

বইয়ের বন্ধুদের মতো চলো আমরাও উপরের ছকটি ব্যবহার করে বাংলাদেশের বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর মানুষদের মূল সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলো মিলেয়ে দেখি

অনুসন্ধানী কাজের দলীয় উপস্থাপন

ভিন্নি নৃগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য নিয়ে করা অনুসন্ধানী কাজ উপস্থাপন করার জন্যে ওরা ক্লাসের বিভিন্ন জায়গায় তাদের পোস্টার পেপারে ছক তৈরি করে টাঙিয়ে দিল। কেউ আবার উপস্থাপনে পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড ব্যবহার করল, কেউ কাগজে লিখে নিজের কাজ উপস্থাপন করল। সবাই সবার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনল এবং মতামত দিল।

খুশি আপা: বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর মানুষদের নিয়ে কাজ করে তোমরা কী কী জানলে?

সুজন: বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে পোশাক-আশাক, ঘরবাড়ি, খাবার ও খাদ্যাভ্যাসসহ বিভিন্ন বিষয়ে অর্থাৎ জীবনযাপন প্রণালিতে বেশ পার্থক্য আছে।

দীপা: আমার মনে হয়,আমাদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ের সঙ্গে আমাদের পোশাক, খাদ্যাভ্যাস, আচার-আচরণসহ জীবনাচরণের অনেক মিল আছে।

খাদিজা: হ্যাঁ, অনেক বৈশিষ্ট্যে আমরা একই আবার অনেক বৈশিষ্ট্যে আমরা আলাদা। তবে সবার জীবন-যাপনের প্রণালিই খুব সুন্দর। কারণ, এগুলো বৈচিত্র্যময়।

ক্লাসের সবাই একসঙ্গে বলল, আমরা মিলির সাথে একমত।

আমরা একই কেন?

খুশি আপা: তোমাদের কি জানতে ইচ্ছে হয়, আমরা যারা দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের মানুষ, বিশেষ করে বাংলাদেশি তারা একই রকম কেমন করে হলাম!

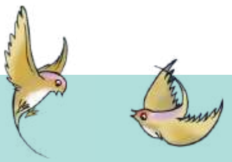

খাদিজা: তাইতো। এটা তো ভেবে দেখিনি।

মাহবুব: হ্যাঁ, যারা অন্য মহাদেশের তারা তো দেখতে আমাদের থেকে বেশ আলাদা।

নিসর্গ: আমি শুনেছি, আমাদের আদি পুরুষেরা নাকি বানর ছিল।

খুশি আপা হেসে বললেন: তাই নাকি! অনেকেই মনে করে, বানর আমাদের পূর্বপুরুষ। কিন্তু তথ্যটা সঠিক নয়। বানর আমাদের পূর্বপুরুষ নয়।

খুশি আপা: চলো আমরা মানুষ কোথা থেকে এলো সেসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য অনুসন্ধান করি। শুরুতে চলো সবাই লুসির সাথে পরিচিত হই—তার গল্পটা পড়ি।

ক্লাসের সবাই দলে বসে বই থেকে এপ জাতীয় প্রাণীর এ পর্যন্ত সবচেয়ে প্রাচীন পূর্ব পুরুষ লুসির গল্প পড়তে শুরু করল।

লুসি

আফ্রিকা মহাদেশের একটি দেশের নাম ইথিওপিয়া। তরুণ গবেষক ডোনাল্ড জোহানসন ১৯৭৪ সালের ২৪শে নভেম্বর ইথিওপিয়ার হাডর এলাকায় অনেক পুরোনো একটি ফসিল কঙ্কালের গুরুত্বপূর্ণ অংশ খুঁজে পান। পরে গবেষণায় জানা যায়, এটি মানুষের পূর্বসূরি হোমিনিড গোত্রীয়। তার মাথায় মগজ ছিল কম, শরীরের কাঠামোও ছোট ছিল। তবে পায়ের হাড় প্রায় মানুষের মতোই। দুই পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াতে পারাসহ হাঁটতে পারাও ছিল তার আয়ত্তে। খাদ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ছিল পাতা, ফল, বীজ, শিকড়, বাদাম ও পোকামাকড়। তার আক্কেল দাঁত থেকে বোঝা যায়, এই কঙ্কাল প্রাপ্তবয়স্কের ছিল। আনুমানিক ২১ বছর বয়সে তার মৃত্যু হয়। সম্ভবত কম ওজনের কারণেই তার মৃত্যু হয়। নৃবিজ্ঞানীরা কঙ্কাল গবেষণা করে জেনেছেন, এই কঙ্কাল একজন নারীর। এই ফসিল কঙ্কালের বয়স প্রায় ৩.২ মিলিয়ন (৩২ লক্ষ) বছর। যখন এই খননকাজ চলছিল, তখন সারা দিন সেই সময়ের জনপ্রিয় গান 'লুসি ইন দ্য স্কাই উইথ ডায়মন্ডস' বাজানো হতো। সেখান থেকেই হোমিনিড নারী কঙ্কালের নাম দেওয়া হলো 'লুসি'।

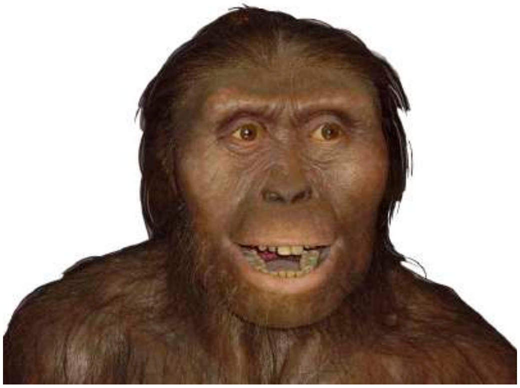

লুসি

খুঁজে দেখি মানুষের বিবর্তনের ইতিহাস

খুশি আপা: চলো আমরা খুঁজে দেখি মানুষ কোথা থেকে এলো! শুরু থেকেই মানুষ একই রকম থাকেনি। বিবর্তনের মাধ্যমে মানুষের বর্তমান রূপে আসা। বিবর্তন হলোই বা কীভাবে?

শিক্ষার্থীরা ৫-৬ জনের দলে মানুষ কোথা থেকে এলো এবং তাদের পরিবর্তনগুলো কীভাবে এলো তা বোঝার জন্য অনুসন্ধান করবে। প্রথমে তারা অনুসন্ধানের পরিকল্পনা করে নিল। কীভাবে তারা তাদের অ্যাসাইনমেন্ট উপস্থাপন করবে আলোচনার মাধ্যমে তা-ও ঠিক করে নিল।

অ্যাসাইনমেন্ট: মানুষ কোথা থেকে এল?

দলের নাম:		
দলের সদস্যদের নাম		
১.	২.	৩.
৪.	৫.	৬.
১. অনুসন্ধানের জন্য প্রশ্ন		
২. মূল বিষয়		
৩. উৎস বা কোথা থেকে উত্তর খুঁজে পাওয়া যাবে		

এই অনুসন্ধানের জন্য ক্লাসের সবাই **‘বিজ্ঞানের চোখ দিয়ে চারপাশ দেখি’** অধ্যায়ে শেখা অনুসন্ধানের ধাপ অনুসরণ করে অ্যাসাইনমেন্ট করার চেষ্টা করল।

খুশি আপা: ছোট্ট বন্ধুরা তোমরা তোমাদের **ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান (অনুসন্ধানী পাঠ) বই** থেকে দ্বিতীয় অধ্যায়ের **মানুষ ও সমাজ কোথা থেকে এলো** বের করো এবং বিভিন্ন সময়ের মানুষের ছবি দেখো।

সবাই দলে বসে বই থেকে বিভিন্ন সময়ের মানুষের ছবি দেখতে লাগল এবং সময়ের সঙ্গে মানুষের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো কীভাবে পরিবর্তন হয়েছে তা বোঝার চেষ্টা করলো।

বাড়িতে তারা বড়দের সহায়তায় ইন্টারনেট ব্যবহার করে আরও তথ্য ও ছবি জোগাড় করল। এভাবে তারা বিভিন্ন সময়ের মানুষের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো অনুসন্ধান করে তাদের একটি ফ্লো ছক তৈরি করে ফেলল।

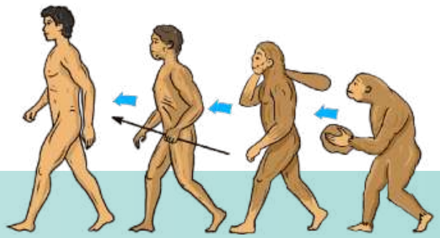

বিভিন্ন সময়ের মানুষ

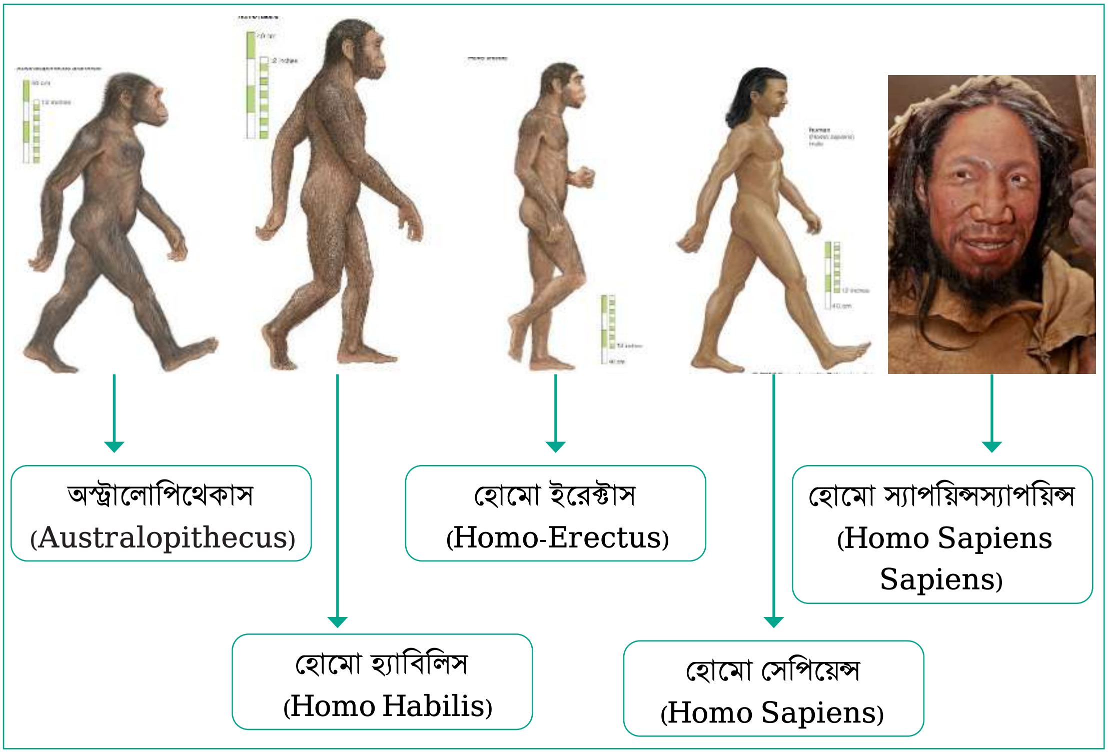

পরেরদিন ক্লাসে সবার সঙ্গে তাদের তৈরি করা মানুষের বিবর্তনের ফ্লো ছক শেয়ার করার জন্য ক্লাসের বিভিন্ন জায়গায় সেগুলো টাঙালো। তারপর একে একে সব দল তাদের অ্যাসাইনমেন্ট উপস্থাপন করল। সবাই সবার কাজ মনোযোগ দিয়ে শুনল।

খুশি আপা এবং ক্লাসের সবাই নিজেদের কাজ এবং পরিকল্পনার প্রশংসা করল। তারপর বিভিন্ন ক্ষেত্রে আরও যেসব উন্নয়ন দরকার খুশি আপা প্রত্যেক দলকে তার স্পষ্ট নির্দেশনা দিলেন। শিক্ষার্থীরা উন্নয়নের দিকগুলো নিয়ে কাজ করে তাদের অ্যাসাইনমেন্ট চূড়ান্ত করে জমা দিল।

সবার কাজ জমা নেয়া হয়ে গেলে খুশি আপা বললেন, কারো কিছু বলার বা জানার আছে? নন্দিনী হাত তুলে বললো, আমি খুবই অবাক হয়েছি এটা জেনে যে, প্রাচীন কালেও মানুষ পৃথিবীর এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় অভিবাসন করেছে। সহায়ক বইতে **মানুষ ও সমাজ কোথা থেকে এলো** অংশে এরকম মানচিত্রও আছে যেখানে প্রাচীন মানুষেরা কোথা থেকে কোথায় গেছে তা দেখানো হয়েছে। এই মানচিত্র দেখে আমার জানতে ইচ্ছে হচ্ছে এরকম মানচিত্র কীভাবে তৈরি করা যায়?

খুশি আপা বললেন, খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছো তুমি। তাহলে চলো আগামী কাল এ বিষয়ে কাজ করব।

রাস্তা চেনায় মানচিত্র

ক্লাসের বন্ধু রবি কয়েক দিন আগে একা একটি অচেনা জায়গায় বেড়াতে গিয়ে রাস্তা হারিয়ে ফেলেছিল। মূল রাস্তা কোথায় জিজ্ঞাসা করায়, একজন বলল সোজা উত্তর দিকে যেতে। কিন্তু আকাশে মেঘ, বৃষ্টি হবে হবে অবস্থা, রবি দিক ঠিক করতে পারছে না। উত্তর দিক ভেবে চলতে চলতে দেখে সে চলে এসেছে একটা নদীর ধারে তারপর অনেক কষ্টে আরও কয়েকজনকে জিজ্ঞাসা করে অবশেষে সে সঠিক রাস্তা খুঁজে পায়।

ক্লাসে ফিরে রবি এসব কথা সবাইকে বলতেই, খুশি আপা বললেন, আচ্ছা বলতো রবির কাছে কোন জিনিসটি থাকলে সে খুব সহজেই পথ চিনে বাড়ি চলে আসতে পারতো?

সাকিব: রবির কাছে যদি ঐ এলাকার পথের একটা মানচিত্র থাকত তাহলে ও বুঝতে পারত কোন পথটা কোন দিকে গেছে।

মিলি: আমার বাবা যখন কোথাও অচেনা জায়গায় যান তখন তিনি তার মোবাইল ফোনে গুগল ম্যাপ দেখে দেখে রাস্তা চেনেন।

খুশি আপা: বাহ্ তোমরা তো অনেক কিছু জানো দেখছি। আচ্ছা, রবির কাছে যদি মানচিত্র না থেকে ওখানকার একটা ছবি থাকত, তাহলে ও কি পথ চিনতে পারত?

শিহাব: না আপা ছবি দেখে তো বোঝা যায় না কোন দিকে যেতে হবে!

খুশি আপা: ও আচ্ছা তাহলে তো মানচিত্রে অনেক কিছু থাকে। আচ্ছা চলো তাহলে কিছু ছবি দেখি-

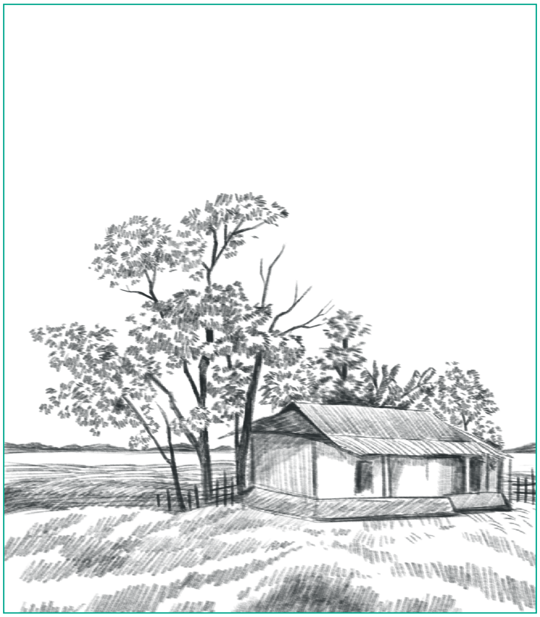

প্রথম ছবি

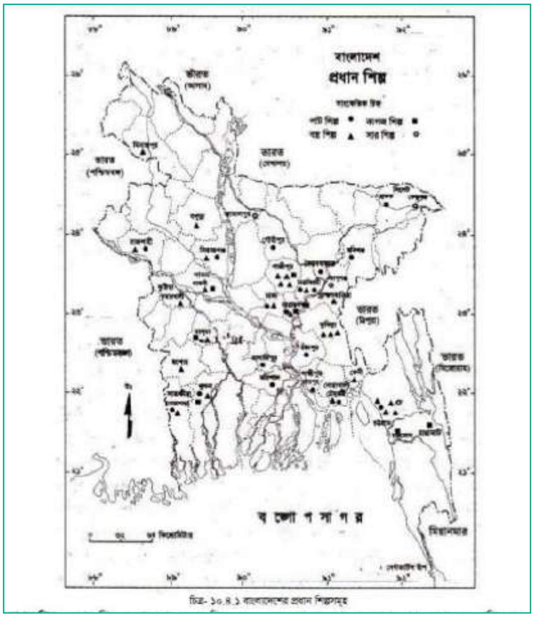

দ্বিতীয় ছবি

প্রশ্ন:

- ১ম ও ২য় ছবি তে কি দেখা যাচ্ছে?
- ছবি দুটির মধ্যে কী কী পার্থক্য দেখা যাচ্ছে?

ওরা তখন দলে ভাগ হয়ে প্রশ্নের উত্তরগুলো খুঁজতে চেষ্টা করল-

১ম ছবির উপাদান	২য় ছবির উপাদান
হাতে আঁকা বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দৃশ্য	বাংলাদেশের মানচিত্র
গাছপালা, নদী, ...	স্কেল, দিক, ...

চলো ওদের মতো করে আমরাও ছবি দুটির উপাদানগুলো খুঁজে বের করি

মানচিত্র স্কেল

সানি: আপা, ছবির সঙ্গে মানচিত্রের পার্থক্য খুঁজতে গিয়ে পেলাম মানচিত্রে স্কেল লাগে। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, স্কেল কেন লাগবে? আমরা ইচ্ছেমতো মাপে কেন তা আঁকতে পারব না।

খুশি আপা: চলো তাহলে আমরা একটা গল্প পড়ে আসি। খুঁজে দেখি গল্পে রাজা কী সমস্যায় পড়েছে?

রাজার আস্তাবল

অনেক আগে এক ঘোড়াপ্রেমী রাজকন্যা ছিল। রাজা ঠিক করলেন, তার একমাত্র কন্যার জন্মদিনে তাকে একটা সুন্দর ঘোড়া উপহার দিয়ে চমক দেবেন। রাজা ঘোড়া কিনে আনার জন্য লোক পাঠালেন। লোকটি ঘোড়া আনলে রাজা সেটা জন্মদিন পর্যন্ত লুকিয়ে রাখতে বললেন। কিন্তু ঘোড়া রাখার জন্য তো একটা আস্তাবল চাই, তাই রাজা ঠিক করলেন তিনি নিজেই মাপ নিয়ে ছুতার ডেকে আস্তাবল বানাবেন যাতে বেশি জানাজানি না হয়।

রাজা আড়াআড়ি আর লম্বালম্বি হেঁটে দেখলেন লম্বায় ২০ পা, পাশে ১০ পা হলে ঘোড়াটার জন্য উপযুক্ত আস্তাবল হবে। তখন তিনি ছুতারকে ডেকে আস্তাবল বানাতে বললেন যেটি ২০ ধাপ লম্বা এবং ১০ ধাপ চওড়া।

জন্মদিনে রাজকন্যা ঘোড়া উপহার পেয়ে বেজায় খুশি। যখন সে ঘোড়া রাখতে আস্তাবলে গেল তখন দেখে, ওমা, একি! আস্তাবল তো খুব ছোট! রাজা

বিরক্ত হয়ে ছুতারকে ডেকে পাঠালেন, জিজ্ঞেস করলেন এমন হলো কেন? ছুতার কিছুই বুঝতে পারছে না, সে বলল রাজা মশাই আমি ঠিক ২০ পা লম্বা ও ১০ পা চওড়া আস্তাবলই বানিয়েছি। রাজা তখন ছুতারের পায়ের দিকে তাকিয়ে বিষয়টা বুঝতে পারলেন। রাজার পায়ের তুলনায় ছুতারের পা খুব ছোট, মানুষও খাট। আর তাই ছুতারের পায়ের মাপে বানানো আস্তাবল ছোট হয়ে গেছে।

সানি বলল এখন বুঝেছি আপা যদি আমি একটা নির্দিষ্ট মাপ না বলে দিই তাহলে সঠিকভাবে সেটার পরিমাপ বোঝা যাবে না। ফাতেমা বলল হ্যাঁ যেমন সানি যদি বলে ওর বাড়ি স্কুল থেকে ৫০ পা দূরে, তাহলে আমরা কেউ ই-বুঝতে পারব না ৫০ পা কি উত্তরে না দক্ষিণে নাকি অন্য কোনো দিকে। সাকিব বলল, আর ওর পা তো আমার থেকে ছোটো। সবাই হেসে উঠল সাকিবের কথা শুনে।

খুশি আপা বললেন, একদম ঠিক বলেছ তোমরা। এ জন্য মানচিত্রে অনেক জরুরি জিনিস থাকে যা তোমরা আগে বের করেছ। রিমি বলল মানচিত্রের নিচে যে স্কেল আছে ওটা কেন প্রয়োজন আপা? খুশি আপা বললেন, চলো আমরা তোমার এ প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য আমাদের শ্রেণিকক্ষটা মেপে দেখি।

তখন ওরা সবাই দুই দলে ভাগ হয়ে একদল শ্রেণিকক্ষের দৈর্ঘ্য এবং অন্যদল শ্রেণিকক্ষের প্রস্থ স্কেল দিয়ে মেপে নিয়ে এল।

খুশি আপা: চলো এখন সবাই দলে বসে শ্রেণিকক্ষটি খাতায় আঁকি।

রবি: কিন্তু শ্রেণিকক্ষ তো অনেক বড়, এটা কীভাবে মাপ ঠিক রেখে খাতায় আঁকব?

নাজিফা: তাই তো। তাহলে কী করা যায়?

রিমি: আমরা যদি এটিকে একটু ছোটো কল্পনা করে নিই, তাহলে?

শফিক: তাহলে সেই রাজার আস্তাবলের মতো হবে এক এক জনের এক এক কল্পনা!

সাকিব: তাহলে আমরা যদি কল্পনা না করে ধরে নিই, খাতার ১ সেন্টিমিটারের সমান আমাদের কক্ষের ১০০ মিটার! তাহলে?

খুশি আপা: ঠিক তাই। কোনো স্থানের মানচিত্র আঁকার সময় নির্দিষ্ট মাপে ছোট করে আঁকা যায়, তখন শুধু মানচিত্রে স্কেল আকারে পরিমাপটা লিখে দিতে হয়। চলো, আমরা সেভাবেই আমাদের শ্রেণিকক্ষ দলে ভাগ হয়ে খাতায় এঁকে ফেলি।

এখন ওরা দলে ভাগ হয়ে খাতায় শ্রেণিকক্ষের একটি মানচিত্র তৈরি করল।

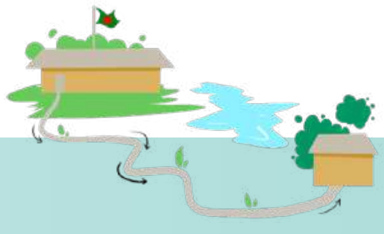

বাড়ির কাজ

সবাই ঠিক করল, তারা সবাই বাড়ি থেকে নিজেদের স্কুলের পথের মানচিত্র এঁকে নিয়ে আসবে। শিমুল বলল তাহলে আমাদের বাড়ি থেকে স্কুল যদি ৭ কিলোমিটার হয় তাহলে আমি যে মানচিত্র আঁকব তার স্কেল আমি ১ সে.মি. = ১ কিলোমিটার ধরব। খুশি আপা বললেন, বেশ বেশ তাহলে আমরা এভাবে সবার বাড়ি থেকে স্কুলে আসার পথের মানচিত্র এঁকে নিয়ে আসব।

চলো আমরাও ওদের মতো করে আমাদের বাড়ি থেকে স্কুলে আসার পথের মানচিত্র এঁকে ফেলি।

বৃহৎ ও ক্ষুদ্র স্কেলের মানচিত্র

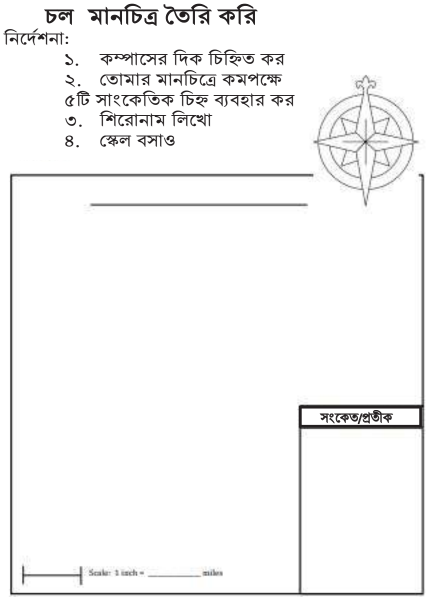

দীপার আঁকা বাড়ি থেকে স্কুলের মানচিত্র

খুশি আপা বললেন, তোমরা সবাই খুব সুন্দরভাবে মানচিত্র তৈরি করতে পেরেছ। এখন চলো আমরা একটা মজার কাজ করি। তোমরা তোমাদের বইয়ে দুটো মানচিত্র দেখতে পাচ্ছ।

রবি বলল হ্যাঁ আপা একটা বাংলাদেশের মানচিত্র আর একটি চট্টগ্রাম বিভাগের মানচিত্র। খুশি আপা বললেন, ঠিক তাই। চলো এখন আমরা দলে ভাগ হয়ে প্রত্যেকে চট্টগ্রামের প্রধান প্রধান ভূমিরূপগুলো কোথায় কোথায় আছে তা খুঁজে বের করি ও তা খাতায় লিখে ফেলি।

ওরা দলে ভাগ হয়ে কাজটি করা শুরু করল।

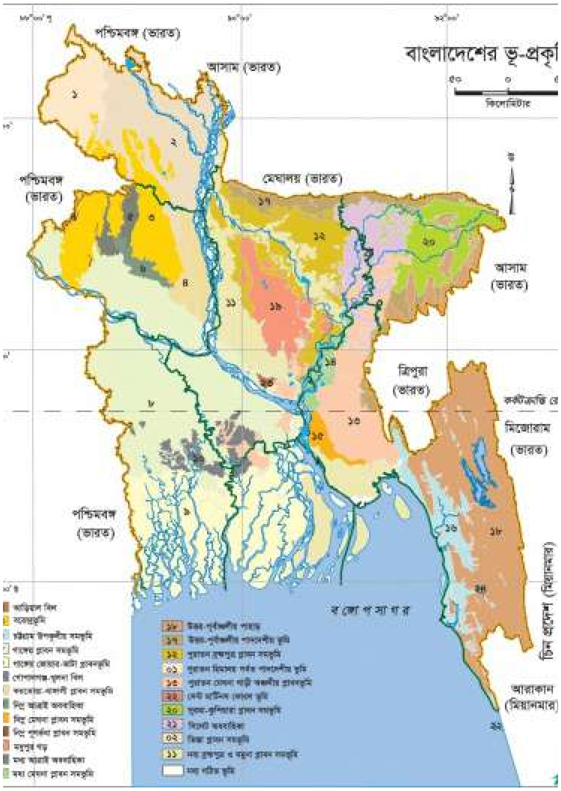

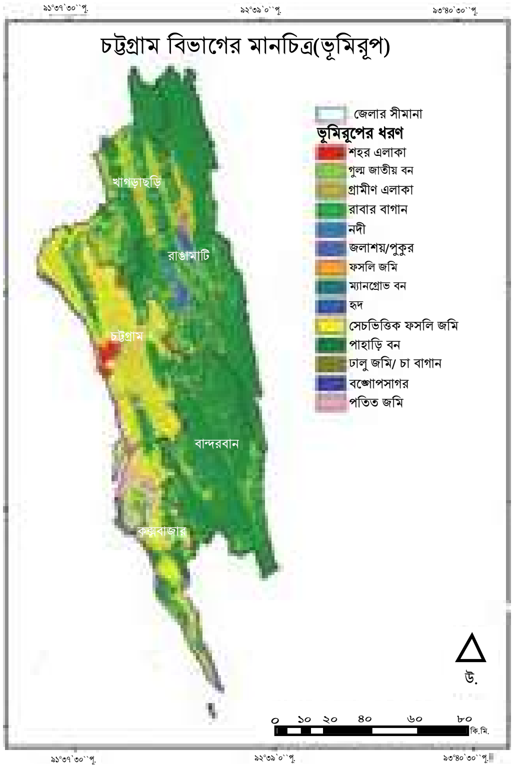

কাজটি শেষ হওয়ার পর ওরা যা যা খুঁজে পেয়েছে তা সবার সামনে সব দল একে একে উপস্থাপন করল।

খুশি আপা বললেন, আচ্ছা, এখন বলো কোন মানচিত্র নিয়ে চট্টগ্রাম বিভাগের ভূমিরূপ খোঁজার কাজটি সহজভাবে করতে পেরেছ? মিলি বলল, আপা যখন বাংলাদেশের মানচিত্র নিয়ে চট্টগ্রাম বিভাগের ভূমিরূপ খোঁজার কাজ করেছি, তখন আমাদের ভূমিরূপগুলো কোথায় কোথায় আছে তা ভালোভাবে বুঝতেই পারছিলাম না। মনে হচ্ছে সব এক জায়গায় হয়ে গেছে।

সাকিব বলল হ্যাঁ আর যখন আমরা চট্টগ্রাম বিভাগের মানচিত্র নিয়ে কাজটি করলাম, তখন অনেক সহজেই তা খুঁজে পেয়েছি। খুশি আপা বললেন, ঠিক তাই। এ জন্য যখন কোনো একটি নির্দিষ্ট এলাকাকে ভালোভাবে দেখতে হয় তখন তাকে একটু বড় করে নিলে কাজটি অনেক সহজ হয়, তাই না? আদনান বলল, যেমন আমরা ছবি বা মোবাইলে লেখা ছোট থাকলে তাকে জুম করে দেখি তাই না আপা? খুশি আপা বললেন তুমি একদম ঠিক বলেছ রনি। এভাবেই আমরা আমাদের প্রয়োজনে মানচিত্রকে ছোট বা বড় করে দেখি। মিলি বলল কী মজা আমরা মানচিত্রকেও জুম করতে পারি! সবাই ওর কথা শুনে হেসে উঠল। গণেশ বলল, কিন্তু আপা আমরা মানচিত্র কীভাবে ব্যবহার করতে পারি? খুশি আপা বললেন, ভালো প্রশ্ন করেছ। আমরা একটা মজার খেলার মাধ্যমে এটা বোঝার চেষ্টা করবো।

খুশি আপা বললেন, আমরা আগামীকাল একটা গুপ্তধন খোঁজার খেলা খেলব। সবাই আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল।

গুপ্তধনের মানচিত্র

পরের দিন ক্লাসে সবাই খুব উত্তেজিত। সাকিব তো রীতিমতো গোয়েন্দা সেজে এসেছে। খুশি আপা ক্লাসে আসতেই মিলি বলল আপা আমরা আজ সবাই গোয়েন্দা। খুশি আপা বললেন, হ্যাঁ তাই তো। আজ আমরা যে গুপ্তধন খোঁজার খেলা খেলব তার জন্য কী কী লাগতে পারে? রনি বলল, সবার আগে লাগবে গুপ্তধন। রুপা বলল, আর অবশ্যই গুপ্তধন যেখানে থাকবে তার একটা মানচিত্র। সাকিব বলল, আর একটা মেধাবী গোয়েন্দা দল । সবাই ওর কথা শুনে হেসে উঠল। খুশি আপা বললেন, আচ্ছা এবারে আমরা আমাদের খেলার নিয়ম সবাই ভালোভাবে শুনে নিই।

১ম ধাপে আমরা চারটা দলে ভাগ হয়ে যাব, আমাদের স্কুলকে চারটি ভাগে করে তার মানচিত্র আঁকব। যেমন একদল শ্রেণিকক্ষ থেকে স্কুলের খেলার মাঠ পর্যন্ত নেবে, ২য় দল মাঠ থেকে লাইব্রেরি পর্যন্ত তার সীমানা ঠিক করবে। এভাবে চারটি পৃথক মানচিত্র আমরা প্রথমে দলে বসে এঁকে নেব।

২য় ধাপে আমি তোমাদের প্রতিটি দলের মানচিত্রে একটা × চিহ্ন দেব যেখানে আমি গুপ্তধন লুকিয়ে রাখব।

৩য় ধাপে তোমরা প্রতিটি দল তাদের মানচিত্রটি অন্য দলের সঙ্গে বদলে নেবে।

৪র্থ ধাপে প্রত্যেক দল যে মানচিত্রটি পেয়েছ সেটি অনুসরণ করে গুপ্তধন খুঁজে বের করবে।

যে দল সবার আগে গুপ্তধন খুঁজে বের করে আনবে সে দল বিজয়ী।
সবাই বলল তারা বুঝতে পেরেছে। তারপর সবাই গুপ্তধন খোঁজার কাজে লেগে পড়ল।

চলো আমরাও ওদের মতো দলে ভাগ হয়ে মানচিত্রের সাহায্যে গুপ্তধন খোঁজার খেলা খেলি।

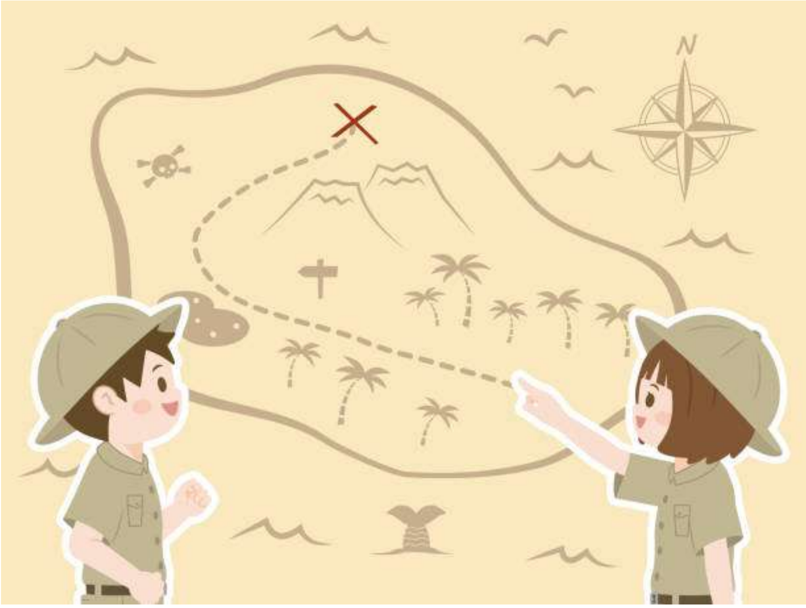

বিশ্বে বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও সম্পর্ক, বৈচিত্র্য

মহাদেশ, মহাসাগর, এশিয়া, দক্ষিণ এশিয়া

আজ খুশি আপা ক্লাসে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে নীলা বলে উঠল, আপা, আমাদের ক্লাসে একজন নতুন বন্ধু এসেছে। ওর নাম জাহাঙ্গীর। খুশি আপা বললেন, তাই নাকি! ও আচ্ছা খুব সুন্দর নাম কনক, তোমরা আগে কোথায় ছিলে? জাহাঙ্গীর বলল আমরা আগে সিলেটে ছিলাম আপা। আমার বাবার চাকরিতে বদলির কারণে আমরা এখানে এসেছি। খুশি আপা তখন সবার উদ্দেশ্যে বললেন, দেখ কনক ওর বাবার চাকরির সুবাদে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় এসেছে। এরকম আর কোন কোন কারণে মানুষ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে পারে বলো তো?

খুশি আপা বলল, তোমরা তো প্রাচীন মানুষ সম্পর্কে জেনেছ তারাও নিজেদের বিভিন্ন প্রয়োজনে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় গিয়েছে। এখন সবাই মিলে ঠিক করল প্রাচীন মানুষ প্রথমে কোথায় ছিল তারপর সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কোথায় কোথায় গেল তা তারা অনুসন্ধান করে বের করবে। তখন তারা অনুসন্ধান প্রক্রিয়ার ধাপ অনুসরণ করে প্রথমে প্রশ্ন বানাল, যা তারা খুঁজে বের করতে চায়।

চলো আমরাও ওদের মতো করে প্রশ্ন বানাই

- প্রথম কোন মহাদেশে বর্তমান মানুষের প্রাচীন সম্প্রদায়কে পাওয়া গেছে?
- তারপর তারা ক্রমান্বয়ে কোন কোন মহাদেশে গেছে?

তখন খুশি আপা তাদের বললেন, তোমরা এই যে প্রশ্নগুলো বের করেছ এর উত্তর কোন জায়গা থেকে পেতে পারো?

রবিন বলল, আপা আমরা কয়েকদিন আগে ‘মানুষ কোথা থেকে এলো’ নিয়ে কাজ করেছিলাম, ওখানে এরকম কিছু তথ্য দেখেছি।

তখন তারা ৫-৬ জনের ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে অনুসন্ধান প্রক্রিয়ার ধাপ অনুসরণ করে প্রশ্ন দুটির উত্তর অনুসন্ধান করে লিখলো ।

খুশি আপা তখন বললেন, এর আগে তো তোমরা নানাভাবে তথ্য উপস্থাপন করেছ। আজ চলো আমরা নতুন একটি উপায়ে তথ্যগুলো উপস্থাপন করি।

শিমুল বলল, আপা যেহেতু সব উত্তরগুলোই এক একটি স্থানের নাম, তাহলে তো আমরা এটা মানচিত্রেও দেখাতে পারি।

খুশি আপা বললেন, শিমুল তুমি ঠিক বলেছ। চলো তাহলে আমরা কাজটি শুরু করি।

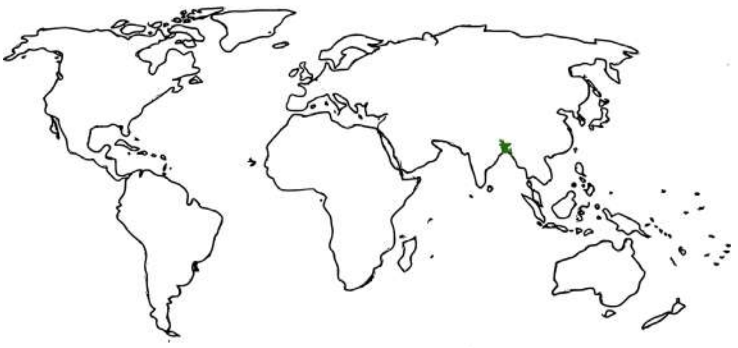

প্রাচীন মানুষের অভিবাসন

চলো আমরাও ওদের মতো করে মানচিত্রে বিভিন্ন রঙের সাহায্যে কাজটি করি।

পারিবারিক পরিভ্রমণ মানচিত্র

মিলি আজ ভীষণ খুশি খুশি মুখ নিয়ে ক্লাসে ঢুকল। ওকে দেখে রবিন বলল, কী রে তোকে আজ এত খুশি খুশি দেখাচ্ছে কেন? আয়েশা বলল, কারণ আমরা বেড়াতে গিয়েছিলাম। রবিন জিজ্ঞাসা করল, তা কোথায় বেড়াতে গিয়েছিলি?

আয়েশা বলল, কক্সবাজারে, কারণ আমার সাগর খুব ভালো লাগে। রবিন বলল তাই? কিন্তু আমার বেশি ভালো লাগে পাহাড়। এমন সময় খুশি আপা ক্লাসে ঢোকার সময় ওদের কথা শুনে বললেন, আমার কিন্তু সাগর, পাহাড়ের সঙ্গে বনও খুব ভালো লাগে। সঙ্গে সঙ্গে অমিত বলল, আপা আমি সুন্দরবন দেখেছি, ওটা খুলনা বিভাগে। আনুচিং বলল, আপা আমার দাদু আগে থাকত বান্দরবানে। আমার ওখানকার পাহাড়, বন, ঝরনা সবকিছু খুব ভালো লাগে।

খুশি আপা তখন বললেন, আমরা তো প্রাচীন মানুষ কোথায় ছিল, কোথায় কোথায় গেছে সে বিষয়ে জানলাম। এখন চলো, আমরা নিজেদের নিয়ে এমন একটি কাজ করি।

সালমা বলল, কিন্তু আপা আমি তো জানি না এর আগে আমরা কোথায় ছিলাম! আপা বলল, ঠিক বলেছ।

তোমরাই বলো, এ কাজে তোমরা কাদের কাছ থেকে সাহায্য নেবে? সবাই বলল, বাড়ির বড়দের।

রফিক বলল, আপা আমরা কোথায় কোথায় যেতে ভালোবাসি, সেটাও কি এখানে আনতে পারব?

আপা বললেন, নিশ্চয়। তোমরা এ কাজটি তোমাদের বইয়ে যে বাংলাদেশের মানচিত্রটি আছে সেখানে করবে। আমরা এ কাজটির কী নাম দিতে পারি? গণেশ বলল, এটি যেহেতু আমাদের প্রত্যেকের পরিবার নিয়ে করতে হবে, তাই এর নাম হোক পারিবারিক পরিভ্রমণ মানচিত্র। সবাই গণেশের মতকে সমর্থন করল।

তখন তারা প্রত্যেকে তাদের নিজ নিজ পারিবারিক পরিভ্রমণ মানচিত্র তৈরি করল।

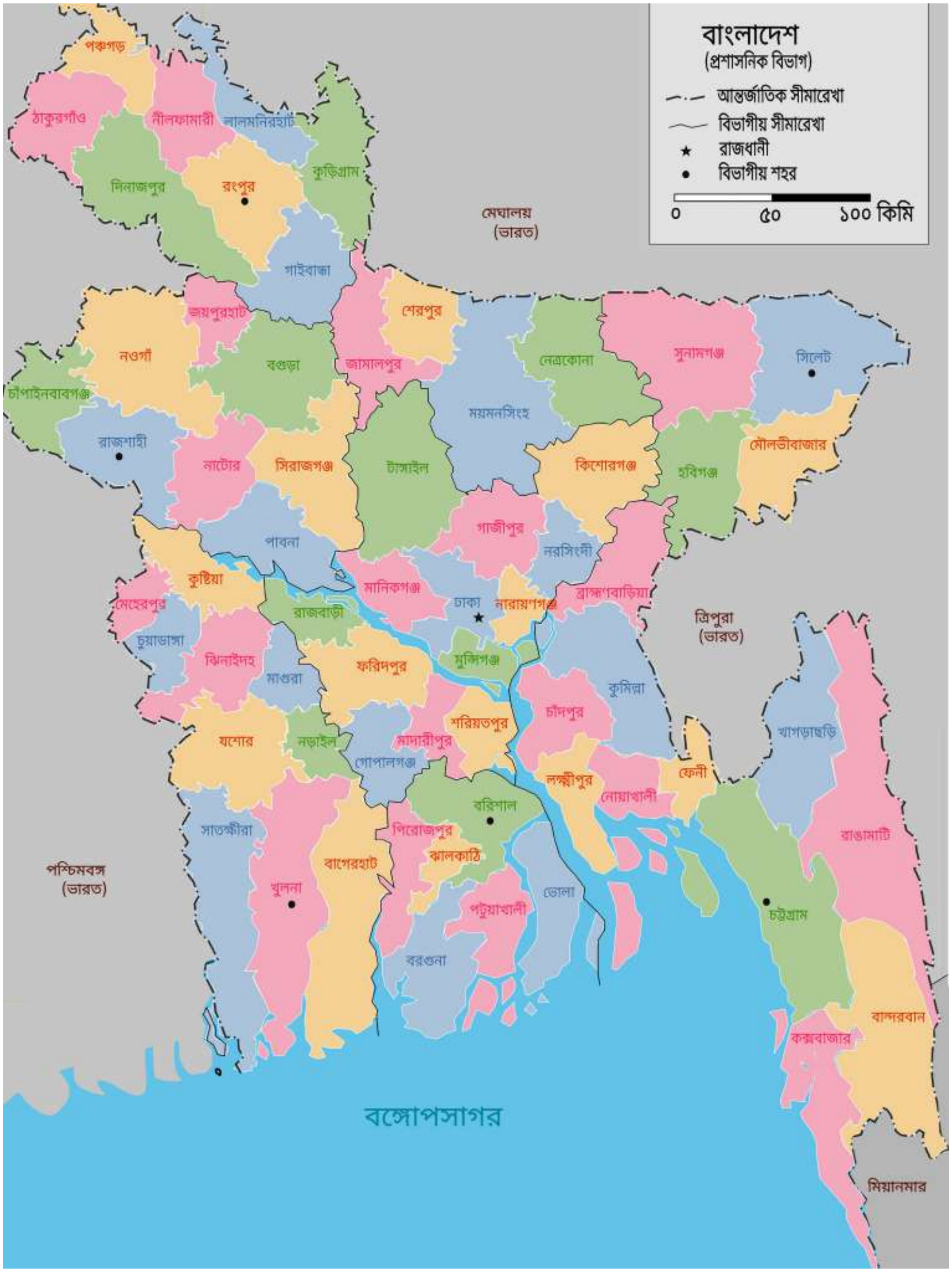

পারিবারিক পরিভ্রমণ মানচিত্র

চলো, ওদের মতো করে আমরাও একটি পারিবারিক পরিভ্রমণ মানচিত্র বানাই।

খুশি আপা আজ ক্লাসে সবার পারিবারিক পরিভ্রমণ মানচিত্র দেখে ভীষণ খুশি হলেন এবং তাদের অভিনন্দন জানালেন। তারপর তাদের বললেন, তোমরা তো এখন জানো যে একজন মানুষের একটি মাত্র পরিচয় থাকে

না। প্রত্যেকেরই অনেকগুলো পরিচয় তৈরি হয়। নিজেদের পরিচয়েরও বৈচিত্র্য তোমরা জেনেছ। বঙ্গবন্ধু, বেগম রোকেয়ার মতো মনীষীদের যে বহু বিচিত্র পরিচয় থাকে, তা-ও জেনেছ। তোমরা এতসব কাজের মাধ্যমে আরও যে পরিচয় সম্পর্কে জানলে তাকে বলে ভৌগোলিক পরিচয়। আপা বোর্ডে ভৌগোলিক পরিচয় কথাটি লিখলেন। মলি বলল, আপা আমরা তো বাংলাদেশের মানচিত্রে কাজটি করেছি, কিন্তু আমরা তো এশিয়া মহাদেশেও বাস করি। খুশি আপা বললেন, তুমি ঠিক বলেছ, চলো আমরা আরেকটি কাজ করি যেখানে তুমি কোন মহাদেশে আছ সেটিও থাকবে।

ওরা তখন বৃত্ত আকারের ছয়টি ছক পেপার নিল। সবচেয়ে বড় বৃত্তে নিজের মহাদেশ এবং ক্রমান্বয়ে নিজের দেশ, বিভাগ, জেলা, এলাকা ও সবচেয়ে ছোট ছক পেপারে নিজের বাড়ির চিহ্ন দেবে।

আমি এখন মানচিত্রে

চলো আমরাও ওদের মতো করে কাজটি করি।

আজ ক্লাসে সবাই খুব খুশি কারণ, খুশি আপা বলেছেন, আজ ক্লাসে মিউজিক্যাল চেয়ার খেলা হবে। আপা ক্লাসে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সবাই একসঙ্গে হইহই করে উঠল।

খুশি আপা: আরে থামো থামো। তোমরা তো আগেই দেখেছ নিয়ম মেনে কোনো খেলা খেললে তা আরও সুন্দর হয় তাই না? তাহলে চলো, আমরা আজকের খেলার কিছু নিয়ম জেনে নিই।

আনুচিং হাত তুলল, তখন খুশি আপা তার কাছে জানতে চাইলেন, আনুচিং তুমি কি কিছু বলতে চাও? আনুচিং বলল, আপা আমরা তো মিউজিক্যাল চেয়ার খেলার নিয়ম জানি। খুশি আপা বললেন, হ্যাঁ তবে আজকের খেলাটা একটু অন্যরকম। রবিন বলল, কিরকম আপা? খুশি আপা তখন বললেন, আজ আমরা

মিউজিক্যাল চেয়ার খেলার নিয়ম মেনেই 'পাস দ্য গ্লোব' খেলব। মোজাম্মেল উৎসাহী হয়ে জিজ্ঞাসা করল সেটি কেমন আপা?

খুশি আপা তখন বললেন, আমরা প্রথমে গোল হয়ে বসব। একজন হাতে একটি গ্লোব নেব তারপর মিউজিক শুরু হবে। আমরা গ্লোবটি দুই হাতে ধরে পাশের জনকে দেব। এরপর যখন মিউজিক বন্ধ হবে, তখন গ্লোবটি যার হাতে থাকবে সে ডান হাতের বুড়ো আঙুলের জায়গাটি চিহ্নিত করবে এবং সেটির নাম ও কোন মহাদেশে অবস্থিত তা বলবে। সেই মহাদেশের একটি উল্লেখযোগ্য ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য লিখবে। এরপর সে খেলা থেকে সরে যাবে। তারপর মিউজিক চালু হলে খেলাটি আবার শুরু হবে। একটা কথা সবাই মনে রাখব, একটি জায়গা শুধু একবারই আমরা নেব, পুনরায় যদি ওই জায়গা আসে, তবে আবার মিউজিক শুরু হবে অর্থাৎ খেলা আবার শুরু হবে।

খেলার ছবি

খুশি আপা তখন বললেন, এবার খেয়াল করে দেখ,তুমি থাক নির্দিষ্ট একটা বাড়িতে- একটা রাস্তা বা গলির পাশে ছোট্ট একটি ঘরে বা উঁচু বাড়ির ফ্ল্যাটে। কিন্তু সেই তোমার যোগ ঘটে যায় গোটা পৃথিবীর সঙ্গে। ব্যাপারটা যেমন মজার, তেমনি গর্বেরও- তাই না।

ভাষা

খুশি আপা বললেন, আজ আমরা ভাষা নিয়ে কুইজ খেলব। দেখি কে সবচেয়ে বেশি সঠিক উত্তর দিতে পারে। ক্লাসের সবাই খুশিতে চিৎকার দিয়ে উঠল, সবাই খুব আগ্রহ নিয়ে কুইজের প্রশ্নের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

খুশি আপা: কুইজের কিছু নিয়ম আছে। চলো আগে নিয়মগুলো বুঝে নিই।

১. প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য হাত উঠাতে হবে। যে আগে হাত উঠাবে সে আগে উত্তর দেয়ার সুযোগ পাবে।

২. প্রথম উত্তরদাতার উত্তর সঠিক না হলে, দ্বিতীয়জন উত্তর দেবে। এভাবে সঠিক উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত আমরা উত্তর শুনে যাব।

৩. কেউ যদি হাত না তুলে বা সুযোগ পাওয়ার আগেই উত্তর বলে বা কথা বলে, তাহলে তার মাইনাস মার্কিং হবে।

৪. যে বা যারা সবচেয়ে বেশি সঠিক উত্তর দেবে, সে বা তারা আজকের কুইজের বিজয়ী হবে।

সবাই বুঝতে পেরেছ?
ক্লাসের সবাই একসঙ্গে বলল তারা বুঝতে পেরেছে।

খুশি আপা: হতভাগা ছেলে! তোকে কখন থেকে বলছি- গরুটা দুইয়ে দিয়ে বাজারে যা। তা ছেলের কথা শোনো, বলে কি না, শীত করছে। ঘাড়টা ধরে নিয়ে আসব।

খুশি আপা: এই কথাটা আমি বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় একবার করে বলব। তারপর জানতে চাইব এটা কোন অঞ্চলের ভাষা? তোমরা যে মনে করো উত্তর জানো, সে হাত উঠাবে। আমি বললে, উত্তর দেবে। চলো শুরু করি।

খুশি আপা: 'পুরা কপাইল্লা পুতাইন রে! তরে কুন বিয়ান কৈচি- গাইডারে ক্ষীরাইয়া বাজার যা। তা পুতাইন কয়, পারতাম না, ডাইয়া ধরচে। ঘাড্ডা ধইরা লৈয়া আইবাম।' বলো কোন অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষা এটা?

সবার আগে দীপা হাত তুলল।

খুশি আপা: দীপা বলো।

দীপা: এটা ময়মনসিংহ অঞ্চলের ভাষা।

খুশি আপা: হ্যাঁ উত্তর ঠিক হয়েছে। দীপা পাচ্ছে ৫ নম্বর।

খুশি আপা: 'ছাইক কপাইলা পোলারে। কি আর কমু? কোন্ হাত হকালে কইচি গরুডারে পানাইয়া বাজারে যা। এমুন পোলার পোলা! তানি কথা হোনে? কয়, হীতে ধরচে। দ্যাক্, ঘাড্ ডা ধইরা লৈয়া আমু।' বলো কোন অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষা এটা?

হাত তুলেছে দীপঙ্কর, নিসর্গ ও সুমি। আগে হাত তোলায় খুশি আপা দীপঙ্করকে সুযোগ দিলেন।

হারুন: এটা রংপুরের ভাষা।

খুশি আপা: উত্তর সঠিক হয়নি। এরপর হাত তুলেছে নিসর্গ। নিসর্গ বলো।

নিসর্গ: এটা ঢাকার ভাষা।

খুশি আপা: সঠিক উত্তর; আর এ জন্য নিসর্গ পাচ্ছে ৫ নম্বর।

খুশি আপা: 'অতভইগ্যা ফোআরে হইলাম যে, গরুয়া দুইয়ারে বাজারত যা। ফোয়া তো হথা উইনতো ন, হওজ্জে আঁআর বশশীত গরের। তার গদ্দানত ধরি লৈ আই।'- বলো দেখি এটি কোন অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষা?

হাত তুলেছে রহিমা ও আনুচিং। আগে হাত তোলায় রহিমা আগে বলার সুযোগ পেল।

রহিমা: এটা চট্টগ্রামের ভাষা।

খুশি আপা: একদম ঠিক। রহিমা পাচ্ছে ৫ নম্বর।

খুশি আপা: ‘পোরাকপাল্যা ছাওয়াল। তোক্ যে বিআনে কচিলাম-গরুডা দোয়ায়া বাজারে যা। তা কুর‌্যার ক্যারা শুনবি ক্যা? কতিচে শীত ধরিচে। ঘার ধর‌্যা নিয়া আসফো নে।’- এবার এটা বলো।

দীপা আর প্রকৃতি হাত তুলেছে। অন্যরাও বলতে চায় কিন্তু নিজে থেকে উত্তর বললে তো মাইনাস মার্কিং হবে। তাই সবাই সুযোগের অপেক্ষা করে। এবার সবার আগে হাত তুলে দীপা সুযোগ পেয়েছে।

দীপা: আপা, এটি পাবনা অঞ্চলের ভাষা। আমার এক আন্টির বাড়ি পাবনা, তাকে আমি এভাবে কথা বলতে শুনেছি।

খুশি আপা: হ্যাঁ, তুমি ঠিক বলেছ দীপা। তুমি পেয়ে গেলে আরও ৫ নম্বর, তাতে তোমার মোট স্কোর হলো ১০।

খুশি আপা: আজকের কুইজের শেষ প্রশ্ন এবার। ‘হতোভাগা ছল! তোরে কহনে আমি কলাম, গোড্ডো দুইয়ে দিয়ে বাজারে যা। তা ছল আমার কথাডা নাহি শুনলো? কচ্চে কিনা তার শীত করতিচে। ঘেটী ধইরে নিয়ে আসবো।’- এটি কোন অঞ্চলের ভাষা বলো দেখি?

হাত তুললো আনুচিং, রাজীব ও সুমি।

আনুচিং: আমার মনে হয়, এটি রাজশাহীর ভাষা।

খুশি আপা: না আরেকটু ভাবতে হবে, আনুচিং। এবার চলো আমরা রাজীবের কাছে শুনি।

রাজীব: আপা, এটা খুলনা অঞ্চলের ভাষা।

খুশি আপা: উত্তর সঠিক হয়েছে। রাজীব পেয়ে যাচ্ছে ৫ নম্বর।

খুশি আপা: তোমরা সবাই অনেক ভালো করেছ। তবে তোমাদের কি মনে হয়, কে বেশি ভালো করেছে?

সবাই বলল, দীপা। কারণ, দীপা দু’টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে ১০ নম্বর পেয়েছে।

সবাই দীপার জন্য হাততালি দিয়ে ওকে শুভেচ্ছা জানাল।

খুশি আপা: খেলাটা তোমাদের কেমন লাগল?

নাজিফা: খুব ভালো লেগেছে। আমরা আজ অনেক অঞ্চলের ভাষা সম্পর্কে জানলাম।

আনুচিং: এই ভাষা আমাদের পরিচয়ের একটি উপাদান। ভাষা শুনে আমরা বুঝি সে কোন অঞ্চলের অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষের পরিচয়ে তার ভাষাও গুরুত্বপূর্ণ।

খুশি আপা: আমিও তোমাদের সাথে একমত। আমরা যদি আরও দূরে যাই মানে দেশের বাইরের কথা ভাবি তাহলে দেখতে পাবো একেক দেশের মানুষ একেক ভাষায় কথা বলে।

দীপা: জি আপা, আমি একবার বাবা-মায়ের সাথে উত্তর ভারতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। তখন দেখেছি ওখানকার মানুষ হিন্দিতে কথা বলে।

রাজীব: আমার বাবা একবার অস্ট্রেলিয়া গিয়েছিলেন কনফারেন্সে। আমি বাবার কাছে শুনেছি, ওখানকার মানুষ ইংরেজিতে কথা বলে।

খুশি আপা: হ্যাঁ, তোমরা ঠিক বলছ। আজ তাহলে তোমরা কী শিখলে?

দীপা: আমরা দেখতে পাচ্ছি, বসবাসের দেশ, জাতীয়তা ও নাগরিকত্বের সঙ্গে ভাষার খুব গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আছে।

খুশি আপা: খুব সুন্দর বলেছ। চলো এবার, সবাই বইয়ের ৩২ পৃষ্ঠা বের করি। তোমরা সবাই কি ‘ভাষা মানচিত্র’ দেখতে পাচ্ছ? সবাই বই খুলে ভাষা মানচিত্র দেখতে লাগল।

ভাষা মানচিত্র

খুশি আপা: তোমাদের সবার কাজ হচ্ছে আগামী ক্লাসে এই মানচিত্র দেখে তোমাদের কার কী মনে হচ্ছে তা লিখে নিয়ে আসবে। এটা তোমাদের জন্য একটি ছোট্ট অ্যাসাইনমেন্ট।

ক্লাসের সবাই পরবর্তী ক্লাসের জন্য তাদের কাজ বুঝে নিল।

ছক: নমুনা অ্যাসাইনমেন্ট ছক

বিষয়: ভাষা মানচিত্র	
১. কী?	
২. কেন?	
৩. মূল বিষয় কী?	
৪. অন্যান্য পর্যবেক্ষণ	

'বিজ্ঞানের চোখে চারপাশ দেখি' পাঠে শেখা ধাপ অনুসরণ করে ক্লাসের সবাই তাদের কাজ/ অ্যাসাইনমেন্ট তৈরি করল।

ভাষা মানচিত্রের দলীয় উপস্থাপন

ক্লাসের সবাই বলল, চলো আমরা সবাই ভাষা মানচিত্র নিয়ে যা যা করলাম এবং যা যা পেলাম সেগুলো উপস্থাপন করি। উপস্থাপনাটি আমরা নানা উপায়ে করতে পারি। কেউ পোস্টার পেপারে, কেউ পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড ব্যবহার করে, কেউ কাগজে লিখে কাজ উপস্থাপন করল। সবাই সবার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনল এবং মতামত দিল।

সময়ের সঙ্গে ভাষার পরিবর্তন

খুশি আপা: সবাই তোমাদের পরিশিষ্ট থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সোনারতরী কবিতাটি বের করে দেখ। পড়া হলে, চলো এবার নিচে সোনারতরী কবিতাটির দু'টি লাইন বিভিন্ন সময়ে লেখা হলে, তার ভাষা কেমন হতো তা দেখি। সবাই আগ্রহ নিয়ে বই খুলে বের করে পড়তে লাগলো।

মূল পঙক্তি- সোনারতরী', ফাল্গুন, ১২৯৮ সালে লেখা—আধুনিক বাংলা (১৮৯২-সম্প্রতিকাল)

গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে,

দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে।

গান গেয়ে নাও বেয়ে কে আসে (=আশে) পারে,

দেখে যেন (=জ্যানো) মনে হয়, চিনি ওকে (=ওকে)।।

মধ্যযুগের বাংলা (আনুমানিক ১৫০০ খ্রিষ্টাব্দে)

গান গায়্যা (গাইহ্যা) নাও বায়্যা (বাইহ্যা) কে আশ্যে (আইশে) পারে!

দেখ্যা (দেইখ্যা) জেন্ অ (জেন্হ, জেহেন) মনে হোএ, চিনি

(চিন্ হীয়ে) ওআরে (ওহারে, ওহাকে) ।।

প্রাচীন বাংলা (আনুমানিক ১১০০ খ্রিষ্টাব্দে)

গান গাহিআ নাব্র বাহিআ কে আইশই (আরিশই) পারহি (পালহি)-

দেখিআ জৈহণ মণে (মণহি) হোই চিন্ হিঅই ওহারহি (ওয়াকহি)।

[সূত্র: বাঙ্গলা ভাষা প্রসঙ্গে-শ্রী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়]

খুশি আপা: আচ্ছা রবীন্দ্রনাথের এই গানের কলি পড়ে তোমাদের কী মনে হচ্ছে?

নাজিফা: আমার মনে হয়, সময়ের সাথে সাথে ভাষা পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে।

রাজীব: কিন্তু এই ভাষার পরিবর্তন কোথা থেকে, কীভাবে হলো?আমার সে বিষয়ে জানতে ইচ্ছে হচ্ছে।

খুশি আপা: চলো, আমরা খুঁজে দেখি 'নিজের ভাষাটা কীভাবে হলো?' এবং 'ভাষা কেন গুরুত্বপূর্ণ?'

ক্লাসের সবাই আগে শেখা অনুসন্ধানের ধাপ অনুসরণ করে নিজের ভাষা কীভাবে হলো এবং ভাষা কেন গুরুত্বপূর্ণ তা খুঁজে দেখতে প্রথমে দলে বসে একটি প্রশ্নমালা তৈরি করে নিল।

নমুনা প্রশ্নমালা:
নিজের ভাষাটা কীভাবে হলো?
ভাষা কেন গুরুত্বপূর্ণ?
ভাষা কি সবসময় একই রকম থাকে?
ভাষা কীভাবে পরিবর্তন হয়?
ভাষা কেন পরিবর্তন হয়?

ভাষার সাথে আমাদের জীবনযাপনের কোনো বিষয়ের কি মিল আছে?
ভাষা কি আমাদের জীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কেন?

তারপর ক্লাসের সবাই **ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান (অনুসন্ধানী পাঠ)** এবং অন্যান্য উৎস যেমন, ইন্টারনেট, অন্যান্য ক্লাসের বই, বড়দের সঙ্গে কথা বলা ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে অ্যাসাইনমেন্ট করল এবং ক্লাসে উপস্থাপন করল।

সংস্কৃতি

খুশি আপা: আমরা সবাই আজ একটা মজার কাজ করব। তোমরা তোমাদের ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান (অনুসন্ধানী পাঠ) বই বের করো।

ক্লাসের সবাই ৫/৬ জনের দলে ভাগ হয়ে রিসোর্স বইয়ের প্রথম অধ্যায় থেকে চতুর্থ অধ্যায় পর্যন্ত পড়বে।

খুশি আপা: তোমরা কেউ কি বলতে পারো সংস্কৃতি শব্দটি দিয়ে আমরা কী বুঝি?

রাজীব: জি আপা, আমরা সংস্কৃতি নিয়ে আগের ক্লাসে জেনেছি। যেভাবে জীবন যাপন করি সেটাই আমাদের সংস্কৃতি।

অন্বেষা: আমাদের ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র, খাদ্যাভ্যাস, বিশ্বাস, রীতিনীতি. মূল্যবোধ, আচার অনুষ্ঠান এসব মিলেই আমাদের সংস্কৃতি।

খুশি আপা: তোমরা খুব সুন্দর বলেছ। তোমরা কি জানো আমাদের জীবনযাপন প্রণালি অর্থাৎ আমাদের সংস্কৃতি সব সময় এক রকম ছিল না। সময়ের সঙ্গে এগুলোর পরিবর্তন হয়েছে।

খুশি আপা: চলো এখন আমরা সবাই বই, ইন্টারনেট ও বিভন্ন উৎস থেকে অনুসন্ধানের মাধ্যমে সময়ের সঙ্গে আমাদের সংস্কৃতি কীভাবে পরিবর্তন হয়েছে এবং হচ্ছে তা বোঝার চেষ্টা করি।

খুশি আপা সবাইকে একটি নমুনা ছক দেখালেন এবং নিজের নিজের খাতায় নিজের মতো করে ছকটি পূরণের চেষ্টা করতে বললেন। খুশি আপা আরও বললেন, তারা চাইলে আরও নতুন নতুন বিষয় ছকে যোগ করতে পারে।

ছক: সংস্কৃতির পরিবর্তন

উপাদান	আগে থেকে ব্যবহার করি	কোন কোন উপাদান নতুন করে যুক্ত হয়েছে
খাদ্য		
বস্ত্র		
বাসস্থান		
পেশা		
যানবাহন		
বিনোদন		
আচার-অনুষ্ঠান		

নিসর্গ: আচ্ছা, তাহলে আমরা সবাই খুঁজে বের করব সংস্কৃতির কোন কোন উপাদান প্রাচীনকালের ধারাবাহিকতায় এখনো একই রকম আছে, তাই তো?

খুশি আপা: ঠিক তাই।

খাদিজা: আমরা আরও দেখব কোন কোন উপাদান নতুন করে যুক্ত হয়েছে?

খুশি আপা: হ্যাঁ একদম ঠিক বলেছ। চলো এবার আমরা কাজ শুরু করি। সবাই প্রাথমিক প্রচেষ্টায় যা করেছে সেটা উপস্থাপন করলো, তারপরভিত্তিতে পাঠ্যপুস্তকসহ এককভাবে বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য নিয়ে ছকটি সম্পূর্ণ পূরণ করে ক্লাসে উপস্থাপন করলো

সবার কাজ উপস্থাপন হলে খুশি আপা এবং অন্যরা মনোযোগ দিয়ে শুনে প্রয়োজনীয় মতামত দিলেন। শেষে খুশি আপা বললেন, এই কাজটা করতে কেমন লাগল তোমাদের?

ক্লাসের সবাই একসঙ্গে বলল, খুব ভালো লেগেছে আমাদের।

খুশি আপা বললেন, তোমরা সবাই সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান এবং সেগুলো কীভাবে সময়ের সঙ্গে পরিবর্তন হয়েছে সে সম্পর্কে নিশ্চয় খুব ভালো ধারণা পেয়েছ?

সবাই জোরে হ্যাঁ বলল।

খুশি আপা: তোমরা কি এ বিষয়ে আরও কিছু কাজ করতে চাও?

সবাই বললো, হ্যাঁ আপা। আমরা করতে চাই।

খুশি আপা: চলো আমরা সবাই মাটি, কাপড়, কাঠি, ডিমের খোসা বা এমন কোনো উপাদান দিয়ে সংস্কৃতির কিছু নিদর্শন বানাই। সবাই খুব উল্লসিত হয়ে কে কি বানাবে তার পরিকল্পনা করতে শুরু করে দিল। সবাই বাড়িতে গিয়ে বড়দের সাহায্য নিয়ে সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান তৈরি করে স্কুলে নিয়ে আসবে।

ছবি: সংস্কৃতির বিভিন্ন নিদর্শন যেমন, মাটির পুতুল, কলসি, ঘরবাড়ি, ডিমের পুতুল, কাপড়ের পুতুল ইত্যাদি

দক্ষিণ এশিয়ার অন্য দেশের সংস্কৃতি

খুশি আপা বললেন, আমরা তো আমাদের দেশের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে পারলাম। তোমরা কি অন্য দেশের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানো? সবাই না বলল। তখন ক্লাসের সবাই মিলে ঠিক করল, তারা দক্ষিণ এশিয়ার অন্য দেশের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানবে।

খুশি আপা বললেন, আমিও তোমাদের সঙ্গে আছি। তাহলে আমাদের এই কাজের নাম কী হতে পারে?

আনাই বলল, 'দক্ষিণ এশিয়ার অন্য দেশের সংস্কৃতি' হলে কেমন হয়?

সবার নামটা পছন্দ হলো। আগে শেখা অনুসন্ধানের ধাপ অনুসরণ করে ওরা দক্ষিণ এশিয়ার অন্য দেশের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানবে, ছবি সংগ্রহ করবে। জানা আছে এমন বিভিন্ন নিদর্শন তৈরি করবে এবং স্কুলে নিয়ে আসবে।

আত্মপরিচয়ের মেলা

সেদিন স্কুলে মেলা। সবাই বেশ অনেক দিন ধরে মেলার প্রস্তুতি নিয়েছে। স্কুল আজ অন্যরকম সাজে সেজেছে। সবাই টেবিল ও ডেস্ক দিয়ে নিজেদের স্টল তৈরি করল।

অন্বেষা, নিসর্গ আর রহিমা সবার আনা কাপড়ের পুতুল, ডিমের পুতুল, মাটির পুতুলসহ সংস্কৃতির নিদর্শনগুলো সাজিয়ে রাখল।

রাজীব, নীলা ও দীপা বিভিন্ন ভাষায় লেখা মা, স্কুল, বাড়ি, দেশ এ শব্দগুলো ক্লাসের বিভিন্ন জায়গায় টাঙিয়ে রাখল।

ক্লাসের সবাই মিলে বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর জীবনযাপন সম্পর্কে আলোচনা করল। ওরা পুতুল, ঘরবাড়ি, পোশাক-আশাক এসব তৈরি করে নিয়ে এসেছে। ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীগুলোর বিশেষ বৈশিষ্ট্য নিয়েও একটা স্টল সাজানো হলো।

কেউ কেউ বাড়ির খাবার এনেছে। আনাই, মাহবুব ও রুপা বিভিন্ন খাবার সাজিয়ে রাখল স্টলে।

একটা স্টল সাজানো হয়েছে দক্ষিণ এশীয় সংস্কৃতির নিদর্শন দিয়ে। যারা পেরেছে তারা এসব দেশের সাংস্কৃতিক নিদর্শন সংগ্রহ করেছে। কেউ কেউ মাটি, কাপড়, কাগজসহ বিভিন্ন উপাদান দিয়ে দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন সাংস্কৃতিক নিদর্শনের মডেল বা নমুনা তৈরি করে এনে স্টলে সাজিয়েছে। সেখানে ভারত, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশের সাংস্কৃতিক নিদর্শন রাখা আছে।

আরেকটা স্টলে রাখা আছে ওদের তৈরি করা মানচিত্র। বাড়িতে তৈরি স্কুলের মানচিত্রগুলো দেখতে খুব সুন্দর লাগছে। সেখানে ওদের তৈরি পারিবারিক পরিভ্রমণ মানচিত্রও সাজানো আছে। তাদের তৈরি আছে 'আমি এখন মানচিত্রে'।
ভাষা স্টলে আমাদের দেশ, দক্ষিণ এশিয়াসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কিছু ভাষার বই, পত্রিকা, বর্ণমালা, গান, কবিতা প্রভৃতি প্রদর্শন করা হয়েছে।

স্কুলের সবাই আজ ওদের মেলায় বেড়াতে এসেছে। সব শিক্ষক, অন্য ক্লাসের বন্ধুরাও এসেছে মেলায়। ক্লাসের সব বন্ধু দায়িত্ব ভাগ করে নিল। ২/৩ জন করে প্রতি স্টলে দাঁড়াল, অন্যরা সবার সঙ্গে মেলায় এক এক করে সব স্টলে ঘুরতে লাগল। মেলা ঘোরা শেষ হলে ওরা স্টলে এসে অন্যদের মেলায় ঘোরার সুযোগ করে দিল।

সারা দিন ওরা মেলায় ঘুরে, বিভিন্ন রকম খাবার খেয়ে, বিভিন্ন সংস্কৃতি ও ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর নানা উপকরণ দেখে, বিভিন্ন ভাষার বর্ণমালা দেখে খুব আনন্দ করে দিন কাটাল। তারপর আত্মপরিচয়ের মেলা থেকে যা শিখেছে তা দলগতভাবে একটি অ্যাসাইমেন্ট করলো।

চলো ওদের মতো আমরাও বিদ্যালয়ের শিক্ষক বা এলাকার বড়দের সহযোগিতা নিয়ে সাংস্কৃতিক উপাদান নিয়ে এলাকায় বা বিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক মেলা আয়োজন করি এবং অ্যাসাইনমেন্ট করে জমা দিই।

প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামো

কাঠামো কী:

আজ খুশি আপা ক্লাসে অনেকগুলো সুন্দর সুন্দর ছবি নিয়ে এসেছেন। এই যে ছবিগুলো:

এখন তো আমরা বড় হয়েছি। খুশি আপা আমাদের শুধু বললেন ‘চল দলে বসে...।’ কথা শেষ হওয়ার আগেই আমরা সবাই দলে ভাগ হয়ে একেক দল কয়েকটি করে ছবি নিয়ে বসে গেলাম। নিচের প্রশ্নগুলো নিয়ে আমরা অনেক চিন্তা করলাম আর উত্তরগুলো লিখলাম:

ক্রম	প্রশ্ন	উত্তর
১	ঘর-বাড়ি/দালান-কোঠাগুলোর আকার/আকৃতি দেখতে কেমন? কোনো নাম আছে কি?	
২	কী দিয়ে তৈরি করা হয়?	
৩	কী কাজে ব্যবহার করা হয়?	
৪	আবহাওয়া/ পরিবেশের সঙ্গে এগুলোর গঠনের কোনো সম্পর্ক আছে কী? থাকলে কী ধরনের সম্পর্ক রয়েছে?	
৫	কী কাজে ব্যবহার করা হয় সে অনুযায়ী ঘর-বাড়ি/দালান-কোঠাগুলোর গঠনে পার্থক্য রয়েছে কি? থাকলে কী ধরনের পার্থক্য রয়েছে?	

প্রতি দল উত্তরগুলো শ্রেণিকক্ষে সবার সামনে উপস্থাপন করল। সবাই সবার উপস্থাপনা দেখার পর নীলা আর ফাতেমা বলল—

নীলা: দেখেছো, প্রতিটা ঘরবাড়ি, দালানকোঠা, স্থপনা, ইত্যাদি সব কিছুরই একটা নির্দিষ্ট গঠন আছে। একে আমরা বলতে পারি কাঠামো (structure)।

ফাতেমা: আরেকটা ব্যাপার দেখেছ? এই কাঠামো কেমন হবে তা অনেক কিছুর উপর নির্ভর করে। যেমন— সেটি কি কাজে ব্যবহার করা হয়? কে বা কারা সেটি ব্যবহার করে? সেটি কোন এলাকায় অবস্থিত? এটি কোন সময়কালের? ইত্যাদি বিষয়ের উপর।

তমাল: আবার সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কাঠামো পরিবর্তিতও হয়-তাই না?

ওরা সবাই একমত হল।

আনাই: আচ্ছা, ঘরবাড়ি, উপাসনালয় ইত্যাদি কাঠামো তো মানুষের তৈরি, এ ছাড়া আশপাশে অন্য কাঠামো আছে না?

ঘণ্টা বেজে গেল, শেষ ক্লাস। খুশি আপা বললেন, বিভিন্ন ধরনের কাঠামো নিয়ে আমরা আরেক দিন আলোচনা করব।

বিভিন্ন ভৌগোলিক অবস্থান এবং তাদের বৈশিষ্ট (পর্বতমালা, মরুভূমি, মালভূমি, মেরু অঞ্চল, তৃণভূমি)

নীলা আজ মাঠে খেলার সময় হোঁচট খেয়ে পায়ে ব্যথা পেয়েছে। তাকে সবাই ক্লাসে এনে বসালো। টিফিনের পরে খুশি আপা ক্লাসে এলে ফ্রান্সিস বললো, আপা নীলা আজ পায়ে ব্যথা পেয়েছে। খুশি আপা বললেন তাই! কিন্তু কিভাবে? নীলু বললো, আপা আমাদের মাঠের একপাশে যে একটা উঁচু টিবির মত আছে সেখানে দৌড়াতে গিয়ে ব্যথা পেয়েছি। খুশি আপা বললেন, আহারে! খেলার সময় অবশ্যই আমরা সাবধানে খেলবো যেন ব্যথা না পাই। লক্ষ্য করলে দেখবে যে আমাদের খেলার মাঠের সব জায়গা কিন্তু সমান নয়, তাই না? গণেশ বললো, হ্যা আপা আমাদের মাঠের দক্ষিণ দিকটায় কিছু কিছু জায়গা একটু উঁচু।খুশি আপা বললেন, ঠিক বলেছ; সেরকম আমাদের চারপাশের প্রাকৃতিক পরিবেশও কিন্তু এক রকম নয়—তাই না? সাকিব বললো, হ্যাঁ আপা, আমার বাড়ির পাশে একটা নদী আছে। এ পর্যায়ে খুশি আপা বললেন চলো তাহলে আমরা কিছু ছবি দেখি।

প্রশ্ন

- এসব ভৌগোলিক অবস্থানের নাম জানো কি?
- এদের মধ্যে কি কোন মিল/ অমিল খুঁজে পাচ্ছ?
- কী কী মিল/অমিল দেখতে পাচ্ছ?
- এ ছাড়াও আর কোনো রকম ভূমিরূপের নাম জানো?

তখন খুশি আপা বললেন আচ্ছা কেমন হবে বলতো যদি আমরা প্রত্যেকে একটি করে এরকম জানা অজানা ভূমিরূপের অভিধান বানাই?

তখন আয়েশা বললো আপা আমরা যে যে ভূমিরূপ সম্পর্কে বেশি কিছু জানিনা সেগুলো যদি ছবি এঁকে নিয়ে গিয়ে কোনো বই/ ইন্টারনেট/ বা বড়দের সাহায্য নিয়ে অভিধান বানাই তবে কেমন হয়?

খুশি আপা বললেন নিশ্চয় তোমরা তা করতে পারো। একাজে তোমরা ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান-অনুসন্ধানী পাঠ বইসহ ইন্টারনেট, অন্যান্য বই এমনকি অন্য শ্রেণির পাঠ্য বইয়েরও সাহায্য নিতে পারো।

রাতুল বললো, আপা আমরা ভবিষ্যতেও যদি এমন কোনো অজানা ভূমিরূপ সম্পর্কে জানতে পারি সেটাও তো এখানে যুক্ত করতে পারি, তাই না?

খুশি আপা বললেন, নিশ্চয়।

চলো আমরা ওদের মতো করে প্রশ্ন গুলোর উত্তর খুঁজে বের করে একটি অভিধান বানাই

তুহিনের করা ভূমিরূপ অভিধান

পাহাড়

৩০০ মিটারের অধিক কিন্তু ১০০০ মিটারের কম উচ্চতা বিশিষ্ট ভূমিগুলোকে পাহাড় বলা হয়।

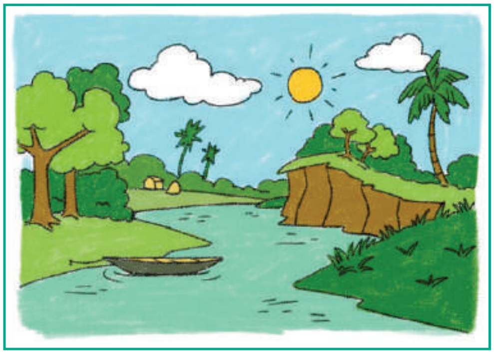

নদী

মিষ্টি জলের একটি প্রাকৃতিক জলধারা যা সাগর, মহাসাগর হ্রদ বা অন্য কোনো নদী বা জলাশয়ে পতিত হয়।

তমাল বললো, আমাদের দেশেও তো এরকম অনেক ধরণের ভুমিরূপ আছে। আমরা তো সেগুলো খুঁজে বের করতে পারি।

খুশি আপা বললেন, ঠিক বলেছ রবিন, চলো আমরা বাংলাদেশের একটা মানচিত্র দেখি।

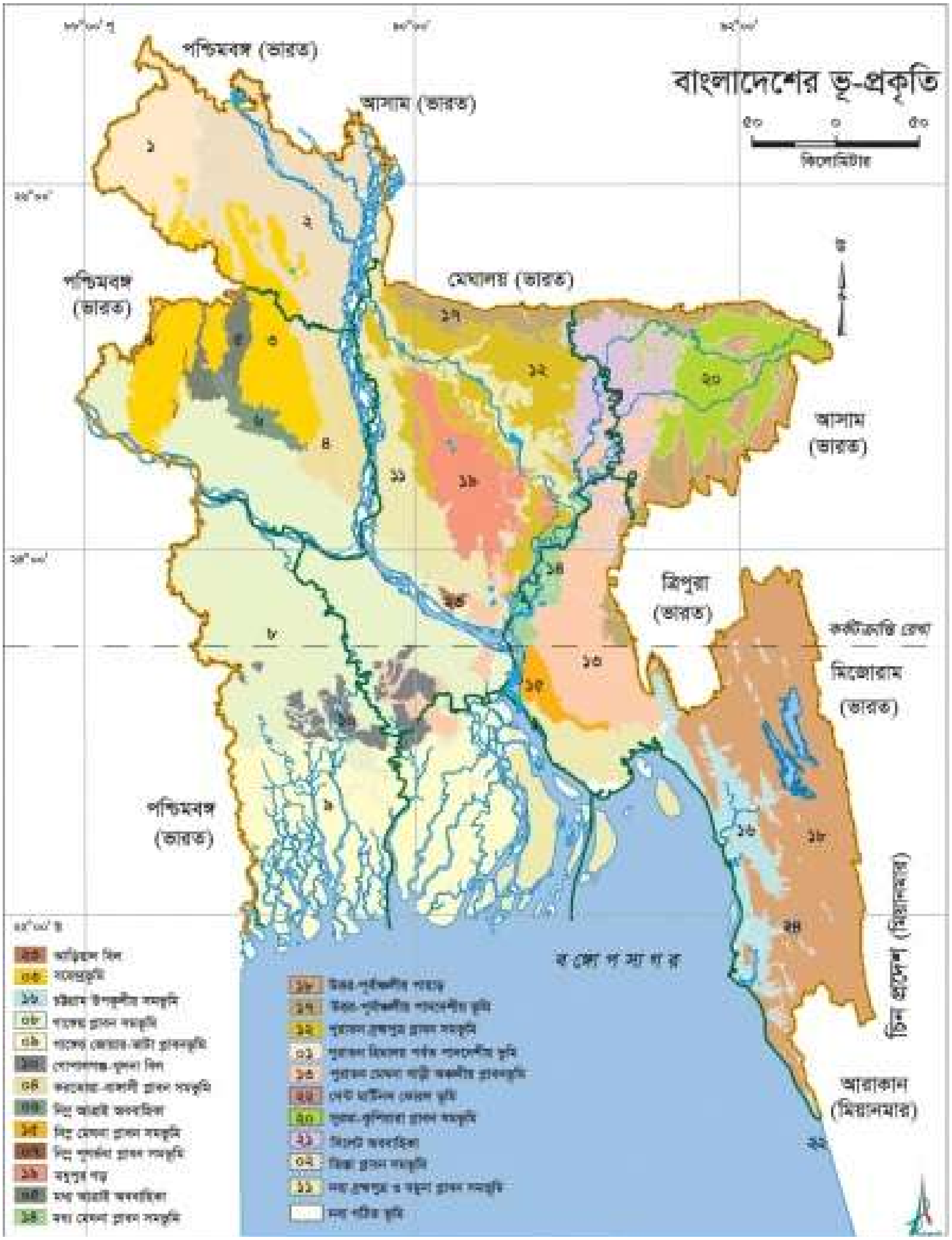

খুশি আপা বললেন,দেখো তোমরা যে যেখানে থাক, যে এলাকায় চলাচল কর তার মধ্যেও বৈচিত্র্যের শেষ নেই। আনুচিং বললো ও থাকে পাহাড়ী এলাকায়, নাজিফদের বাড়ি নদীর পাড়ে। শওকত বললো ও গিয়েছিল মামার বাড়ি সুনামগঞ্জে, সেখানে ও দেখেছে মস্ত বড় হাওড়। বর্ষাকালে সেটা হয়ে উঠেছিল সমুদ্রের মত, তাতে ঢেউও ছিল। ওরা নৌকায় বেড়িয়েছে।কিন্তু সে ওখানে একবার গিয়েছিল শীতকালে, তখন সবটা জুড়ে সবুজ ধানের ক্ষেত। সুবোধ বললো ও বন দেখে এসেছে - ওরা কয়েক পরিবার মিলে সুন্দরবন বেড়াতে গিয়েছিল রুপা বললো ওর দাদার বাড়ি কক্সবাজার যাওয়ার সময় ওরা ডুলাহাজরা বঙ্গবন্ধু সাফারি পার্ক দেখেছ - সেটি অভয়ারণ্য; আবার চুনতি সংরক্ষিত বনও দেখেছে। আর শেষে কক্সবাজারে তো সমুদ্রের সাথেই দেখা - জোয়ারের সময় বড় বড় ঢেউ দেখেছে। এভাবে তারা আলোচনা করে বাংলাদেশের বিশেষ বিশেষ ভূমিরূপের একটি তালিকা বানালো। তালিকা তৈরি হলে তারপর তারা ঠিক করলো এসকল জায়গা বাংলাদেশের মানচিত্রে চিহ্নিত করবে।

আনুচিং বললো আপা আমাদের পাহাড়ী এলাকাগুলো দেখতে তো খুবই সুন্দর কিন্তু শীতকালে পানির খুব কষ্ট, আবার বর্ষাকালে পাহাড়ী ঢল নামে-কি যে সমস্যা তখন! আবার কোনো কোনো সময় তো বেশি বর্ষা হলে পাহাড় ধ্বসও হয়।

খুশি আপা বললেন আনুচিং যেমনটা বলল তেমন অনেক জায়গায়ই বিশেষ বিশেষ প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দেয়। এগুলোর সাথেও কিন্তু ভূমিরূপ জড়িত। তখন নীলু বললো, আপা যেমন নদীর সাথে বন্যা? খুশি আপা বললেন, নীলু তুমি একদম ঠিক বলেছ। চলো আমরা সেগুলোও খুঁজে বের করি।

তখন তারা সবাই দলে বসে এক এক দল একটি করে বিভাগ বেছে নিল। এবারে প্রত্যেক দল একটা করে বিভাগের ভূপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য মানচিত্রে রং এর মাধ্যমে চিহ্নিত করলো এবং সেখানকার প্রধান প্রধান প্রাকৃতিক দুর্যোগ গুলোর তালিকা তৈরি করলো যার সাথে ভূমিরূপেরও সম্পর্ক আছে।

চলো আমরাও ওদের মতো করে ভূমিরূপের মানচিত্র বানাই ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের তালিকা বানাই।

কাজ শেষ হলে তা ওরা সবাই একে একে দলের সবাইকে দেখালো এবং কী কী বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেছে তা বললো। অন্যদের মন্তব্য শুনে ও নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে ওরা তালিকাটা যতটা সম্ভব পরিপূর্ণ করে উপস্থাপন করলো।

খুশি আপা সবার কাজ দেখে তাদের অভিনন্দন জানালেন, এবং বললেন চলো আমরা এখন এমন একটা খেলা খেলবো যার মাধ্যমে এখানে বসেই পৃথিবীর সব মহাদেশের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিরুপ ও স্থান ঘুরে আসা যায়।সবাই আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল।

খুশি আপা তখন একটা ভূমিরুপ লুডো বোর্ড নিয়ে আসলেন। সবাই তো দেখে অবাক, এ আবার কেমন লুডো? আপা বললেন, আমরা তো আগেই দেখেছি নিয়ম মেনে খেললে সব খেলা সুন্দর মতো হয়, তাই না? এ খেলাটিও আমরা কিছু নিয়ম মেনে খেলবো। তোমরা সবাই ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে গোল হয়ে বসে পড়ো।

দলীয় ভাবে লুডো খেলার নিয়ম

- প্রতিটি বোর্ডে দুটো দল খেলতে পারবে। প্রতি দলের একজন ক্যাপ্টেন থাকবে।
- টসের মাধ্যমে নির্ধারণ হবে, কোন দল আগে খেলা শুরু করবে।
- ১ পড়লে বিশ্বভ্রমণের যাত্রা শুরু করতে পারবে, তার আগে নয়। যাত্রা শুরুর স্থান ঢাকা।
- দলের যে কোন একজন খেলা শুরু করবে। কে শুরু করবে তা ক্যাপ্টেন নির্ধারণ করবে।
- খেলা চলাকালীন যে কোন সময় খেলোয়াড় বদল হতে পারবে। তবে একজন বদলি হলে সে পুনরায় আর খেলার সুযোগ পাবে না।
- খেলাটির যেসব নিয়ম বলা আছে সেই অনুসারে খেলতে হবে। (নিয়মাবলি পরিশিষ্ট-২)
- খেলা সঠিক নিয়মে পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা দেখার জন্যে প্রত্যেক বোর্ডের একজন রেফারি নির্ধারণ করতে হবে। রেফারি কে হবে তা দুই দলের ক্যাপ্টেন ঠিক করবে। যে রেফারি হবে সে খেলায় অংশ নিতে পারবে না।
- ১০০ পয়েন্ট এ আছে আন্দামান ও নিকোবর দীপপুঞ্জ এখানে সকল খেলোয়াড়কে পৌঁছাতে হবে। যে দল সর্বপ্রথম ১০০ পয়েন্টে পৌঁছাবে সেই দল জয়ী হবে।

ফাতেমা বললো, আপা আমরা যদি দুই জন মিলে খেলাটি খেলতে চাই তাহলেও তো খেলতে পারবো-তাই না? খুশি আপা বললেন, নিশ্চয় পারবে। পরিশিষ্ট-২ এ দেওয়া লুডোর নমুনা অনুযায়ী আমরা বিশ্ব মানচিত্র সংগ্রহ করে একটি বিশ্বভ্রমণ লুডো বানিয়ে নিতে পারি। এরপর পরিশিষ্ট-৩ তে নিয়মাবলিগুলো দেখে খেলাটি খেলতে পারি। তারপর সবাই লুডোটি বনিয়ে আনন্দঘন পরিবেশের মধ্যে দিয়ে খেলা শেষ করলো।

চলো যাই শিক্ষাভ্রমণ

পরের দিন ক্লাসে নীলা হারুনকে বললো আমাদের বাংলাদেশে তো অনেক ধরণের ভূমিরূপ আছে আমরা তো সেসব জায়গার কোনো একটিতে শিক্ষাভ্রমণে যেতে পারি! মিলি বললো চল তাহলে খুশি আপা ক্লাসে আসলে তাকে এ বিষয়ে বলি। ইতোমধ্যে খুশি আপা ক্লাসে আসলেন। নীলা তখন তাদের মনের ইচ্ছা আপাকে বললো। আপা শুনে বললেন এ তো খুবই ভালো প্রস্তাব। এ তো অনেক বড় আয়োজন। তখন তারা সবাই মিলে আলোচনা করে ঠিক করলো এ আয়োজনে তাদের কার কার সাহায্য লাগবে এবং কি কি আয়োজন করতে হবে।

চলো ওদের মতো করে আমরাও একটা শিক্ষাভ্রমণের আয়োজন করি।

আয়োজন কি সম্পূর্ণ হলো চলো মিলিয়ে দেখি

স্থান নির্বাচন	দিন, তারিখ, সময়	যানবাহন	শিক্ষকমণ্ডলী	খাবার	ফি
১. ২. ৩.			১. ২. ৩.	সকাল: দুপুর: রাত:	

খুশি আপা বললেন, বাহ তোমরা তো বেশ ভালোই আয়োজন করেছ। সালমা বললো, আপা আমরা বিজ্ঞান বিষয়ে পিকনিক আয়োজন করেছিলাম তো আগে। খুশি আপা বললেন, ও আচ্ছা খুব ভালো কিন্তু পিকনিক ও শিক্ষাসফর কি এক?

নাজিফা বললো, না আপা, শিক্ষাসফরে আমরা কোনো জিনিস দেখার মাধ্যমে শিখতে পারি। আরমান বললো আপা আমরা অনেক ধরণের ভূমিরূপ সম্পর্কে ছবি ও নানা মাধ্যমে জেনেছি, এখন যদি সেগুলো সরাসরি দেখি তাহলে আমাদের জানা জিনিসের সাথে সেটা মিলিয়ে দেখতে পারবো। রিপন বললো তাহলে আপা আমরা যা যা দেখবো তার মধ্যে যদি নতুন কোনো কিছু খুঁজে পাই সেটা আমাদের তৈরি ভূমিরূপ অভিধানে লিখতে পারি। সালমা বললো, আমরা তো সফরে গিয়ে অনেক কিছু দেখব, কত নতুন কিছু জানতে পারবো। প্রত্যেকে আমরা একটা করে ভ্রমণ ডায়েরি তৈরি করতে পারি। আর তাতে শিক্ষাসফরে নতুন যত ভূমিরুপ দেখবো তার ছবি তুলে বা একে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা লিখে রাখবো। আর যখন খুশি সেগুলো দেখতে পারো। রনি বললো, বাহ এটাতো খুবই ভালো প্রস্তাব, কারণ আমরা যখন বড় হয়ে যাবো তখন এগুলো দেখে কতই না মজা পাবো! খুশি আপা বললেন, তোমরা খুব ভালো কথা বলেছ। চলো তাহলে আমরা আমাদের শিক্ষাসফরের আয়োজন শুরু করি। সবাই হাততালি দিয়ে কাজ শুরু করলো।

সুমনের বানানো ভ্রমণ ডায়েরি

সালমার ভ্রমণ ডায়েরি

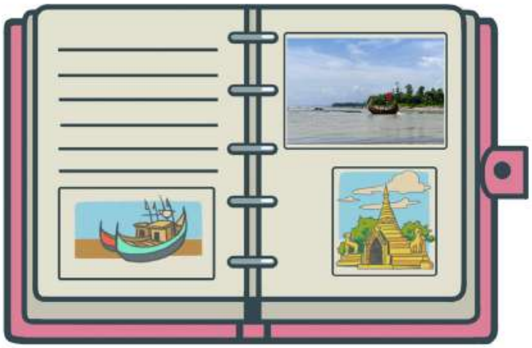

তোমরাও কিন্তু সবাই সফর শেষে ভ্রমণ ডায়েরি
তৈরি করে বন্ধুদের দেখাতে ভুলো না।

সামাজিক কাঠামো

শ্রেণিকক্ষে ঢুকে খুশি আপা বললেন কাঠামো সম্পর্কে তো আমাদের কিছু ধারনা হলো। চলো এবার আমরা সামাজিক কাঠামো নিয়ে কাজ করি। কেমন হয় যদি আমরা একটা গল্প দিয়ে কাজটা শুরু করি।

সবাই খুশি হয়ে উঠলো। খুশি আপা বললেন চলো তাহলে বই থেকে ধর্মগোলার গল্পটি পড়ি। কে শুরু করতে চাও?

মিলি উঠে দাড়ালো এবং পড়তে শুরু করলো।

ধর্মগোলার গল্প

ডেমরা একটা গতানুগতিক গ্রাম। গ্রামের জীবনজীবিকার প্রধান অবলম্বন কৃষি। গ্রামের মানুষ একতাবদ্ধ, সমাজের রীতিনীতি ও নিয়মকানুন এবং পরোপকারের সংস্কৃতি মেনে চলে। যেকোন উৎসব একসাথে উৎযাপন করে। একবার খুব বন্যা হয়। গোটা গ্রাম ডুবে যায়। মানুষ আশ্রয় নেয় স্কুলের পাকা দালানে। খাবারের সমস্যা ছিলো। সরকারি ত্রাণসামগ্রী, এন.জি.ও থেকে প্রাপ্ত রসদ ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সহায়তা পেয়ে গ্রামবাসী বন্যা মোকাবেলা করে। মানুষ নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাওয়ায় ফাঁকা বাড়ি-ঘরে চোরের উপদ্রব বেড়ে যায়। আইন-শৃংখলা রক্ষার জন্য সদর থেকে পুলিশ আসে। বন্যার সময়ে ত্রান বিতরণে ইউনিয়ন পরিষদকে তৎপর দেখা যায়। শিক্ষা বিভাগের তৎপরতায় লেখাপড়ার ক্ষতি খানিকটা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়। আসল সমস্যা শুরু হয় তার পরে। বন্যায় অপুষ্ট ধানসহ সকল ফসল ডুবে গিয়েছিলো। গুদামে থাকা ধানও নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। ফলে আকস্মিকভাবে খাদ্য সংকট দেখা দেয়। গ্রামে ঐতিহ্যবাহী সমাজ টিকে ছিলো। সবাই বিশ্বাস করতো একা একা ভালো থাকা যায় না। সব মানুষের উপকারের জন্য কাজ করতে পারা কে মানুষ গর্বের বিষয় বলে ভাবতো। ভালো কাজ মনে করতো। গ্রামের সব মানুষ আলোচনায় বসলেন। একজন বললেন, দু'একজন ছাড়া আমাদের সবারই খাবার বাড়ন্ত (শেষ হয়ে যাচ্ছে)। একা একা এই সমস্যা মোকাবেলা করা কঠিন হবে। কারণ কারো কাছে চাল আছে, কারো কাছে ডাল, কারো বা আছে সবজি। তাদের কারোর কাছেই খাবার তৈরি করার মতো সব কিছু একসাথে নেই। কিন্তু আমরা প্রত্যেকে সবার চাল, ডাল, সবজি, তেল, লবন ইত্যাদি একসাথে করে রান্না করতে পারি। তারপর প্রত্যেক পরিবারের প্রয়োজন অনুযায়ী বিতরণ করতে পারি, তাহলে আপাতত সমস্যার সমাধান করা যাবে। সবাই হয়ত সমান পরিমাণ খাদ্যপণ্য দিতে পারবেনা, যারা পারবেনা তারা শ্রম দেবে, জ্বালানী সংগ্রহ করবে, রান্নায় সাহায্য করবে বা বিতরণের কাজে লাগবে। সবার অংশগ্রহণটাই আসল কথা। খাদ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রাধান্য পাবে শিশু, সন্তানসম্ভবা নারী, অসুস্থ ও বৃদ্ধ। তারপর অন্যরা। এভাবে সেই সমস্যা বেশ খানিকটা সমাধান করা গিয়েছিলো। তবে এরকম ঘটনা তো আবারও ঘটতে পারে। তখন কী হবে? এজন্য সমাজের সব মানুষ আবার বসলেন একসাথে। তারা ঠিক করলেন, তারা আকালের (দুর্ভিক্ষ/অভাব) সময়ের জন্য ফসলের একটি গোলা তৈরি করবেন। এই গোলার নাম দেয়া হলো ধর্মগোলা। গ্রামে নতুন ধান উঠলে প্রত্যেক পরিবার থেকে একমন ধান/চাল, গম, ডাল, সরিষা বা অন্য কোন খাদ্যশস্য একসাথে করে একটা স্থানে রাখা হবে। আকালের সময় যে যার প্রয়োজনমতো সেখান থেকে ধান/চাল ধার করবে। আকাল পার হয়ে গেলে আবার যে যা নিয়েছিলো তা ফেরৎ দিয়ে দেবে। ফলে ধর্মগোলায় সবসময় সংকটের জন্য ধান/চাল মজুদ থাকবে।

ধান/চাল সংরক্ষনের জন্য গোলাঘর তৈরি করা হয়। সমাজের প্রতিটা পরিবার এই ধর্মগোলা সমিতির সদস্য। একটা পরিচালন কমিটি করা হয়। পুরুষদের পাশাপাশি নারীরাও সমসংখ্যায় এই কমিটির সদস্য হয়। ধান সংগ্রহ, সংরক্ষণ, ধার দেওয়া ও ধার শোধ করার জন্য নানান নিয়মকানুনও তৈরি হয়। এই ব্যবস্থা খুব ভালো কাজ করেছিল। সামাজিক কাঠামোকে কাজে লাগিয়ে কীভাবে সংকট মোকাবেলা করা যায়- এ তারই একটা উদাহরণ। বাংলাদেশের নানান প্রান্তে এই উদ্যোগকে রাইস ব্যাংকও বলা হয়।

এবারে চলো আমরা নিচের ছক ব্যবহার করে ধর্মগোলা গল্পে সমাজের কী কী প্রতিষ্ঠান ও আইন-কানুনের কথা বলা হয়েছে তা খুঁজে বের করি।

ক্রম	কাজ / ভূমিকার নাম	সমাজের প্রতিষ্ঠান বা মূল্যবোধ-রীতিনীতির নাম
১.	গ্রামের মানুষেকে একতাবদ্ধ হতে কী সহায়তা করেছিলো?	সমাজের নিয়ম-কানুন, রীতিনীত, পরোপকারের সংস্কৃতি
২.	বন্যার সময় মানুষ কোথায় আশ্রয় নিয়েছিলো?	
৩.	ত্রাণ সামগ্রী কার কাছ থেকে এসেছিলো?	
৪.	ত্রাণ সামগ্রী কে বিতরণে তৎপর ছিলো?	
৫.	আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার কাজ কে করে?	
৬.	পড়ালেখার ক্ষতি কার তৎপরতায় খানিকটা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়েছিল?	
৭.	গ্রামে কী টিকে ছিল?	
৮.	ধর্মগোলা কারা মিলে তৈরি করেছিলো?	

সবাই উপরের ছকটি ব্যবহার করে গল্পে সমাজের যে সকল প্রতিষ্ঠান ও নিয়ম-কানুন, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের কথা বলা আছে তা চিহ্নিত করলো।

চলো আমরাও ওদের মতো করে উপরের ছকটি ব্যবহার করে ধর্মগোলা গল্পে উল্লিখিত বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ চিহ্নিত করি !

খুশি আপা বললেন, আমরা খুব সুন্দরভাবে গল্পে উল্লিখিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, মূল্যবোধ, সংস্কৃতি ও রীতি-নীতি চিহ্নিত করতে পেরেছি। এবার চলো সমাজ ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জেনে নিই।

সমাজ থেকে সামাজিক কাঠামো

সমাজ কী?

কাদের নিয়ে, কী কী উপাদানে ও কোন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটা সমাজ গড়ে ওঠে?

এইসব প্রশ্নের উত্তর বোঝার জন্য আমাদের আগে সামাজিক কাঠামো সম্পর্কে জানতে হবে । এর মাধ্যমে সমাজ কীভাবে সংগঠিত হয়— তা বুঝতে পারব।

খুশি আপা বললেন, সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে মানুষ একে অপরের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া করে। এইসব প্রতিষ্ঠান এবং সেখানে মানুষে মানুষে মিথস্ক্রিয়ার ধরণকে এক কথায় সামাজিক কাঠামো বলা যায়।

এবার চলো, আমরা 'ধর্মগোলা' গল্পটি থেকে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং মানুষে-মানুষে পারস্পরিক আদান-প্রদান বা মিথস্ক্রিয়ার অংশগুলো খুঁজে বের করি।

প্রথমেই নিসর্গ বলল, ধর্মগোলা গল্পে আমরা সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে অনেকগুলো পরিবারকে দেখতে পাই। বন্যার পরে তারা পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে নিজেদের খাবারের সংকট কাটিয়ে ওঠে। এভাবে তাদের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া ঘটেছিল। অন্বেষা বলল, প্রতিটি পরিবার নিজেদের চাল-ডাল-সবজি-তেল-লবণ, যার কাছে যা ছিল, তা-ই সমাজের সকলের জন্যে এক জায়গায় জড়ো করেছিল। এমনকি যাদের কাছে কোনো খাবার ছিল না, তারাও পরিশ্রম করে সমাজের কল্যাণে ভূমিকা রেখেছিল। এর মাধ্যমে ডেমরা গ্রামে মানুষে মানুষে মিথস্ক্রিয়া ঘটেছে।

গণেশ বলল, গল্পে কেবল পরিবার নয়, আরও কিছু প্রতিষ্ঠান মানুষের উপকারে কাজ করেছে। যেমন: ইউনিয়ন পরিষদ একটি প্রতিষ্ঠান, সে ত্রাণ বিতরণ করেছে। সেই ত্রাণ এসেছে অন্য একটি প্রতিষ্ঠান বা সরকারের কাছ থেকে। মোজাম্মেল বলল, ঠিক তাই। স্কুল, শিক্ষা বিভাগ, পুলিশ— এসব প্রতিষ্ঠানও সমাজের সকলের মঙ্গলের জন্য কাজ করেছে। শিহান বলল, ধর্মগোলার ব্যবস্থাপনার জন্য আবার নতুন একটা সামাজিক প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়েছে—ধর্মগোলা সমিতি। এই প্রতিষ্ঠানও ডেমরা গ্রামের মানুষের মঙ্গলের জন্য কাজ করেছে।

আনাই বলল, এভাবেই ধর্মগোলা গল্পে সমাজের মানুষে-মানুষে, মানুষে-প্রতিষ্ঠানে, প্রতিষ্ঠানে-প্রতিষ্ঠানে পারস্পরিক আদান-প্রদান বা মিথস্ক্রিয়া ঘটেছে।

খুশি আপা ওদের উত্তর শুনে দারুণ খুশি হলেন। বললেন, কী চমৎকার করে বুঝিয়ে বললে! এবার তাহলে বলো তো, ডেমরা গ্রামের মানুষ আর প্রতিষ্ঠানের মধ্যকার এইসব মিথস্ক্রিয়া গড়ে উঠল কীভাবে? কেন তারা পারস্পরিক যোগাযোগ বা মিথস্ক্রিয়া করল?

বুশরা বললো, আমি জানি! নিজেদের মঙ্গল এবং অন্যদের উপকার করার জন্য! তখন খুশি আপা বললেন, নিজেদের মঙ্গল সবাই চায়, কিন্তু কেন ওরা অন্যের উপকার করতে চাইল? নন্দিনী বলল, ডেমরা গ্রামের দু'একটি পরিবারের কাছে ঠিকঠাক খাবার ছিল, কিন্তু বাকি সকলের কাছে সবকিছু ছিল না। অনেকের কাছে কিছুই ছিল না। ওরা দেখল, সকলেরটা মিলিয়ে-মিশিয়ে একসঙ্গে খাওয়ার ব্যবস্থা হলে সকলেরই উপকার হয়। তাই নিজের ভালো করতে গেলে অন্যের ভালোটুকুও দেখতে হবে। আনুচিং বলল, নিজের ভালোর জন্য সবাই অন্যের উপকার করেছে। সালমা বলল, কিন্তু ওই গ্রামের কারোর কারোর কাছে খাবার ছিল, তারা

কেন অন্যের উপকার করল! ফ্রান্সিস বলল, তাই তো! আবার কারোর কাছে কিছুই ছিল না, তাদের জন্যও কেন খাবারের ব্যবস্থা করল? সবাই গভীর চিন্তায় পড়ে গেল। হঠাৎ জাভেদ বলে উঠলো, পেয়েছি! কারণ ওরা বিশ্বাস করত একা একা ভালো থাকা যায় না! এবং ওরা অন্য মানুষের উপকার করতে গর্ব বোধ করত! ভালো কাজ মনে করত। খুশি আপা জানতে চাইলেন, কেন ওরা অন্যের উপকার করাকে ভালো কাজ বলে মনে করত বলে মনে হয়? মিলি বলল, নিশ্চয়ই ওরা অনেকদিনের অভিজ্ঞতায় দেখেছে, সমাজে কেউই সবকিছু একা করতে পারে না। তাই সকলে মিলেমিশে ভালো থাকতে পারলেই সমাজের মঙ্গল হয়, সকলের কল্যাণ হয়।

খুশি আপা বললেন, দারুন! ঠিক তাই! আর এই যে মানুষের নানারকম বিশ্বাস; কোন কাজটা ভালো আর কোন কাজটা মন্দ—এইসব ধারণাগুলো সমাজে মানুষের আচরণ কেমন হবে তা ঠিক করে দেয়। অধিকাংশ মানুষই সমাজের কাছে 'ভালো' হিসেবে পরিচিত হতে চায়। তাই তারা সমাজ যে কাজগুলোকে ভালো বলে মনে করে, সেগুলো করার চেষ্টা করে। এই সব বিশ্বাস এবং ভালো-মন্দের বোধকে আমরা মূল্যবোধ বলে জানি। আবার সমাজে এমন কিছু নিয়ম আছে যেগুলো মানুষ বহু বছর ধরে পালন করে আসছে। সমাজের সংস্কৃতির অংশ হিসেবে মানুষ সাধারণত কোন রকম প্রশ্ন ছাড়াই এ সকল নিয়ম পালন করে; সেসবকে আমরা রীতি-নীতি বলে জানি। যেমন: শিক্ষক ক্লাসে এলে উঠে দাঁড়ানো, কারোর সঙ্গে দেখা হলে কুশল বিনিময় করা, অতিথিকে আপ্যায়ন করা।

'ধর্মগোলা' গল্পে যেমন দেখেছি, শিশু, সন্তানসম্ভবা নারী, অসুস্থ এবং বৃদ্ধদের আগে খাবার দেওয়া হয়েছিল। আবার সমাজের প্রত্যেকটা পরিবার ছিল ধর্মগোলা সমিতির সদস্য। পরিচালনা কমিটিতে পুরুষদের পাশাপাশি নারীরাও সমান সংখ্যায় কমিটির সদস্য হয়েছিল। এই বিষয়গুলো প্রচলিত মূল্যবোধ ও রীতিনীতি থেকে এসেছে। আবার ধান সংগ্রহ, সংরক্ষণ, ধার দেওয়া ও ধার শোধ করার জন্য নানান নিয়মকানুন তৈরি হয়েছিল, সেগুলোও সমাজের মূল্যবোধ ও রীতিনীতির আলোকে তৈরি হয়েছে। এমনি করে এইসব সামাজিক রীতিনীতি ও মূল্যবোধগুলোর মাধ্যমে দেশের আইন-কানুনও তৈরি হয়। সমাজের মানুষ এসব মেনে চলে। নইলে নানারকম শাস্তিও পেতে হয়।

আসিফ বলল, হ্যাঁ, আপা। ধর্মগোলা গল্পে আমরা দেখেছি, যখন গ্রামে চোরের উপদ্রব বেড়ে গিয়েছিল, তখন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পুলিশ এসেছিল। পুলিশ নিশ্চয়ই চোরদের ধরে নিয়ে শাস্তির ব্যবস্থা করেছিল।

> সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মাঝে দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকা পারস্পরিক সম্পর্ক বা সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সুশৃঙ্খল আন্তঃসম্পর্ককে বলা হয় সামাজিক কাঠামো। এর মধ্যে মানুষ একত্রে বসবাস করে ও মানুষে-মানুষে মিথস্ক্রিয়া বা আদান-প্রদান ঘটে; মূল্যবোধ, সংস্কৃতি, নিয়মকানুন ও রীতিনীতি তৈরি হয় এবং এগুলোর মাধ্যমেই আবার মানুষে-মানুষে মিথস্ক্রিয়ার ধরণ নির্ধারিত হয়। অর্থাৎ মূল্যবোধ, সংস্কৃতি, নিয়মকানুন ও রীতিনীতি ইত্যাদি মানুষের আচার-আচরণ কেমন হবে তা ঠিক করে দেয়।

ছবি:

খুশি আপা বললেন, এবার চলো, আমরা প্রত্যেকে নিজের এলাকার সমাজ থেকে কোনো একটি সম্মিলিত উদ্যোগ বা এরকম একটি বিষয় চিহ্নিত করি। তারপর সেই উদ্যোগ বা বিষয় থেকে মানুষে-মানুষে, মানুষে-প্রতিষ্ঠানে, প্রতিষ্ঠানে-প্রতিষ্ঠানে মিথস্ক্রিয়ার অনুসন্ধান করি। আমরা নিচের ছকটিতে সেই মিথস্ক্রিয়ার বর্ণনা লিখব:

এরপর খুশি আপা বললেন, আচ্ছা বলো তো, আমাদের দেশের ছেলে আর মেয়েদের পোশাক কেমন?

সবাই একযোগে বলে উঠল, মেয়েদের ফ্রক, কামিজ, শাড়ি আর ছেলেদের শার্ট, প্যান্ট, লুঙ্গি, পাঞ্জাবি। খুশি আপা বললেন, ঠিক বলেছ, কিন্তু মেয়েদের আর ছেলেদের পোশাক কেমন হবে তা কে ঠিক করল?

নীলা বলল, আমাদের বাবা-মায়ের কাছ থেকে আমরা শিখি। খুশি আপা বললেন, বাবা-মা কী করে জানলেন, কার কোন পোশাক পরা উচিত? শামীমা বলল, দাদা-দাদী, নানা-নানীদের কাছ থেকে!

খুশি আপা হেসে বললেন, আবারও যদি একই রকম প্রশ্ন করি, দাদী-নানীরা জানলেন কীভাবে? তাহলে তোমরা নিশ্চয়ই দাদী-নানীদের বাবা-মায়ের কথা বলবে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পোশাকের কাট-ছাঁটে একটু বদল হলেও ছেলে-মেয়ের পোশাকের একটা নির্দিষ্ট ধরণ এবং ভিন্নতা আগে থেকেই আছে। আমরা সাধারণত সেগুলো মেনে চলি। তার মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, আমাদের জন্মের আগেই আমাদের পোশাক কেমন হবে তা নির্ধারিত হয়ে যায়।

এমনিভাবে আমাদের জন্মের আগেই সমাজ কীভাবে সংগঠিত হবে বা সামাজিক কাঠামো কেমন হবে তা নির্ধারিত হয়ে আছে। সামাজিক কাঠামো আমাদের আচার-আচরণকে নির্দিষ্ট করে দেয়। আমাদের কোন পরিস্থিতিতে কী করা উচিত, কোথায় কী বলা উচিত, কেমন পোশাক পরা উচিত, কার সাথে কেমন আচরণ করা উচিত— এসবের প্রায় সবই সামাজিক কাঠামো দ্বারা পূর্ব নির্ধারিত। আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তা অনুসরণ করি মাত্র। তবে সামাজিক কাঠামোও অপরিবর্তনীয় নয়। খুব ধীরে হলেও এই কাঠামো বদলায়।

- পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত সামাজিক দল ও সকল প্রতিষ্ঠানসমূহ, যার মধ্যে মানুষ বাঁচে, বাড়ে ও এর অংশ হয়ে ওঠে— এই সবকিছুর সম্মিলিত রূপকে সামাজিক কাঠামো বলা যায়। এইসব সামাজিক দলের মধ্যে থাকে পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ক্লাব ইত্যাদি। এর মাধ্যমে মানুষে-

মানুষে সর্ম্পক তৈরি হয়, এই সম্পর্ক সমাজে সম্প্রীতির বন্ধন গড়ে তোলে।

- সামাজিক কাঠামো মানুষকে সামাজিক নিরাপত্তা দেয়, নিজের অবস্থানের উন্নয়ন ঘটানো এবং অন্যদের কাছে নিজেকে উপস্থাপন করার সুযোগ দেয়। এখানে ব্যক্তি নিজের আত্মীয়-প্রতিবেশীর গন্ডি পেরিয়েও অপরিচিত গন্ডির মানুষের সঙ্গে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ায় লিপ্ত হওয়ার পরিসর পায়। এর মাধ্যমে সে সমষ্টির অংশ হিসেবেও সে নিজেকে উপস্থাপন করে।
- সামাজিক কাঠামোর উদ্দেশ্য একটা দলে বসবাসরত মানুষের সম্মিলিত লক্ষ্য পূরণ করা। সবাইকে সমাজের উন্নয়নে ভূমিকা পালন করার যোগ্যতা সম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে সহযোগিতা করা। সমাজের সংস্কৃতির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে সাহায্য করা।

ধরা যাক, শাপলা বার বছরের একটি মেয়ে। যে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী। সে নিজেকে একজন স্বতন্ত্র বা আলাদা ব্যক্তি হিসেবে বুঝতে শিখছে। শাপলা স্কুলের ফুটবল দলে যোগ দিয়েছে। কারণ সে খেলাটা উপভোগ করে। এভাবে খেলতে খেলতে তার কিছু বন্ধু তৈরি হয়। সময়ের সাথে সাথে, এই ফুটবল দলটি শাপলাকে একজন ভাল খেলোয়াড় হিসেবে দেখতে পায়। আবার একইসাথে সামাজিকভাবে একজন দলীয় খেলোয়াড় (টিমমেট) হিসেবে গড়ে তোলে। তার দলের খেলোয়াড়, কোচ, শিক্ষক, অন্য দলের খেলোয়াড়, ফুটবলপ্রিয় দর্শকদের সাথে যোগাযোগের মধ্য দিয়ে তার ব্যক্তিগত বিকাশ ঘটে। এই বিকাশ একজন ব্যক্তি হিসেবে তাকে অনন্য (অন্যদের চেয়ে আলাদা) করে তোলে। অন্যদিকে শাপলার বোন নাজিফা বিজ্ঞান ক্লাবের সদস্য হয়। তার বন্ধু, পরিচিত জন, যোগাযোগ সবই বিজ্ঞান বিষয়ে আগ্রহী মানুষ ও প্রতিষ্ঠানের সাথে। ফলে, একই পরিবারের মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও কেয়ার ব্যক্তিগত বিকাশ ঘটে শাপলার চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে। দুই বোনের সামাজিক যোগাযোগ ও মিথস্ক্রিয়ায় অর্থাৎ সামাজিক কাঠামোর উপাদানে ভিন্নতা থাকার কারণে দুই জন দুই রকমের মানুষ হিসেবে গড়ে উঠেছে। এরকম ঘটনা সমাজের সর্বত্র দেখতে পাওয়া যায়। যার মধ্য দিয়ে বোঝা যায়, সামাজিক কাঠামো ব্যক্তি ও সমাজের মানুষের জন্য কতটা শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে।

সামাজিক কাঠামোর উপাদানসমূহ

সামাজিক কাঠামো যেসব উপাদানে তৈরি হয়, সেগুলোকে মোটাদাগে দুটি ভাগ করা যায়:

১. সামাজিক বিধি: এর মধ্যে রয়েছে সমাজে প্রচলিত রীতিনীতি, মূল্যবোধ, বিশ্বাস ইত্যাদি। এগুলো মানুষের চিন্তা ও সামাজিক আচরণ কেমন হবে তা নির্ধারণে ভূমিকা পালন করে।

২. সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও দল: এখানে রয়েছে, পরিবার, শিক্ষা, সংস্কৃতি, প্রচার মাধ্যম, সরকার ও রাষ্ট্র— যাদের মাধ্যমে সামাজিক কাঠামো নিয়ন্ত্রিত বা পরিচালিত হয়।

মানুষে-মানুষে সামাজিক মিথস্ক্রিয়া বা যোগাযোগের মাধ্যমে সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও দলের সৃষ্টি হয়। এই প্রতিষ্ঠান ও দলগুলো সামাজিক কাঠামোর ভিত্তি। একজন মানুষ একই সঙ্গে সামাজিক কাঠামোর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও দলে অবস্থান করে। সেখানে সে নিজের অবস্থান অনুযায়ী সমাজে প্রচলিত রীতিনীতি, মূল্যবোধ, বিশ্বাস ইত্যাদির আলোকে ভূমিকা পালন করে।

আমাদের শরীরের যেমন চোখ, নাক, মুখ. কান, হাত, পা, মস্তিস্ক, ফুসফুস, হৃদপিণ্ড ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে। এগুলোকে একসঙ্গে মিলিয়ে মানব শরীর তৈরি হয়। এরা সবাই কাজ করলে আমাদের শরীর ঠিকঠাক কাজ করে। এই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো বিশেষভাবে আমাদের শরীরে বিন্যস্ত আছে। এই বিন্যাসকে আমরা শারীরিক কাঠামো বলতে পারি।

তেমনি সমাজের বিন্যাসকে সামাজিক কাঠামো বলতে পারি। কিন্তু সমাজ হলো একটি বিমূর্ত বিষয়, তাকে চোখে দেখতে পাই না; বলতে পারি না, ওই দেখো সমাজ যাচ্ছে। কিন্তু ব্যক্তি বা পরিবারকে দেখতে পাই। দলগুলোকে দেখতে পাই। ব্যক্তি এবং দল মিলে সমাজ তৈরি হয়। ব্যক্তির আলাদা আলাদা অবস্থান। কেউ বাবা, কেউ মেয়ে, কেউ শিক্ষক। আছে ধনী-দরিদ্র. নারী-পুরুষ, শিশু-বয়োজ্যোষ্ঠ। তাদের ভূমিকা বা কাজও আলাদা আলাদা। সমাজে রয়েছে আলাদা আলাদা সংস্কৃতি, আলাদা আলাদা পরিচয়, আলাদা আলাদা মূল্যবোধ ও বিশ্বাসের ব্যক্তি এবং দল। এইসব দল, প্রতিষ্ঠান, এখানে ব্যক্তির অবস্থান ও ভূমিকা, মূল্যবোধ, বিশ্বাস ইত্যাদি সমাজ তৈরির যাবতীয় উপাদান সুশৃঙ্খলভাবে বিন্যস্ত হয়ে সামাজিক কাঠামো তৈরি করে।

সামাজিক অবস্থান

একজন মানুষের বয়স, ব্যক্তিগত সম্পত্তি, তার পরিচিতি, খ্যাতি, পদ, শিক্ষা-দীক্ষা-সংস্কৃতি, লিঙ্গ, পারিবারিক ঐতিহ্য ইত্যাদি তার সামাজিক অবস্থান তৈরি করে। সমাজে বা একটি দলের মধ্যে একজন ব্যক্তি কতটা সম্মান বা গুরুত্ব পাবেন তা তার সামাজিক অবস্থানের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়।

সামাজিক ভূমিকা

কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে সমাজ কোন বিশেষ মানুষের কাছে যে মূল্যবোধ, দায়িত্বশীলতা ও আচরণ প্রত্যাশা করে তাকেই সাধারণভাবে সামাজিক ভূমিকা বলা হয়। ভিন্ন ভিন্ন মানুষ সমাজে তার অবস্থান অনুযায়ী ভিন্ন ভন্ন দায়িত্ব পালন বা আচরণ করে। মানুষ সাধারণত এসব কাজ করার সময়, সমাজ তার কাছে যে বা আচরণ প্রত্যাশা করে তা পূরণ করার চেষ্টা করে। সামাজিক অবস্থানের পরিবর্তন হলে সামাজিক ভূমিকারও পরিবর্তন হয়।। যেমন সমাজ একজন খেলোয়াড়ের কাছ থেকে যা আশা করে, একজন পরিচ্ছন্নতাকর্মীর কাছ থেকে তা আশা করে না। সমাজ ছেলে এবং মেয়েদের কাছে ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক ভূমিকা প্রত্যাশা করে। তবে সমাজের প্রত্যাশার বাইরে গিয়েও তাদের ভূমিকা পালনের সক্ষমতা থাকে। তবে শিশু এবং বয়োজ্যেষ্ঠদের সামাজিক ভূমিকাও আলাদা হয়।

সামাজিক নেটওয়ার্ক বা আন্তঃযোগাযোগ

একটি দলের সদস্যদের নিজেদের মধ্যকার মিথস্ক্রিয়া আবার একটি দলের সঙ্গে আর একটি দলের মিথস্ক্রিয়াকে সামাজিক নেটওয়ার্ক বা আন্তঃযোগাযোগ বলে। যেমন: সালমা স্কুলের সক্রিয় নাগরিক ক্লাবের সদস্য। এই কারণে তার স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করার প্রয়োজন হতে পারে। অর্থাৎ একটি ক্লাবের সদস্য হওয়ার কারণে তার আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযোগ ঘটতে পারে। এভাবে সালমা তার ক্লাবের সদস্য হবার কারণে আরো অনেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্কিত হয়ে যায়। এই যে সালমার সাথে বিভিন্ন ধরণের ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের যোগাযোগ ও সম্পর্কের জাল তৈরি হলো এটাই হচ্ছে সালমা ও তার ক্লাবের সামাজিক নেটওয়ার্ক বা আন্তঃযোগাযোগ।

দল ও প্রতিষ্ঠান

দল ও প্রতিষ্ঠান বলতে সামাজিক সম্পর্কের প্রতিষ্ঠিত ও স্থায়ী ধরণকে বোঝানো হয়। এধরণের কিছু গতানুগতিক দল ও প্রতিষ্ঠান আমরা দেখতে পাই, যেমন পরিবার, সংস্কৃতি, রাজনীতি, আইন, সরকার, রাষ্ট্র, অর্থনীতি, ধর্ম শিক্ষা। দল ও প্রতিষ্ঠান বৃহত্তর সামাজিক কাঠামো তৈরি করে এবং এখানে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সম্পর্ক তৈরির সুযোগ সৃষ্টি করে। ধরা যাক, খুশি আপার ক্লাসে বিয়াল্লিশ জন শিক্ষার্থী আছে। এর মানে হচ্ছে, খুশি আপা তার বিয়াল্লিশ জন ছাত্র-ছাত্রীর মাধ্যমে প্রায় চুরাশি জন অভিভাবকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে

পারেন। অর্থাৎ বিদ্যালয়ের মাধ্যমে বিয়াল্লিশটি পরিবারের সঙ্গে খুশি আপার যোগাযোগ ও জানাশোনার সুযোগ হয়েছে।

সামাজিক কাঠামো হিসেবে পরিবার

সামাজিক কাঠামোর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাথমিক উপাদান হলো পরিবার। একজন মানুষের জন্য প্রথম সামাজিক দল বা সংগঠন হচ্ছে পরিবার। পরিবার একজন ব্যক্তির বিকাশে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করে। সে কী খাবে, কীভাবে কথা বলবে, কী পরবে, কী কী কাজ করবে ইত্যাদি পরিবারের মাধ্যমে অনেকাংশে নির্ধারিত হয়। একজন মানুষ পরিবারের মাধ্যমে বুঝতে পারে বৃহত্তর সমাজের মধ্যে তাকে কী ভূমিকা রাখতে হবে, সে কী হবে, কী করলে তাকে ভালো বা খারাপ বলে মনে করা হবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সুমনের পরিবার তাকে শেখাল যে, সুমন যদি বাইরের লোকদের সাথে যোগাযোগের সময় নম্র ও ভদ্র থাকে, তাহলে তাকে সবাই ভালো বলবে। সুমন যদি পরিবারের এই শিক্ষা মান্য করে তাহলে সে অন্যদের কাছে ভদ্র ছেলে হিসেবে পরিচিত হবে। আবার সানজিদা যদি তার পরিবারের সদস্যদের সব সময়ে রুক্ষ আচরণ করতে দেখে, সে সেরকম আচরণে অভ্যস্ত হবে। সে তখন সকলের কাছে অভদ্র হিসেবে পরিচিত হবে। লোকে তাকে অপছন্দ করবে। এভাবে পরিবার সামাজিক কাঠামোয় ব্যক্তির অবস্থান ও ভূমিকা তৈরি করে।

সামাজিক কাঠামোর উপাদান

সামাজিক কাঠামো নানাভাবে মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করে। মানুষের ওপর সামাজিক কাঠামোর এই প্রভাব বুঝতে হলে এর উপাদানগুলো সম্পর্কে আমাদের জানা দরকার। যেমন, পরিবার, সংস্কৃতি, আইন, সরকার, রাষ্ট্র প্রভৃতি। এই উপাদানগুলোকে আবার সামাজিক প্রতিষ্ঠানও বলা হয়। প্রতিটি সামাজিক প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও ভূমিকা রয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলো সামগ্রিকভাবে একটি দলগত ঐক্য ও নিরাপত্তার বোধ দেয়। সামাজিক কাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে আমরা নিচের কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের কথা বলতে পারি।

পরিবার	সংস্কৃতি	আইন	সরকার	রাষ্ট্র

পরিবার: আমাদের শৈশব-কৈশোরে মৌলিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষা দেয়।

সরকার: সরকার আইন-কানুন ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থা যেমন-পুলিশ, আনসার প্রভৃতির মাধ্যমে ব্যক্তিকে সারাজীবন নিরবিচ্ছিন্নভাবে নিরাপত্তা ও সুরক্ষা দেয়।

রাষ্ট্র: রাষ্ট্র নিজে বৃহত্তর সামাজিক কাঠামোর অংশ । আবার অন্যদিকে, রাষ্ট্র তার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সামাজিক কাঠামোকে পরিবর্তন করতে ভূমিকা রাখে। নাগরিকদের নানান সেবা (শিক্ষা, চিকিৎসা, খাদ্য, বাসস্থান, নিরাপত্তা, যোগাযোগ, বিনোদন প্রভৃতি) প্রদান করার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়।

আইন-কানুন ও মূল্যবোধ, রীতি-নীতি, প্রথা:

সামাজিক কাঠামো স্থানীয় ও জাতীয় আইন-কানুন এবং মূল্যবোধ, রীতিনীতি ও প্রথা দ্বারা পরিচালিত হয়। মানুষ নিজে সামাজিক কাঠামোর অংশ হিসেবে এইসব নিয়মকানুন, মূল্যবোধ, রীতিনীতি ও প্রথাকে মেনে

চলে। জীবনযাপনের নানান বিষয়ে যেমন-ঝগড়া, দ্বন্দ্ব, জমিজমার মালিকানা, উত্তরাধিকার, ও বিভিন্ন সুযোগ সংক্রান্ত বিষয়গুলো এই কাঠামো দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

সংস্কৃতি:

সংস্কৃতি হচ্ছে দলগতভাবে কোনো এলাকার মানুষের আচরণের বিশেষ ধরণ। আমাদের জীবনের সাথে সম্পর্কিত প্রায় সব আচরণই আমাদের সংস্কৃতির অংশ। যেমন-আমরা কী ধরণের খাবার খাই, কীভাবে খাই, ভাষা, পোশাক, খেলাধূলা, আচার-অনুষ্ঠান, শিল্প-সংস্কৃতি, ধর্মীয় ও অন্যান্য বিশ্বাসসহ আরো অনেক কিছু। এক এক দেশের বা একই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মাঝে সংস্কৃতির পার্থক্য থাকতে পারে। যেমন বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলীয় এলাকায় এক ধরণের সংস্কৃতি, আবার উত্তরবঙ্গ বা পাহাড়ি এলাকায় আবার ভিন্ন ভিন্ন সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। এই সব বৈচিত্র্যপূর্ণ সংস্কৃতি নিয়েই আমাদের বাংলাদেশের সংস্কৃতি।

আবার অনেক সময় একটি দেশের সংস্কৃতি অন্য দেশের মানুষের কাছে বিচিত্র বা চমকপ্রদ মনে হতে পারে।

যেমন-

১. ভেনিজুয়েলাতে যদি তোমাকে তোমার কোনো বন্ধুর বাসায় নিমন্ত্রণ করা হয়, আর তুমি যদি ঠিক সময়ে গিয়ে হাজির হও, তাহলে তোমাকে ওরা ভাববে তুমি পেটুক আর লোভী। ঠিক সময়ের চেয়ে একটু দেরি করে যাওয়াটাই সেখানকার সংস্কৃতি।

২. অন্যদিকে চীনে গিয়ে কোনো বন্ধুকে ভুলেও অভিনন্দন জানাতে ফুলের তোড়া উপহার দেয়া যাবে না। কারণ চীনের সংস্কৃতি অনুযায়ী শুধু মৃত মানুষকেই ফুলের তোড়া দেয়ার প্রচলন।

৩. কিন্তু প্রত্যেকের কাছেই তার নিজের সংস্কৃতি তার কাছে খুবই ভালো এবং উপযোগী মনে হয়। এজন্য সংস্কৃতির কোনো ভাল বা মন্দ বিচার করা চলে না। এক দেশের বা ধর্মীয় ও অন্যান্য বিশ্বাসের সংস্কৃতির সাথে অন্য দেশের বা ধর্মীয় ও অন্যান্য বিশ্বাসের কোনো রকম তুলনা করা চলে না। পৃথিবীতে এত বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি আছে বলেই পৃথিবীটা এত সুন্দর মনে হয়।

সমাজ, রাষ্ট্র, সংস্কৃতি, সরকার-আগে কেমন ছিল?

আজ ক্লাসে মিলি দুটি ছবি নিয়ে এসেছে। প্রাচীন কালের ছবি।

প্রাচীন সমাজ জীবন

প্রাচীন সুমেরীয় সভ্যতায় সমাজ জীবনের খণ্ডচিত্র (কল্পিত)

আনাই: দেখো দেখো ! আগের সমাজ এখানকার চেয়ে অনেক ভিন্ন না?

মিলি: হ্যাঁ ঠিকই বলেছ। তাহলে, সে সময়কার রাষ্ট্র, আইন, সংস্কৃতি, ধর্ম এগুলোও কি ভিন্ন ছিল?

সবাই চিন্তায় পড়ে গেলো।

নাজিফা: আচ্ছা, খুশি আপা! এ বিষয়ে একটি অনুসন্ধানী কাজ করলে কেমন হয়?

অনুসন্ধানী প্রজেক্ট

খুশি আপা নিশ্চয়, আমরা কি কি নিয়ে অনুসন্ধান করব সেটা বুঝতে চলো আগে যা শিখেছি সেই ধারণা আরেকটু ঝালাই করে নেই। আমরা বিভিন্ন কাঠামো সম্পর্কে জেনেছি। একেক জন একেকটা নাম বল দেখি, আর ঝটপট বোর্ডে লিখে ফেলো।

সমাজ নদী,
সমুদ্র, রাষ্ট্র, মরুভূমি, সমতল ভূমি, ধর্ম পর্বত, সরকার,
আইন, সংস্কৃতি,

এবারে এগুলোর মধ্যে কোনগুলো সামাজিক (অর্থাৎ মানুষের তৈরি) আর কোনগুলো প্রাকৃতিক বা ভৌগোলিক কাঠামো তা আমরা নিজেরাই বোর্ডে চিহ্নিত করলাম।

এবারে **অনুসন্ধানী দল তৈরি** করলাম। একেক দল এক একটি কাঠামো নির্বাচন করলাম অনুসন্ধানের বিষয় হিসেবে।

এবারে এই বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য **অনুসন্ধানী প্রশ্ন** তৈরি করলাম (বিজ্ঞানের চোখে চারপাশ দেখি অধ্যায়ের কথা মনে আছে? সেই অনুসন্ধানী কাজ? প্রয়োজন হলে সেটি একটু পড়ে দেখতে পারি আমরা)। অতীতে বিভিন্ন সময়ে এই কাঠামো কিভাবে গড়ে উঠেছে, কাজ করেছে, এখনকার সাথে মিল, অমিল ইত্যাদি নিয়ে প্রশ্ন তৈরি করলাম আমরা। যেমন:

১. প্রাচীন কালে সমাজ কীভাবে গড়ে উঠেছিল? সমাজ কীভাবে কাজ করতো? এখনকার সাথে মিল বা অমিল গুলো কী কী?

২. প্রাচীন সভ্যতায় আইন কেমন ছিল? এখনকার সাথে তার কি মিল বা অমিল আছে?

৩. প্রাচীন সভ্যতায় সংস্কৃতি কেমন ছিলো? বর্তমানের মানুষের সংস্কৃতির সাথে তার উপাদানসমূহের কি মিল বা অমিল আছে?

৪. প্রাচীন সভ্যতায় রাষ্ট্র ব্যবস্থা কেমন ছিলো? বর্তমান সময়ের রাষ্ট্রের সাথে তার কী মিল বা অমিল আছে?

৫. প্রাচীন সভ্যতাগুলো কেন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নদী/সমূদ্র বা কোন জলাশয়ের তীরে গড়ে উঠেছিলো?

৬. ---

৭. ---

এগুলো কিছু উদাহরণ মাত্র। এরকম হাজার হাজার প্রশ্ন আমরা নিজেরা পছন্দমত তৈরি করে নিতে পারি।

প্রতিটি প্রশ্ন অনুসন্ধান করতে সেটাকে ভেঙে আরও ছোট ছোট ও সুস্পষ্ট প্রশ্ন তৈরি করে আমরা সেগুলোর উত্তর অনুসন্ধান করে (যেমন-বই পড়ে, সাক্ষাৎকার নিয়ে, পর্যবেক্ষণ করে, ইন্টারনেট থেকে বিভিন্ন ওয়েবসাইট ব্যবহার করে) বের করতে পারবো। যেমন:

প্রশ্ন: প্রাচীন সভ্যতাগুলোতে সংস্কৃতি কেমন ছিলো ? এখনকার সাথে তার উপাদানসমূহের কী কী মিল বা অমিল আছে?

এটা ভেঙ্গে আমরা ছোট প্রশ্ন পেলাম-

অনুসন্ধানের প্রশ্ন-১ প্রাচীন সভ্যতাগুলোর সংস্কৃতি কেমন ছিলো? সেই সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ উপাদনগুলো কেমন ছিলো?

এটি অনুসন্ধানের জন্য সবাই এরকম ছক ব্যবহার করল:

সভ্যতা	স্থান	সময়কাল	সাংস্কৃতিক উপাদান বা চর্চা	আদি মানুষের জীবনে এর প্রভাব

খুশি আপা বললেন, অন্যান্য বই, ইন্টারনেট, পত্রিকা, ম্যাগাজিন প্রভৃতি উৎস থেকে যেমন আমরা এ বিষয়ে

তথ্য পেতে পারি তেমনি আবার আমাদের **ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান (অনুসন্ধানী পাঠ)** বইয়ের

অধ্যায় ২- মানুষ ও সমাজ এলো কোথা থেকে

অধ্যায় ৩- সভ্যতার বিকাশ - এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপে নগরায়ন ও রাষ্ট্র

অংশগুলো থেকে এ সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারবো।

অনুসন্ধানের প্রশ্ন-২ পৃথিবীর যে সব দেশে বা স্থানে প্রাচীন সভ্যতাগুলো গড়ে উঠেছিল সেসব স্থানে বর্তমানকালে মানুষের সংস্কৃতি ও তার উপাদানগুলো কেমন?

বিভিন্ন বই পড়ে, ইন্টারনেট থেকে, নিজেরা পর্যবেক্ষণ করে, বড়দের সাক্ষাৎকার নিয়ে তারা তথ্য সংগ্রহ করবে। তথ্য সংগ্রহের জন্য অনুসন্ধানের প্রশ্ন-১ এ ব্যবহৃত ছক এর মত ছক তৈরি করে অনুসন্ধানের প্রশ্ন-২ এর তথ্য সংগ্রহের জন্যও ব্যবহার করা যাবে।

অনুসন্ধানের প্রশ্ন-৩ বর্তমানকালে ও অতীত কালের মানুষের জীবনে সংস্কৃতিগত কী কী মিল অমিল দেখা যায়?

খুশি আপা আরও বললেন যে, **ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান (অনুসন্ধানী পাঠ)** বইয়ের অন্যান্য অংশগুলোও আমাদের অতীতের সামাজিক কাঠামোসমূহ সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে সহযোগিতা করতে পারে। কাজেই সবাই চলো **ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান (অনুসন্ধানী পাঠ)** বইয়ের নিচের অংশগুলো নিয়ে কাজ করি। অংশগুলো হচ্ছে-

অধ্যায় ২- মানুষ ও সমাজ এলো কোথা থেকে

অধ্যায় ৩- সভ্যতার বিকাশ - এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপে নগরায়ন ও রাষ্ট্র

প্রতিফলন: এবারে কিন্তু আমাদের অনুসন্ধানী কাজের প্রক্রিয়াটি ভাবব, যেমন প্রতি ধাপে কি কি কাজে অসুবিধা বা চ্যালেঞ্জ অনুভব করেছি, কেন? কীভাবে তা থেকে বের হলাম, কোন কাজগুলো করতে কেমন লেগেছে? ভবিষ্যতে আবার এই কাজটি করলে কি কি কাজ ভিন্ন ভাবে করবো, আর সর্বোপরি আমার নিজের অনুভূতি-কেমন ছিল কাজটি করে তা নিয়ে ভাবব।

একইভাবে অন্যান্য প্রশ্নগুলো নিয়েও আমরা **ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান (অনুসন্ধানী পাঠ)** বই ব্যবহার করে বিজ্ঞানের চোখ দিয়ে চারপাশ দেখি অংশে যে অনুসন্ধানের পদ্ধতি চর্চা করা হয়েছে তা অনুসরণ করে অনুসন্ধান করব।

এরপর প্রতিটি দল অনুসন্ধানে প্রাপ্ত ফলাফল বিভিন্ন উপায়ে উপস্থাপন করি। মিলির দল একটা সময় রেখা (টাইম লাইন) তৈরি করে কোন সময়ে কী কী ধরনের সমাজ ছিল তা দেখালো। আনাই এর দল অভিনয় করে বিভিন্ন সময়ের আইন আর তাদের পার্থক্যও দেখলো। অন্যান্য দলগুলোও পোস্টার এ উপস্থাপন করে, সে সময়কার বিভিন্ন নিদর্শনের মতো হুবহু একই রকম জিনিস তৈরি করে (Replica) প্রদর্শন করে। সেই সাথে গান গেয়ে, কমিক্স বই, ভিডিও বানিয়ে, নানা সৃজনশীল উপায়ে তাদের ফলাফল উপস্থাপন করলো।

প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামোর আন্তঃসম্পর্ক এবং আমাদের দায়িত্বশীলতা

সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তনে আশপাশের পরিবেশের প্রভাব

নীলা, রনি ও সালমা স্কুলে আসার পথে দেখল একটা খালের পাশে অনেক মানুষ ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। ওরা কাছে যেতে দেখতে পেল অনেক মাছ মরে ভেসে উঠেছে। দেখে ওদের মন খারাপ হয়ে গেল।

সালমা বলল আচ্ছা মাছগুলো কেন মারা গেল?

নীলু বলল, আমার মনে হয় খালের পানি খারাপ হয়ে গেছে, তাই মাছ মরে যাচ্ছে, কারণ দেখছিস না পানি কেমন যেন কালো রঙের হয়ে গেছে।

রনি বলল, আরও দেখ খালের পাশে একটা কারখানা আছে এবং ওই কারখানার সব ময়লা পানি খালে গিয়ে পড়ছে।

আয়েশা বলল, আমাদের বাড়ির পাশে একটা ইটভাটা আছে, ওখানকার কালো ধোঁয়া যখন বেশি বের হয়, তখন আমার খুব শ্বাসকষ্ট হয়।

সাকিব বলল, কলকারখানা দেখছি অনেক কিছু সমস্যা তৈরি করছে। আচ্ছা আমরা তো অনুসন্ধান করতে পারি কলকারখানা আমাদের পরিবেশের উপর আরও কী কী প্রভাব ফেলছে?

আয়েশা বলল, তাহলে তো আমাদের একটা কারখানায় যেতে হবে দেখতে।

রিনা বলল, হ্যাঁ আবার অনুসন্ধানের বিষয় নিয়ে কিছু প্রশ্নও তৈরি করতে হবে। তাহলে চলো আমরা খুশি আপাকে ব্যাপারটা বলি।

খুশি আপা সব শুনে বললেন, এ তো ভালো কথা, তাহলে তোমরা কারখানায় গিয়ে কী কী দেখতে চাও তার প্রশ্ন তৈরি করে ফেলো।

তখন ওরা দলে ভাগ হয়ে প্রশ্ন তৈরি করল:

নিকিতার দলের প্রশ্ন:

১. কারখানাটি থেকে কী উৎপাদন করা হয়?
২. কী কী ধরনের কাঁচামাল ব্যবহার করা হয়?
৩. কাঁচামালের উৎস কোথায়?
৪. কোন ধরনের জ্বালানি ব্যবহার করা হয়?
৫. জ্বালানির উৎস কোথায়?
৬. উৎপাদিত পণ্যের সঙ্গে আর কী ধরনের বর্জ্য তৈরি হচ্ছে?
৭. বর্জ্যগুলো কোথায় যাচ্ছে?

সাকিব বলল আমরা তো আমাদের প্রশ্নগুলোকে কয়েকটা বিষয়ে ভাগ করে অনুসন্ধান করতে পারি, যেমন কাঁচামাল ও জ্বালানি। মিলি বলল, আবর্জনাও আছে কিন্তু। এভাবে সবাই মিলে উপস্থাপনের মাধ্যমে তাদের অনুসন্ধানের জন্য বিষয় চূড়ান্ত করল।

কাঁচামাল বিষয়ের অনুসন্ধানের ছক

কাঁচামাল	কাঁচামালের উৎস	কাঁচামাল সংগ্রহ ও ব্যবহারের কারণে পরিবেশের উপর প্রভাব	ফলাফল

কাঁচামাল ব্যবহার করে দ্রব্য তৈরিতে প্রয়োজনীয় জ্বালানী/ শক্তি বিষয়ক অনুসন্ধানের ছক

জ্বালানী/ শক্তি	জ্বালানী/ শক্তির উৎস	জ্বালানী/ শক্তি সংগ্রহ ও ব্যবহারে পরিবেশের উপর প্রভাব	ফলাফল

বর্জ্য বিষয়ক অনুসন্ধানের ছক

বর্জ্য	বর্জ্যের উৎস	পরিবেশের উপর বর্জ্যের প্রভাব	ফলাফল

তারপর ওরা খুশি আপার সহযোগিতায় একটি কারখানায় গেল পরিদর্শন করতে এবং অনুসন্ধান শেষে তারা তাদের তথ্যসমূহ সবার সামনে দলগতভাবে উপস্থাপন করল।

চলো, আমরাও ওদের মতো করে প্রশ্ন তৈরি করে কারখানা পরিদর্শনে যাই।

নাজিফা ও তার চার বন্ধুর তৈরি করা কাঁচামাল সংক্রান্ত অনুসন্ধান:

মাটি

কৃষি জমি

মাটি

১. এলাকায় ফলের উৎপাদন কমে গেছে

২. জমি চাষের অনুপযোগী হচ্ছে

৩. গাছপালার সংখ্যা কমে যাচ্ছে

৪. ………………

দেখ নাজিফা কী সুন্দর করে ছবি এঁকে, লিখে পরিবেশের উপর প্রভাবগুলো ফুটিয়ে তুলেছে। এভাবে তোমরাও সাক্ষাৎকার, পর্যবেক্ষণ, আলোচনা বা লিখিত প্রশ্নমালা ব্যবহার করে যা কিছু জেনেছ-তা গুছিয়ে উপস্থাপন করে দেখাতে পারবে তো? তোমরা নিশ্চয় পারবে।

পৃথিবীব্যাপী প্রভাব

পরের দিন ক্লাসে রনি বলল, আমরা তো আমাদের আশপাশের পরিবেশের উপর কলকারখানার প্রভাব বের করলাম, কিন্তু এ প্রভাব কি শুধু আমাদের চারপাশেই থাকে, নাকি পৃথিবীজুড়েই পড়তে পারে?

মুনিয়া বলল, কলকারখানা তো সব দেশেই আছে, তাহলে তো পৃথিবীর অনেক সমস্যা হচ্ছে।

খুশি আপা বললেন, ঠিক বলেছ মুনিয়া, চলো আমরা কিছু পরীক্ষার মাধ্যমে তা খুঁজে বের করতে পারি কিনা দেখি।

এখন তিনটি দলে ভাগ হয়ে পরীক্ষাগুলো শুরু করল।

প্রথম দল বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে একটি গাছের ছায়াযুক্ত স্থানে এক খণ্ড বরফ, একটি পাত্র ও একটি ঘড়ি নিয়ে; দ্বিতীয় দল রোদের মধ্যে এক খণ্ড বরফ একটি পাত্র ও একটি ঘড়ি নিয়ে; এবং ৩ নং দল দুটি থার্মোমিটার, একটি মুখবন্ধ কাঁচের গ্লাস ও একটি থার্মোমিটার নিয়ে যাবে। ১ ও ২ নং দল তাদের বরফটি সম্পূর্ণ গলে যাওয়ার সময় পরিমাপ করবে। ৩ নং দল তাদের দুটি থার্মোমিটারে একটিকে রোদের মধ্যে রাখবে এবং অন্যটি কাচের গ্লাসে রেখে মুখ বন্ধ করে রোদের মধ্যে রেখে দেবে এবং কিছুক্ষণ পর পর তাপমাত্রার পরিমাণ রেকর্ড করবে। পরবর্তী ১০.১৫ মিনিট ওরা যার যার অবস্থানে অপেক্ষা করবে।

চলো আমরাও ওদের মতো করে দলে ভাগ হয়ে পরীক্ষাগুলো করে দেখি কী দাঁড়ায়

এরপর ৩টি দলই ক্লাসে এসে কারণসহ তাদের অভিজ্ঞতা ছক পেপারে লিখে অন্য দুই দলের সঙ্গে শেয়ার করল।

১ ও ২ নং দলের অভিজ্ঞতা:

১ নং দল	বরফ গলার সময়	কারণ
২ নং দল		

৩ নং দলের অভিজ্ঞতা:

১ নং থার্মোমিটার	১০-১৫ মিনিট পরে তাপমাত্রা -------
২ নং থার্মোমিটার	১০-১৫ মিনিট পরে তাপমাত্রা--------

মিলি বলল আমরা তো পরীক্ষণে দেখলাম যেখানে গাছ ছিল না সেখানে তাপমাত্রা দ্রুত বৃদ্ধি পেল।

সাকিব বলল, তার মানে গাছপালা কমে গেলে পৃথিবীর তাপমাত্রা আরও বেড়ে যাবে।

খুশি আপা বললেন, সেটা আসলে কেমন হবে চলো আমরা একটা কমিকস পড়ে তা দেখি:

সবুজের পথে পৃথিবী

তোমরা আজ খুব উত্তেজিত মনে হচ্ছে
হুররে! হ্যা হ্যা এটা আমাদের জন্য সেরা একটি ক্যাম্পিং হতে যাচ্ছে!
মা, আমি কি একটু সমুদ্রের পাশে ঘুরতে যেতে পারি?
হ্যাঁ, যাও তবে বেশিদূর যাবে না। আর নোংরা ময়লা ধরবে না। ওখানে দেখলাম অনেক আবর্জনা। তাড়াতাড়ি ফিরবে। তোমার জন্য একটি চমক আছে।
ইশ! কি ময়লা। আমার যদি সুপার পাওয়ার থাকত এক নিমেষে সব ময়লা পরিষ্কার করে সমুদ্র সৈকত সুন্দর করে তুলতাম।

আহ্! হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে গেলাম! এই নরম বালিতে একটু গড়িয়ে নেয়া যাক। ....z z z z
আহা! এখানটার বালি কী গরম একটু গড়িয়ে নেয়া যাক! z z z...
আরে, একি! আমি তো হাওয়ায় উড়ছি। আমাদের ক্যাম্প কোথায়! এত পানি! সমুদ্র এত বড় হলো কিভাবে!
তুমি কে?
আমি প্রকৃতি, নষ্ট পৃথিবীকে ভাল করার জন্য এসেছি।
আমি ব্রতী, কিন্তু পৃথিবী নষ্ট হলো কখন? আমরা তো ক্যাম্প করেছিলাম।
আমি তোমাকে তোমার সময় থেকে ১৫০ বছর ভবিষ্যতে নিয়ে এসেছি! চল দেখাই তোমাকে কীভাবে পৃথিবি নষ্ট হয়েছে।

এটা কোথায়? এত গরম!
উত্তর মেরু...
কিন্তু, এখানে বরফ কোথায়!
সব গলে পৃথিবীকে ডুবিয়ে দিয়েছে...
এত বরফ গলে গেল কেমন করে?
চল এই টাইম মেশিনে করে এখন থেকে ১০০ বছর আগে নিয়ে যাই তোমাকে।

প্যাঁঃ! পুঃ!
পিপ!
পিপ! পিপ!
এত কালো ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে না কিছুই, আর কি দুর্গন্ধ...ওয়াক... আর এত শব্দ । কান ফেটে যাচ্ছে।
হ্যাঁ, আগের মানুষরা গাছপালা কেটে যেখানে সেখানে কলকারখানা বানিয়েছে, তার ফলে বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইডসহ অন্যান্য গ্রিন হাউজ গ্যাস বেড়ে গেছে এবং এর ফলে তাপমাত্রাও বেড়ে গেছে।
গ্রিন হাউজ গ্যাস, সেটা আবার কি? এর ফলে তাপমাত্রাই বা বাড়ে কিভাবে?

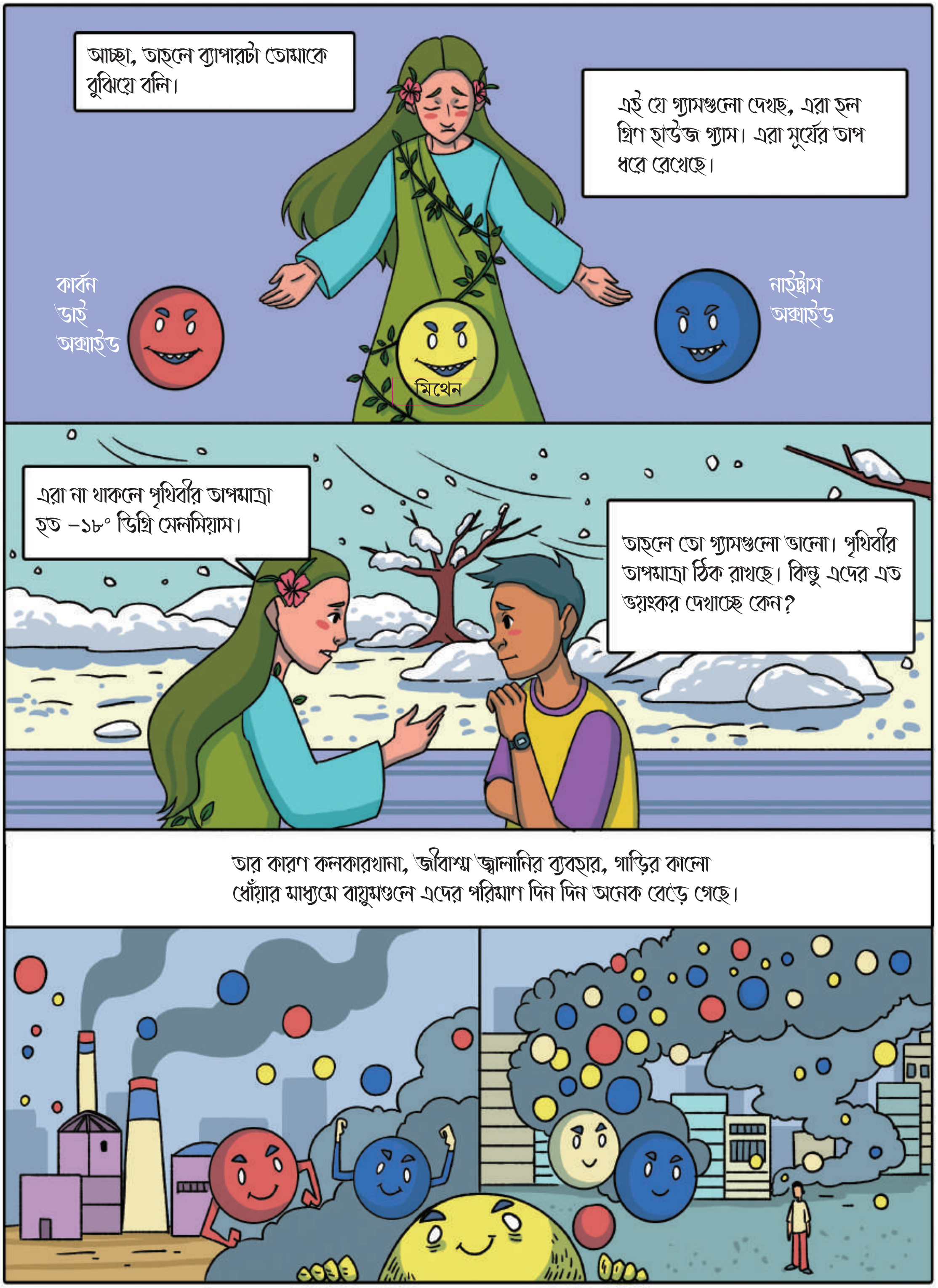
আচ্ছা, তাহলে ব্যাপারটা তোমাকে বুঝিয়ে বলি।
এই যে গ্যাসগুলো দেখছ, এরা হল গ্রিণ হাউজ গ্যাস। এরা সূর্যের তাপ ধরে রেখেছে।
কার্বন ডাই অক্সাইড
মিথেন
নাইট্রাস অক্সাইড
এরা না থাকলে পৃথিবীর তাপমাত্রা হত –১৮° ডিগ্রি সেলসিয়াস।
তাহলে তো গ্যাসগুলো ভালো। পৃথিবীর তাপমাত্রা ঠিক রাখছে। কিন্তু এদের এত ভয়ংকর দেখাচ্ছে কেন?
তার কারণ কলকারখানা, জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার, গাড়ির কালো ধোঁয়ার মাধ্যমে বায়ুমণ্ডলে এদের পরিমাণ দিন দিন অনেক বেড়ে গেছে।

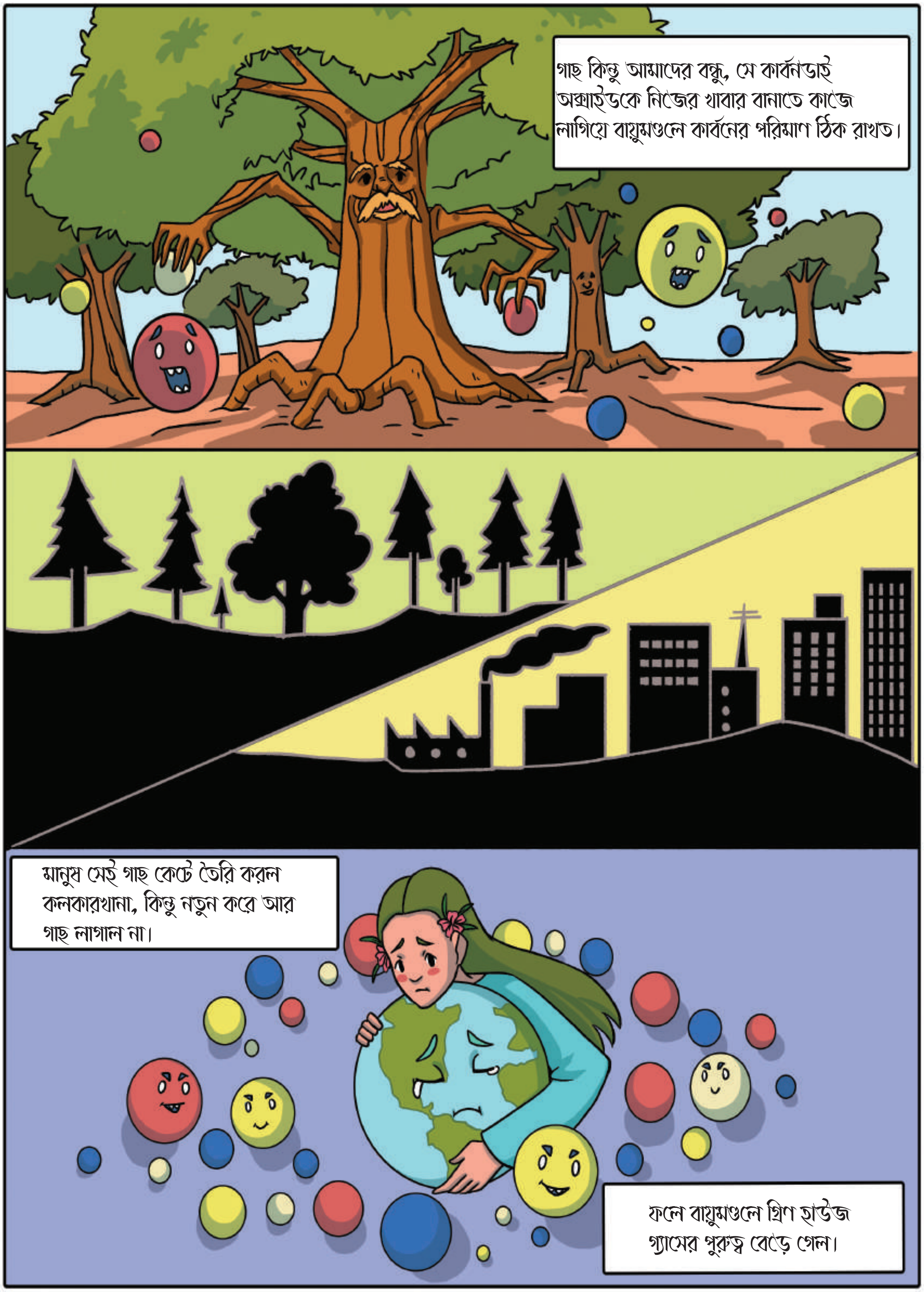
গাছ কিন্তু আমাদের বন্ধু, সে কার্বনডাই অক্সাইডকে নিজের খাবার বানাতে কাজে লাগিয়ে বায়ুমণ্ডলে কার্বনের পরিমাণ ঠিক রাখত।
মানুষ সেই গাছ কেটে তৈরি করল কলকারখানা, কিন্তু নতুন করে আর গাছ লাগাল না।
ফলে বায়ুমণ্ডলে গ্রিণ হাউজ গ্যাসের পুরুত্ব বেড়ে গেল।

গ্রিন হাউজ গ্যাস ঠিক কাঁচের মত। কাঁচ যেমন তাপ ধরে রাখে, ওরাও তেমন তাপ ধরে রাখে। ওরা সংখ্যায় বেশি হওয়ার কারণে বেশি বেশি তাপ ধরে রাখা শুরু করল। এরা
সূর্যের তাপ পৃথিবীতে আসতে কোনো বাধা দেয় না, কিন্তু পৃথিবী থেকে তাপকে চলে যেতে বাধা দেয়। এ ঘটনাকে বলা হয় গ্রিন হাউজ ইফেক্ট। আর এই গ্রিন হাউজ গ্যাসের কারণে পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়তেই থাকল। আর এ অবস্থাকেই বলা হয় গ্লোবাল ওয়ার্মিং অর্থাৎ পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়া।
আর এই গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর ফলে মেরুর সব বরফ গলে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাচ্ছে....... আর বদলে গেছে জলবায়ু।
গলিত শীলা
CO_2^+
CO_2^+
সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি

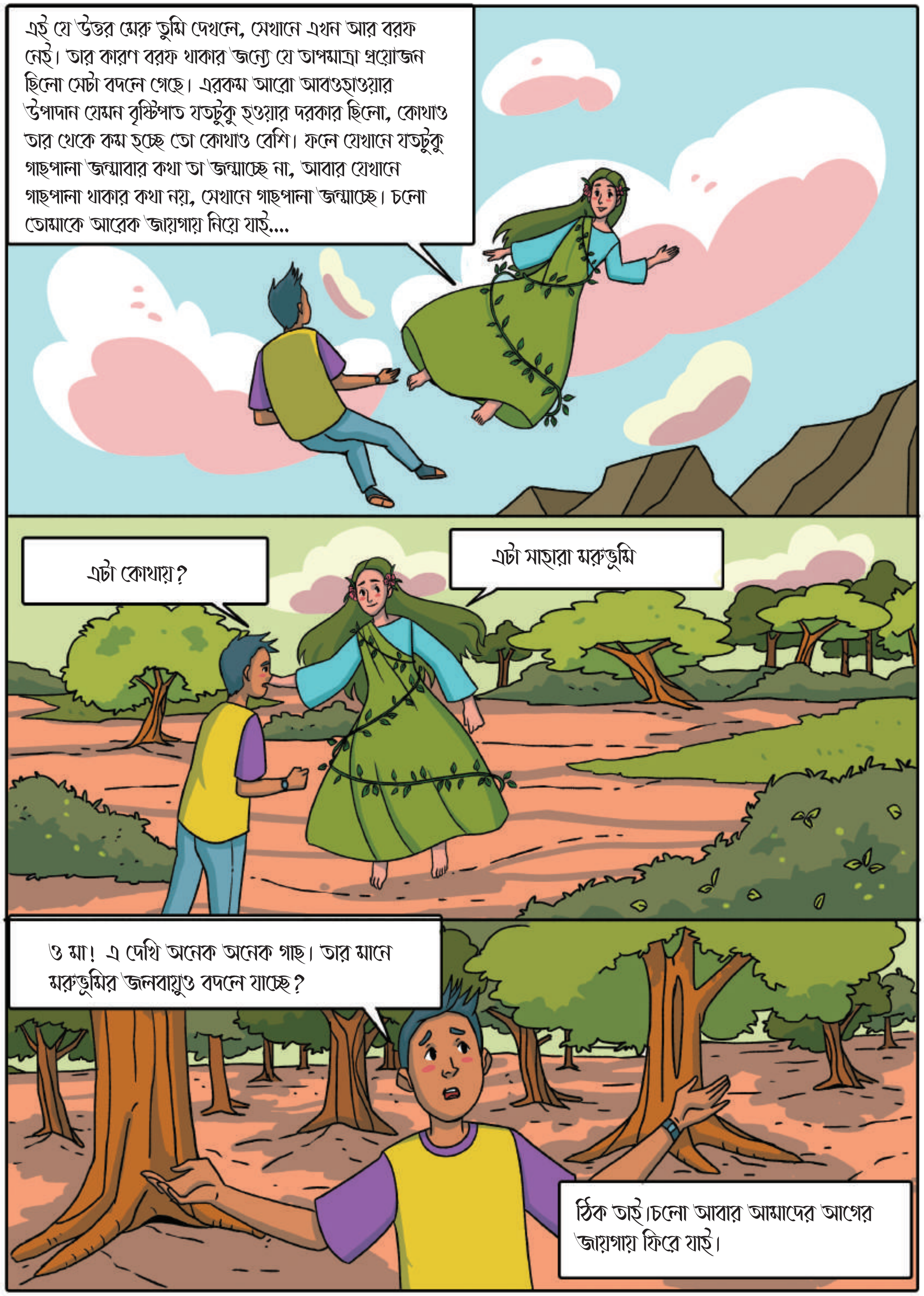
এই যে উত্তর মেরু তুমি দেখলে, সেখানে এখন আর বরফ নেই। তার কারণ বরফ থাকার জন্যে যে তাপমাত্রা প্রয়োজন ছিলো সেটা বদলে গেছে। এরকম আরো আবওহাওয়ার উপাদান যেমন বৃষ্টিপাত যতটুকু হওয়ার দরকার ছিলো, কোথাও তার থেকে কম হচ্ছে তো কোথাও বেশি। ফলে যেখানে যতটুকু গাছপালা জন্মাবার কথা তা জন্মাচ্ছে না, আবার যেখানে গাছপালা থাকার কথা নয়, সেখানে গাছপালা জন্মাচ্ছে। চলো তোমাকে আরেক জায়গায় নিয়ে যাই....
এটা কোথায়?
এটা সাহারা মরুভূমি
ও মা! এ দেখি অনেক অনেক গাছ। তার মানে মরুভূমির জলবায়ুও বদলে যাচ্ছে?
ঠিক তাই।চলো আবার আমাদের আগের জায়গায় ফিরে যাই।

এমা! দেখো মাছ টা প্লাস্টিক ব্যাগ খেয়ে ফেলছে...
কত ময়লা সমুদ্রে...পৃথিবী তো ময়লাতে ভরে গেছে...
Doctor's chamber
আর এভাবে পৃথিবীর সব কিছু বিষাক্ত হয়ে গেছে.... এত দুষণের ফলে দেখো মানুষরা সব অসুস্থ হয়ে পড়েছে. আর মারাও যাচ্ছে..
প্রকৃতি তুমি পৃথিবীকে বাঁচাও প্লিজ...!
এখন তো আর কিছু করা যাবে না..কিন্তু এরকম অবস্থা যদি তোমরা না তৈরি করতে তাহলে তো পৃথিবী নষ্ট হত না....

না না না ! ! আমরা কিছুতেই পৃথিবীকে নষ্ট হতে দেব না.. তুমি বলো কি করলে আমরা জলবায়ু পরিবর্তন ঠেকাতে পারবো! আমাদের কি করতে হবে..আমি তাই করবো... আমি তোমাকে কথা দিলাম!
তাহলে শোনো
বেশি বেশি গাছ লাগাবে
জিনিসপত্র নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া ব্যবহার করবে না! যতটা সম্ভব জিনিসপত্র বারবার ব্যবহার করবে, রিসাইকেল করে ব্যবহার করবে।
ইলেকট্রনিক্স জিনিসপত্র ব্যবহার না করলে বন্ধ রাখবে।
কোনো জিনিস অপচয় করবে না
ZERO WASTE
ময়লা আর্বজনা নির্দিস্ট জায়গায় ফেলবে।

এই যে ব্রতী আমরা তোমাকে খুঁজে হয়রান আর তুমি এখানে এসে ঘুমাচ্ছো ! ....
আরে এই তো আমার মা, আমাদের ক্যাম্প... মা....
এই দেখো তোমার চমক !
ওয়াও কেক...
একি বাবা তুমি কেক খেয়ে প্যাকেট টা এখানে ফেললে কেন? এটা সমুদ্রে গিয়ে পড়লে তো মাছেরা খাবার ভেবে এটাই খাবে...
দুঃখিত আমি এখনই এটা সঠিক জায়গায় ফেলছি...

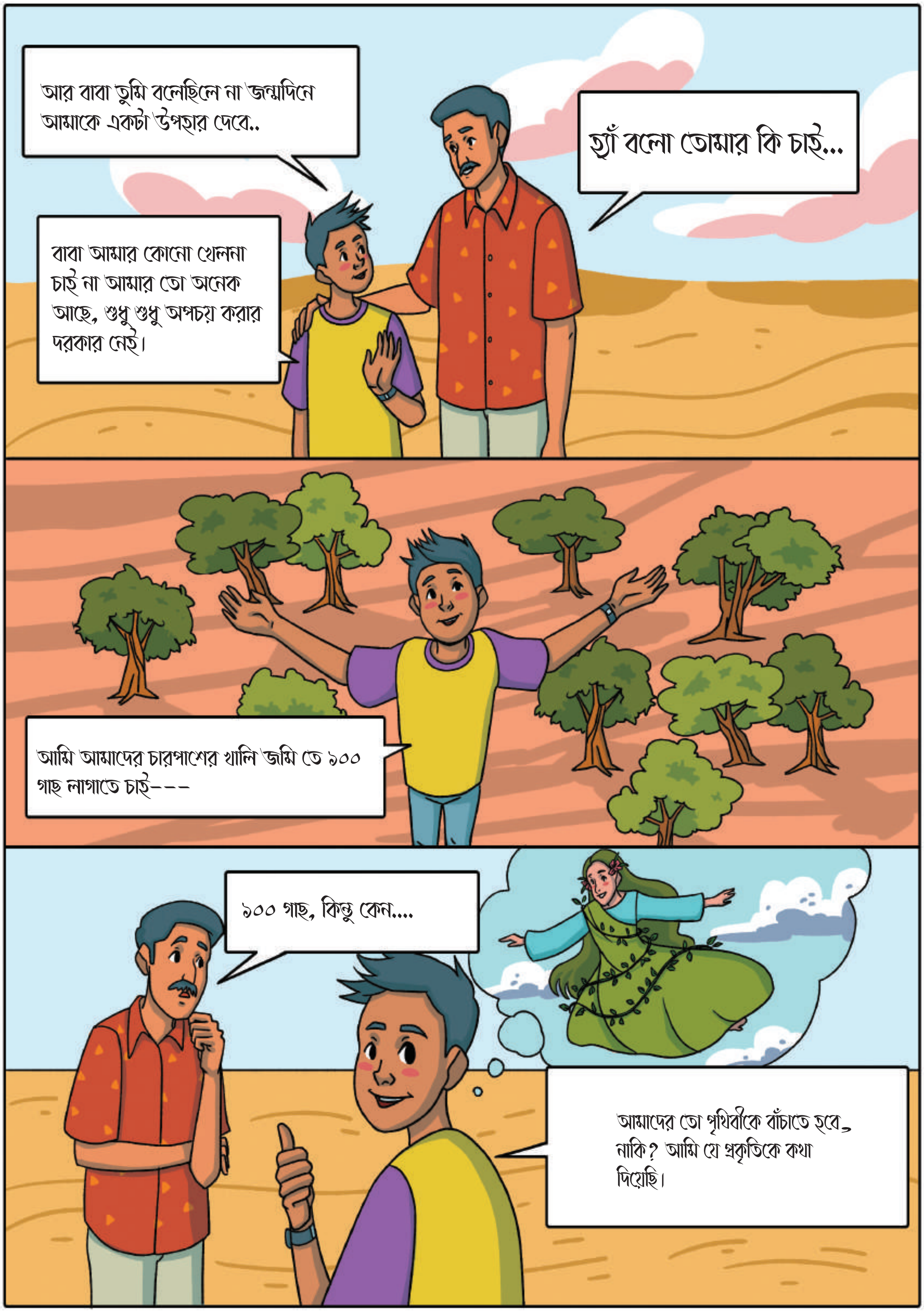

আর বাবা তুমি বলেছিলে না জন্মদিনে আমাকে একটা উপহার দেবে..
হ্যাঁ বলো তোমার কি চাই...
বাবা আমার কোনো খেলনা চাই না আমার তো অনেক আছে, শুধু শুধু অপচয় করার দরকার নেই।
আমি আমাদের চারপাশের খালি জমি তে ১০০ গাছ লাগাতে চাই---
১০০ গাছ, কিন্তু কেন....
আমাদের তো পৃথিবীকে বাঁচাতে হবে, নাকি? আমি যে প্রকৃতিকে কথা দিয়েছি।

রনি বললো, ভালো, তবে সত্যিই যদি এভাবে গ্রিণ হাউজ গ্যাস বেড়ে যায় তাহলে তো ভয়ংকর অবস্থা হবে।

মিলি বললো, শুধু কি তাই পৃথিবীর দূষণ ও তো বেড়ে গেছে!

রিমি বললো, আপা কমিক্সটা পড়ে তো অনেক কিছু জানতে পারলাম, কিন্তু পৃথিবীর জন্যে খুব চিন্তা হচ্ছে।

খুশি আপা বললেন হ্যা কমিক্সে পৃথিবী নষ্ট হওয়ার অনেক কারণ আমরা দেখেছি । চলো এখন আমরা এসব বিষয়ে যা যা জানতে পেরেছি তা ছকে পূরণ করে ফেলি।

তখন ওরা দলে ভাগ হয়ে পৃথিবী নষ্ট হওয়ার কারণ এবং সেগুলো কেন হলো তা খুঁজে বের করে ছক পূরণ করলো এবং বিষয়গুলো ব্যাখ্যাসহ উপস্থাপন করলো--

দূষণ	গ্রিনহাউস ইফেক্ট	গ্লোবাল ওয়ার্মিং	জলবায়ু পরিবর্তন
১.	১.	১.	১.
২.	২.	২.	২.
৩.	৩.	৩.	৩.
....	....	....	....

কাজ শেষে মিলি বললো, খুব ভালো হলো যে আমরা পৃথিবীর জন্যে যা ভালো নয় তা চিহ্নিত করতে পেরেছি।

টিনা বললো, গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর ফলে তো মেরু অঞ্চলের বরফ খুব দ্রুত গলে যাচ্ছে, তাহলে তো ওখানকার প্রাণিদের বেঁচে থাকা কষ্টের হয়ে পড়ছে।

সাকিব বললো, আমরা তো পরীক্ষা করে দেখেছিলাম যেখানে গাছ ছিল সেখানে বরফ গলতে বেশি সময় লেগেছিল।

মিলি বললো, তা তো ঠিক কিন্তু আমরা মানুষরা তো দিন দিন কারণে অকারণে অনেক গাছ কেটে ফেলছি।

রিমি বললো ইশ আমরা মানুষরা কেন যে এত খারাপ কাজ করি!

খুশি আপা বললেন কিন্তু আমরা মানুষরাই তো আবার ভালো কাজের মাধ্যমে পৃথিবীকে ভালো রাখতে পারি— নাকি! সবাই বললো ঠিক ঠিক।

প্রাকৃতিক কাঠামোর পরিবর্তনে সামাজিক জীবনে প্রভাব

আজ খুশি আপা ক্লাসে আসার পরে সাকিব বলল, আপা আমরা তো দেখলাম আমাদের দ্বারা প্রকৃতির কত কত ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে। এভাবে যদি প্রকৃতির সব পাল্টে যেতে থাকে, তাহলে তো আমাদের জীবনেও তার বড় ধরনের প্রভাব পড়তে পারে-তাই না?

মিলি বলল, এ ব্যাপারটা তো আমরা ‘শ্যামলী’ গল্পেই দেখেছিলাম।

খুশি আপা বললেন, ঠিক তাই, আচ্ছা চলো তো দেখি আরেকবার শ্যামলী গ্রামে প্রকৃতির কোন কোন পরিবর্তনে মানুষের জীবনে ঠিক কী কী প্রভাব পড়েছিলো।

তখন তারা দলে ভাগ হয়ে পরিবর্তনের প্রভাবগুলো খুঁজে বের করল।

এরপর খুশি আপা বললেন, আমরা তো সবাই নদী দেখেছি তাই না? আচ্ছা নদীর ধারে কী কী থাকতে দেখেছ তোমরা?

শিমুল বলল, আপা আমার মামার বাড়ির পাশে একটা নদী আছে, সেই নদীর ধারে ধানের জমি ছিল, আবার কিছু দূরে কয়েকটা বাড়িও ছিল।

রিমি বলল, আপা আমরা ছুটিতে গ্রামে গিয়েছিলাম বেড়াতে। ওখানে নদীর পাশে কৃষিজমি এবং তার একটু পাশে একটা ইটভাটা দেখেছি।

খুশি আপা বললেন, আচ্ছা তোমাদের সবার দেখা নদীর ধারণা তো পেলাম। এখন যদি বলি তোমাকে একটা নদী বানাতে, যার চারপাশে তোমরা তোমাদের ইচ্ছেমতো ফসলের জমি, শহর, কারখানা, ঘর-বাড়ি প্রভৃতি স্থান বসাতে পারবে, তাহলে কেমন হবে বলোতো?

সবাই আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল।

রিভার পাজল তৈরির নিয়ম

খুশি আপা তখন তাদের ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে যেতে বললেন। তারপর বললেন, সবার বইয়ের শেষে পরিশিষ্ট অংশে রিভার পাজল সংযুক্ত আছে। সেখান থেকে কাঁচি দিয়ে পাজল এর পৃষ্ঠা দু’টি কেটে আলাদা করে নেই। তারপর ছবিতে যে চারকোনা বক্স এর ভিতর টুকরো টুকরো ছবি রয়েছে, সেই ছবিগুলো কেটে ছোট ছোট ছবিগুলো আলাদা করে ফেলি। তারপর বললেন, প্রতিটি দল ‘উৎস’ অংশটি, একটি নদীর শুরুতে, অর্থাৎ তাদের ব্যবহৃত ছক পেপারের সবচেয়ে উপরের দিকে এবং ‘মুখ’ অংশটি, নদীর শেষ, যা ছক পেপারের নিচের দিকে রাখবে।

তখন তারা দলীয়ভাবে প্রতিটি দল একটি করে নদীর গতিপথ বানালো। বানানো শেষ হলে টেপ দিয়ে ছক পেপারে তাদের নদীটিকে আটকে দিল এবং পাশে লিখল তাদের নদীর পাশে তারা কী কী জিনিস/স্থানের অবস্থান চিহ্নিত করেছে।

চলো আমরাও ওদের মতো করে দলে ভাগ হয়ে পাজলের সাহায্যে আমাদের নদী বানাই।

স্থানীয় পর্যায়ে প্রভাব

খুশি আপা প্রত্যেকের নদী দেখে সবাইকে হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানালেন। তোমরা প্রত্যেকে খুব সুন্দর নদী বানিয়েছ, এখন ভাবো তো এখানে যদি নদীটি না থাকে, নদীর গতিপথের কোনো পরিবর্তন হয়, নদীর পাড় ভাঙা শুরু হয় তাহলে কেমন হবে?

সবাই তো খুব চিন্তায় পড়ে গেল!

তখন খুশি আপা তাদের কিছু ছবি দেখালেন।

তোমাদের বানানো নদীর সঙ্গে এ রকম আরও কয়েকটি ছবি দেখো। নদীর এরকম হবার কোনো কারণ খুঁজে পাচ্ছ কি?

ফাতেমা বলল, আপা নদী যদি চলার পথে কোনো বাধা পায়, তাহলে তার গতিপথ পাল্টে ফেলতে পারে।

সাকিব বলল, হ্যাঁ যেমন যদি নদীতে বাঁধ দিই। আমরা তো আমাদের বানানো নদীতে একটা বাঁধ দিয়েছিলাম আহা কি যে ভুল হয়ে গেল।

খুশি আপা বললেন, না সাকিব তুমি ভুল করোনি, আমরা আমাদের প্রয়োজনে অনেক সময় নদীতে বাঁধ দিই কিন্তু সেটার পরিকল্পনা সঠিকভাবে করতে হবে।

রনি বলল, আপা নদীটি যদি শুকিয়ে যায়, তাহলে তো আশপাশের কৃষিকাজের পানির সমস্যা হবে।

খুশি আপা বললেন, শুধু কি তাই! আচ্ছা চলো, তাহলে আমরা খুঁজে বের করি কী কী প্রভাব পড়তে পারে। তখন তারা দলীয়ভাবে ছক আকারে নদীভাঙন, নদীর শুকিয়ে যাওয়া এবং গতিপথ পরিবর্তনের কারণ ও প্রভাব অনুসন্ধান করে বের করল।

নদীর অবস্থা	কারণ	সামাজিক জীবনে প্রভাব
নদীভাঙন	১. ২. ৩. ৪.......	১. ২. ৩. ৪.......
নদীর শুকিয়ে যাওয়া	১. ২. ৩. ৪.......	১. ২. ৩. ৪.......
গতিপথ পরিবর্তন	১. ২. ৩. ৪.......	১. ২. ৩. ৪.......

চলো, আমরাও ওদের মতো করে দলে ভাগ হয়ে
নদীর পরিবর্তনের কারণ ও প্রভাব ছকে পূরণ করি।

প্রাচীন মানুষের জীবনে নদীর প্রভাব

আজ ক্লাসের শুরুতে সৃজিতা বলল, আপা কাল বাসায় গিয়ে যখন আমাদের নদী নিয়ে অনুসন্ধানের কথা বলছিলাম, তখন আমাদের সাহায্যকর্মী খালা বলল তার জীবনেও এমন ঘটনা ঘটেছে।

খালা বলল, তাদের বাড়ি ছিল যমুনা নদীর পাড়ের একটি গ্রামে। তাদের বাড়ির একটু দূরে ছিল যমুনা নদী। তাদের পুকুর ভরা মাছ ছিল, অনেক ধানের জমি ছিল। তাদের অনেক ধান হতো, ফসলের জমিতে নানা ধরনের ফসল হতো। খালা বলল যে নদীর ধারের জমি নাকি অনেক উর্বর হয়। অনেক ভালো কৃষিকাজ করা যায় এধরণের জমিতে। কিন্তু নদীভাঙনে তাদের আজ আর ঘরবাড়ি জমি পুকুর কিছুই নেই। তার বর এখন শহরে রিকশা চালায় আর সে আমাদের বাসায় সাহায্যকারী হিসেবে কাজ করছে। জানেন আপা, খালা কথাগুলো বলতে বলতে কান্না করছিল। আমার খুব খারাপ লাগছিল।

খুশি আপা বললেন, আহারে আমাদেরও সবার খুব খারাপ লাগছে তোমার খালার জীবনের কথা শুনে। তোমরা জানো এরকম ঘটনা কিন্তু শুধু সৃজিতার খালার জীবনে ঘটেছে তাই নয়, এরকম বহু মানুষ আছে যাদের জীবনের কাহিনি সৃজিতার খালার সঙ্গে মিলে যাবে।

শিহান বললো, আচ্ছা প্রাচীনকালেও তো এখনকার চেয়েও অনেক বড় বড় নদী ছিল। আর প্রাচীনকালে যেহেতু নদীপথই ছিল, যাতায়াতের অন্যতম মাধ্যম, তাই নিশ্চয় সেখানের মানুষের জীবনেও নদীর অনেক প্রভাব ছিল তাই না?

সাকিব বলল, হ্যাঁ আমি **ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান (অনুসন্ধানী পাঠ)** বইতে পড়েছি মিসরীয় সভ্যতা নীল নদকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল।

রনি বলল, চলো তাহলে আমরা অনুসন্ধান করে খুঁজে বের করি প্রাচীন মানুষের নদীকেন্দ্রিক সভ্যতার ইতিহাস।

খুশি আপা বললেন, বেশ বেশ এমন অনুসন্ধানী মনই তো চাই।

টিংকু বলল, আমরা আমাদের লাইব্রেরীতে তো দেখতে পারি, এ সম্পর্কিত কোনো বই আছে কিনা।

খুশি আপা বললেন, হ্যাঁ তোমরা এ কাজটি করার জন্য **ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান (অনুসন্ধানী পাঠ)** সাহায্য নিতে পারো আবার বড়দের সাহায্যে ইন্টারনেটের মাধ্যমেও তথ্য সংগ্রহ করতে পারো।

ওরা তখন দলীয় আলোচনা ও বুকলেটের মাধ্যমে প্রাচীন মানুষের নদীকেন্দ্রিক সভ্যতার ইতিহাস অনুসন্ধান করে পৃথিবীর মানচিত্রে তা উপস্থাপন করল এবং সেসকল সভ্যতার দুটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য লিখল যা নদীর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল।

চলো আমরাও ওদের মতো করে প্রাচীন মানুষের নদীকেন্দ্রিক সভ্যতার ইতিহাস অনুসন্ধান করে পৃথিবীর মানচিত্রে তা চিহ্নিত করি এবং সেসব সভ্যতার ২টি বিশেষ বৈশিষ্ট্য লিখি যা নদী দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল।

খুশি আপা তাদের কাজের জন্য সবাইকে অভিনন্দন জানালেন।

মিলি বলল আমরা দেখলাম যখন উপযুক্ত পরিবেশের অভাব হয়েছে তখনই প্রাচীন সভ্যতাগুলো সেখান থেকে স্থানান্তরিত হয়েছে। আবার কিছু কিছু সভ্যতা বিলীনও হয়ে গেছে।

রনি বলল, প্রাচীনকালে মানুষ ছিল কম এবং বসবাসের জায়গা ছিল অনেক, আবার তাদের স্থানান্তরিত হতে কোনো অনুমতি যেমন পাসপোর্ট বা ভিসার প্রয়োজন ছিল না, তাই তো তারা নিজেদের পছন্দমতো জায়গা খোঁজার পথ পেয়েছিল। কিন্তু এখন তো পৃথিবীতে মানুষের তুলনায় বসবাসযোগ্য জায়গার পরিমাণ অনেক কম। আবার আমরা ইচ্ছেমতো কোনো জায়গায় গিয়ে বসবাসও করতে পারবনা। তাহলে এখন যদি আমরা নিজেদের বসবাসের জায়গা খারাপ কার্যক্রমের দ্বারা নষ্ট করে ফেলি, তাহলে কী হবে?

সাকিব বলল, তাহলে তো আমাদেরও বিলুপ্ত হয়ে যেতে হবে। কিন্তু আমরা যদি আমাদের বসবাসের জায়গা ভালো রাখতে চেষ্টা করি, তাহলে তো দুশ্চিন্তা কিছুটা কমানো যেতে পারে, তাই না?

খুশি আপা বললেন এই তো বিবেচক মানুষের মতো কথা। প্রকৃতির যেকোনো কাঠামো যদি পরিবর্তন হয় তার প্রভাব আমাদের সামাজিক জীবনে অবশ্যই পড়বে। তবে এসব কাজ করতে গেলে বড়দের একটু সাহায্য লাগবে।

রিমিতা বলল, আপা আমাদের প্রায় সবার বাসায় বা আমাদের এলাকায়ও তো অনেক বয়স্ক মানুষ আছেন, যারা এধরনের কাজে আমাদের সাহায্য করতে পারেন।

মিলি বলল, আর যেহেতু আমরা প্রাচীন সভ্যতা নিয়ে অনুসন্ধান করছি, তাই এলাকার প্রাচীন মানুষদেরই এ কাজে আনা ভালো হবে, কারণ তাদের অভিজ্ঞতাও সবার থেকে বেশি। সবাই আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল।

খুশি আপা বললেন, বাহ তাহলে তো খুবই ভালো হয়। তাহলে তোমরা আলোচনা করে বের করো তোমাদের এলাকাকে ভালো রাখার মতো তোমরা কোন কোন কাজ করতে চাও। তখন তারা দলীয় আলোচনা করে কয়েকটি কাজের তালিকা বানালো যা তারা এলাকার বয়স্ক মানুষদের সাহায্য নিয়ে করতে চায়।

এলাকাকে ভালো রাখার কাজের তালিকা
১. এলাকার রাস্তাঘাট পরিষ্কার রাখা
২. এলাকায় ডাস্টবিনের ব্যবহারে মানুষকে সচেতন করা
৩. ....

চলো, আমরাও ওদের মতো করে আমাদের এলাকা ভালো রাখার কিছু কাজের তালিকা তৈরি করি। যা এলাকার প্রবীণ মানুষের সহায়তায় করতে পারি।

সবাই মিলে প্রতিজ্ঞা করল ওরা এমন কোনো কাজ করবে না যাতে ভবিষ্যতে আমাদের পৃথিবী আমাদেরই বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়ে। ওরা শুরু করবে এলাকার ছোটো ছোটো কাজ দিয়ে, কিন্তু এমন ছোটো ছোটো কাজ একত্র হয়ে পুরো পৃথিবীকে ভালো রাখার জন্য ভূমিকা রাখবে।

সমাজ ও সম্পদের কথা

ক্লাসের শুরুতেই খুশি আপা সবার খোঁজ-খবর নিলেন। তারপর বললেন, চলো আজও কিছু ছবি নিয়ে কাজ শুরু করি। এসো সবাই মিলে নিচের ছবিগুলো দেখি এবং বোঝার চেষ্টা করি।

এখানে নিচের জিনিসগুলোর ছবি হবে

পানি

প্রাকৃতিক গ্যাস

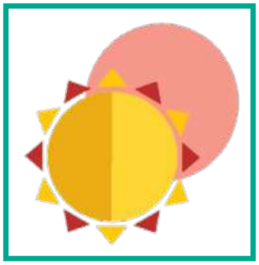
সূর্যের আলো

হাতুড়ি

টাকা

গাছপালা

কয়লা

কৃষক

বাবুর্চি

যাত্রীবাহি বাস

শিক্ষক

ট্রাকটর

সবার ছবি দেখা শেষ হলে খুশি আপা বললেন, এবার বলো উপরের এই ছবিগুলোকে একসঙ্গে আমরা কি বলতে পারি?

অন্বেষা: ছবিতে দেখানো মানুষ আর অন্য সবই আমাদের কোন না কোন ভাবে কাজে লাগেন!

আনুই: এই মানুষগুলোর শ্রম, অন্যান উপকরণ এবং বাকী জিনিসগুলো ব্যবহার করে আমরা অনেক কিছু বানাতে পারি।

দীপঙ্কর: এগুলো ব্যবহার করে আমরা অনেক সেবা পেয়ে থাকি!

খুশি আপা বললেন, বাহ্ ! তোমরা দেখি এদের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলোই বলে দিলে। ঠিকই বলেছ তোমরা। এদের সবারই এই বৈশিষ্ট্যগুলো রয়েছে। আর এজন্যই এদেরকে এক কথায় আমরা সম্পদ বলে থাকি। আমরা আমাদের চারপাশে যা কিছুই দেখি না কেন, সবই আমাদের সম্পদ। কেননা,

> কোনো জিনিস তৈরি করতে বা কোনো সেবা দেওয়ার জন্য যা কিছুই মানুষ ও প্রকৃতির কাজে লাগে তা-ই সম্পদ।

এবার চলো, আমরা দলে বিভক্ত হয়ে উপরের ছবিগুলোকে ধরন অনুযায়ী আলাদা করে নিচের টেবিলের তিনটি কলামে বিভক্ত করি।

তারপর সবাই যার যার দলে বিভক্ত হয়ে উপরের ছবিগুলো থেকে একই ধরনের সম্পদগুলো আলাদা আলাদা কলামে নতুন করে সাজালো। সবগুলো দল উপস্থাপনা করার পর, সবার সাজানো একসঙ্গে মিলিয়ে নিচের টেবিলের মতো চেহারা দাঁড়াল।

পানি	কৃষক	হাতুড়ি
কয়লা	নার্স	পাথর
প্রাকৃতিক গ্যাস	শিক্ষক	যাত্রীবাহী বাস

খুশি আপা খুব খুশি হলেন সবার কাজ দেখে। বললেন, খেয়াল করে দেখ আমরা ছবির সম্পদগুলোকে তিনটি ধরণ অনুযায়ী তিনটি ভাগেই ভাগ করতে পেরেছি। প্রথম কলামে আমরা পেয়েছি পানি, সূর্যের আলো, গাছপালা, কয়লা ও স্বর্ণ। কেউ কি বলতে পারো, এদের মাঝে মিলের জায়গাটি কোথায়?

অন্বেষা বলল কারণ, এগুলো সবই সরাসরি প্রকৃতি থেকে পাওয়া যায়, কোন মানুষই এগুলো তৈরি করে নি।

যে সম্পদ কোনো মানুষ তৈরি করে না বরং সরাসরি প্রকৃতি থেকে পাওয়া যায় তাকে প্রাকৃতিক সম্পদ বলে । যেমন-পানি, বাতাস, সূর্যের আলো, তামা, লোহা প্রভৃতি।

আচ্ছা তোমরা কী আরো কিছু প্রাকৃতিক সম্পদের নাম বলতে পারো? তখন সবাই চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদের উদাহরণ খুঁজে বের করলো।

চলো আমরাও ওদের মতো করে চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা প্রাকৃতিক সম্পদের উদাহরণ খুঁজে বের করি!! এবং নিচের ছকটি পূরণ করি

ক্রম	নাম	কোথায় পাওয়া যায়
১		
২		
৩		

মিলি বলল, দ্বিতীয় কলামে আমরা পেয়েছি, কৃষক, বাবুর্চি এবং শিক্ষক। এরা সকলেই মানুষ। সমাজের মানুষকে কোনো না কোনো সেবা দিয়ে থাকেন । তাই এরা সবাই একই কলামে স্থান পেয়েছেন। এরা সবাই মানবসম্পদের অন্তর্ভুক্ত।

সাধারণত যারা বিভিন্ন ধরনের জিনিস তৈরি বা উৎপাদন করে বা সেবা প্রদান করে তারা মানব সম্পদের অন্তর্ভুক্ত।

এরপর সবাই মিলে মানবসম্পদের আরও কিছু উদাহরণ খুঁজে বের করলো।

চলো আমরাও ওদের মতো করে চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা প্রাকৃতিক সম্পদের উদাহরণ খুঁজে বের করি ও নিচের ছক পূরণ করি।

ক্রম	মানব সম্পদের নাম	কী সেবা পাওয়া যায়
১		
২		
৩		

সুভাষ এবার তৃতীয় কলামের কথা বলতে গিয়ে দেখালো যে সেখানে জায়গা পেয়েছে হাতুড়ি, ট্রাকটর আর যাত্রীবাহী বাস। বললো যে , এগুলো মানুষ বিভিন্ন জিনিস তৈরি করতে বা সেবা প্রদান করার জন্য ব্যবহার করে থাকে।

খুশি আপা বললেন এ ধরণের সম্পদকে সাধারণত রূপান্তরিত সম্পদ বলা হয়। তাহলে এবার রূপান্তরিত সম্পদের আরো কিছু উদাহরণ আমরা খুঁজে বের করার চেষ্টা করবো। সবাই মিলে রূপান্তরিত সম্পদের আরো কিছু উদাহরণ ওরা বের করলো।

> সাধারণত মানুষ বিভিন্ন ধরনের কাজ করতে, জিনিস তৈরিতে ও সেবা প্রদান করার জন্য যে সকল জিনিস/দ্রব্য, যন্ত্রপাতি বা হাতিয়ার ব্যবহার করে, তাদের রূপান্তরিত সম্পদ বলা হয়।

রূপান্তরিত সম্পদের উদাহরণ খুজে বের করি ও নিচের সারণি পূরণ করি।

ক্রম	রূপান্তরিত মানব সম্পদের নাম	কী সেবা পাওয়া যায়
১		
২		
৩		

এরপর ওরা মজার একটি খেলা খেলল। খুশি আপা আগে থেকেই তৈরি করা একটি তালিকা বের করে বললেন এই তালিকাটিতে ২০টি সম্পদের নাম আছে। তোমরা প্রথমে একেকটি দলে ছয় জন করে ভাগ হয়ে যাও। সবাই উত্তেজনার সঙ্গে নিয়ম মেনে দলে বিভক্ত হয়ে গেল। তখন খুশি আপা বললেন, আগে খেলার নিয়মগুলো সবাই ভালো করে শোনো।

- আমি প্রতিবার একটি করে সম্পদের নাম বলব
- যে দল সম্পদটি কোন ধরনের সম্পদ অর্থাৎ প্রাকৃতিক না রূপান্তরিত না মানব সম্পদ সেটা নিশ্চিতভাবে জানে, তারা হাত তুলবে।
- যে দল আগে হাত তুলবে, তারা উত্তর দেবার সুযোগ পাবে। যদি সঠিক উত্তর দিতে পারে, তাহলে প্রতিটি সঠিক উত্তরের জন্য ৫ নম্বর করে পাবে।
- আর যদি ভুল উত্তর দেয়, তাহলে দ্বিতীয় যে দল হাত তুলেছে সে দল বলার সুযোগ পাবে, যদি তারাও না পারে তাহলে তার পরের দল । যদি কোনো দলই না পারে তাহলে সে নামটি বাদ দিয়ে পরবর্তী নাম নিয়ে আবার খেলা শুরু হবে। আর খেলা শেষে আমি তোমাদের যেসব সম্পদের ধরন কেউ বলতে পারোনি তা বলে দেব।
- যেসব সম্পদের নাম নিয়ে খেলা হবে তার সঠিক ধরন অনুযায়ী তোমরা প্রতিটি দল নিচের সারণিতে নামগুলো লিখবে। যে সব সম্পদের সঠিক উত্তর দিতে পারবে সে সব সম্পদের পাশে নম্বরের ঘরে নম্বর বসাবে ও আমার কাছে জমা দেবে।
- যে দল সবচেয়ে বেশি নম্বর পাবে, তারা বিজয়ী হবে।

প্রাকৃতিক সম্পদ	রূপান্তরিত সম্পদ	মানব সম্পদ	প্রাপ্ত নম্বর
		মোট=	

তারপর খুশি আপা বললেন, আচ্ছা চলো প্রাকৃতিক সম্পদের তালিকাটা আবার দেখি। আচ্ছা বলোতো, এই তালিকায় সব প্রাকৃতিক সম্পদই কি একই রকম ? না তাদের মাঝে কোনো পার্থক্য আছে?

সবাই চুপ!

খুশি আপা বললেন, আচ্ছা তোমাদের আরও একটু চিন্তার খোরাক দিচ্ছি! ভেবে দেখ তো ব্যবহার করার পর এগুলোর সবই কি একই পরিণতি লাভ করে? নাকি একেকটির পরিণীতি একেক রকম?

সবার আগে নন্দিনী হাত তুলে বলল, আমি জানি, পার্থক্য আছে! যেমন, পানি, বাতাস, সূর্যের আলো এরকম প্রাকৃতিক সম্পদগুলো ব্যবহার করলেও শেষ হয় না! প্রকৃতি আবার এগুলো তৈরি করে। কিন্তু কয়লা, লোহা, স্বর্ণ, জ্বালানি তেল এগুলো একবার ব্যবহার করলে চিরতরে শেষ হয়ে যায়। প্রকৃতি আর তাদের ফিরিয়ে আনে না!

খুশি আপা বললেন, একদম ঠিক বলেছ। পৃথিবীর সকল প্রাকৃতিক সম্পদকেই আসলে এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

যে সম্পদগুলো বহু ব্যবহার করলেও শেষ হয় না বা কোনো একজন ব্যবহারকারী মানুষের জীবদ্দশাতেই প্রকৃতি আবার তাদের তৈরি করে, এগুলোর পরিমাণ আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে পারে, সেগুলোকে বলে নবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ। যেমন : বাতাস, সূর্যের আলো প্রভৃতি।

তারপর বললেন, এখন খুব সহজেই তোমরা অনুমান করতে পারছ যে,

অনেক প্রাকৃতিক সম্পদ আছে যেগুলো একবার ব্যবহার করলে চিরতরে ফুরিয়ে যায়, প্রকৃতি সাধারণত আবার তাদের তৈরি করতে পারে না, সেসব প্রাকৃতিক সম্পদকে অনবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ বলে । যেমন: কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস, জ্বালানি তেল, স্বর্ণ, তামা প্রভৃতি।

তবে একটা বিষয় আমরা মনে রাখবো-

কিছু প্রাকৃতিক সম্পদ আছে যা সাধারণভাবে দেখলে মনে হতে পারে নবায়ণযোগ্য কিন্তু আসলে নবায়নযোগ্য নয়। কারণ একবার ব্যবহারের পর প্রকৃতি আর তা তৈরি করতে পারে না। তবে মাটির নীচে যে পানির মজুদ আছে তা পুনরায় মজুদ করতে পারলেও একজন মানুষের জীবদ্দশাতেই আগের অবস্থায় ফিরে আসে না। নবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ যদি এমন মাত্রায় ব্যবহার করা হয় যে তা পুনরায় আগের অবস্থায় ফিরে যেতে অনেক দীর্ঘ সময় প্রয়োজন হয় তখন ঐ প্রাকৃতিক সম্পদ অনবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদে পরিণত হয়। যেমন- পানি গাছপালা ইত্যাদি।

খুশি আপা, আচ্ছা তাহলে এখন আমরা সবাই জানলাম যে, আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে, যা কিছু আমরা ব্যবহার করি, তার সবই আমাদের সম্পদ-হয় প্রাকৃতিক, না হয় রূপান্তরিত অথবা মানব সম্পদ, না হয় সম্পদ ব্যবহার করে এসব তৈরি করা।

বাজার, দ্রব্য, পণ্য

এবার বলত ! তোমাদের মাঝে কে কে বাজারে গিয়েছো?

দেখা গেল ক্লাসের অধিকাংশ ছেলেমেয়েই কোনো না কোনো সময় বাজারে গিয়েছে। খুশি আপা বললেন, খুব ভালো! আর যাদের এখনো বাজারে যাওয়া হয়ে ওঠেনি, তারা অবশ্যই পরিবারের কারও সঙ্গে বাজারে ঘুরে আসবে। আচ্ছা, এবার বলো তো, বাজারে বা দোকানে কী হয়?

নিসর্গ বলল, অনেক জিনিস সাজানো থাকে বিক্রির জন্য। আর মানুষ বা ক্রেতারা এসে টাকার বিনিময়ে সেসব জিনিস কিনে নিয়ে যায়।

খুশি আপা, ভালো বলেছো। তাহলে এবার বলো তো সশরীর বাজারে যাওয়া ছাড়াই বাড়িতে বসে থেকেই কি কোথাও থেকে বিভিন্ন জিনিস কিনতে পাওয়া যায়? অন্বেষা বলল, যায় বৈকি! এই তো সেদিন আমার কাকা অনলাইনে ঘরে বসেই শার্ট কিনল!

ঠিকই বলেছ, তাহলে জিনিস কেনাবেচার জন্য বা বাজারে জন্য কোনো নির্দিষ্ট জায়গার প্রয়োজন হয় না। জায়গা ছাড়াও ক্রেতা থাকলেই যে কোন জায়গা থেকে কেনাবেচা হতে পারে। এ জন্যই অর্থনীতির ভাষায়-

কোন স্থানে কোন জিনিস কেনার মতো টাকা আছে এমন ক্রেতার সংখ্যাকে ঐ স্থানে ঐ জিনিসের বাজার বলে।

চিত্র: পণ্য

আচ্ছা এই সুযোগে তোমাদের মজার একটা বিষয় জানিয়ে রাখি।

বাজারে যেসব জিনিস বা দ্রব্য বিক্রির জন্য সাজিয়ে রাখা হয়, তাকে বলা হয় পণ্য। কাজেই আমরা বাজারে, দোকানে, অনলাইনে যেখানেই হোক না কেন, বিক্রির জন্য যেসব জিনিস বা দ্রব্য দেখি, তা-ই পণ্য। আর মানুষ যখন কোনো কিছু নিজে ব্যবহার করার জন্য উৎপাদন করে তাকে দ্রব্য বলে। একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হতে পারে। ধরো একজন কৃষক যখন নিজে খাওয়ার জন্য চাল উৎপাদন করে, তখন সেই চাল একটি দ্রব্য। কিন্তু কৃষক যখন বিক্রির উদ্দেশ্যে চাল উৎপাদন করে বা তার উৎপাদিত চাল বিক্রির উদ্দেশ্যে বাজারে নিয়ে যায়, তখন তাকে পণ্য বলে।

অন্যদিকে, মানুষ যখন অন্য মানুষের জন্য বিভিন্ন কাজ করে দেয়, তখন সেসব কাজকে সেবা বলা হয়। সেবা অর্থের বিনিময়েও হতে পারে। মা যখন ঘরে আমাদের খাবার তৈরির জন্য রান্না করেন, সেটা একটি সেবা। কিন্তু রেস্টুরেন্টে যখন বাবুর্চি খাবার তৈরি করার জন্য রান্না করেন সেটা সেবা হলেও তিনি অর্থের বিনিময়ে সেবা বিক্রি করেন। এখানে সবাই একটা বিষয় খেয়াল করো, মা সারা দিনে যেসব কাজ করেন, তার সবই সেবা। কিন্তু তিনি আমাদের কাছ থেকে এসব সেবার জন্য কোনো অর্থ বা টাকা গ্রহণ করেন না। কারণ, তিনি আমাদের ভালোবাসেন। তোমরা কি কখনো ভেবে দেখেছ প্রতিদিন আমাদের মায়েরা যেসব সেবা দিয়ে থাকেন, তা যদি অর্থমূল্যে রূপান্তর করা হয় তাহলে টাকার পরিমাণ কী হতে পারে?

চিত্র: সেবা

চিত্র: দ্রব্য

এবার খুশি আপা একটু থেমে বললেন, এখন বলো তো যে পোশাক পরে এসেছ সেটা কি দ্রব্য না পণ্য?

আনাই মোগিনী সবার আগে হাত তুলে বলল, আমাদের পোশাক একটি দ্রব্য ! কারণ আমরা এগুলো বিক্রি করছি না, নিজেরা ব্যবহার করছি। কিন্তু আমরা এগুলো কেনার সময় এগুলো যখন দোকানে ছিল, তখন এগুলো পণ্য ছিল।

খুশি আপা ভীষণ আনন্দিত হয়ে বললেন, খুব সুন্দর হয়েছে তোমার উত্তর। এরপর সবাই খুশি আপার সঙ্গে চারপাশের বিভিন্ন জিনিস থেকে কিছু জিনিস বাছাই করে তার মধ্যে কোনটি দ্রব্য, কোনটি সেবা আর কোনটি পণ্য তা আলাদা করে শনাক্ত করার খেলা খেলল।

চলো আমরাও নিচের সারণি ব্যবহার করে চারপাশের বিভিন্ন জিনিসের তালিকা তৈরি করে সেগুলোর মধ্যে থেকে উপযুক্ত ঘরে টিক চিহ্ন দিয়ে কোনটি সেবা, কোনটি পণ্য আর কোনটি দ্রব্য তা আলাদা করি।

ক্রম	জিনিসের নাম	দ্রব্য	পণ্য	সেবা
১				
২				
৩				
৪				
৫				
৬				
৭				
৮				
৯				

এরপর খুশি আপা বললেন, আচ্ছা এবার চলো আমরা আরেকটি কাজ করি! চলো আমরা আবারো দলে বসে প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে রাতে ঘুমানো পর্যন্ত কী কী দ্রব্য ও পণ্য ব্যবহার করি এবং এগুলো কোথায় তৈরি হয় তার একটা আনুমানিক তালিকা তৈরি করি! তখন সবাই নিচের সারণি ব্যবহার করে তালিকাটি তৈরি করল

ক্রম	পণ্য/দ্রব্যের নাম	কোথায় তৈরি হয়
১	বিস্কুট	কারখানা
২	ডিম	মুরগির খামার
৩		
৪		
৫		

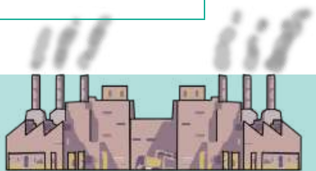

তারপর প্রতিটি দল যার যার তালিকা উপস্থাপন করল।

> চলো আমরাও উপরের সারণির মত সারণি তৈরি করে আমাদের প্রতিদিনের ব্যবহৃত পণ্য/দ্রব্য ও সেগুলো কোথায় তৈরি হয়ে তার একটি তালিকা তৈরি করি ।

উপস্থাপনা শেষে খুশি আপা বললেন, দেখেছো আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহার্য অনেক পণ্য বা দ্রব্যই কারখানায় তৈরি হয়। তোমরা কি কখনো কোনো কারখানার ভেতরে গিয়ে কীভাবে সেখানে পণ্য বা দ্রব্য তৈরি হয় তা দেখেছ? কেমন হয় যদি আমরা অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে আমাদের কাছাকাছি কোনো একটি কারখানা পরিদর্শন করি?

সবাই সমস্বরে উল্লসিত স্বরে বলল-খুবই ভালো হয়!!

খুশি আপা তখন বললেন, ঠিক আছে তাহলে আগামী ক্লাসে প্রস্তুত হয়ে এসো, আমরা কারখানা পরিদর্শনে যাব। এরপর প্রস্তুতির জন্য খুশি আপা সবাইকে নিচে উল্লিখিত নির্দেশিকা অনুসারে প্রস্তুতি গ্রহণের পরামর্শ দিলেন।

১. সবার বাবা-মা বা অভিভাবকের স্বাক্ষর গ্রহণের জন্য একটি অনুমতি পত্র
২. কী কী করণীয় তার তালিকা
৩. নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশনা

আজ ক্লাসে খুশি আপা ছাড়াও আরো বেশ কয়েকজন শিক্ষক উপস্থিত আছেন। অভিভাবকদের মধ্যে যাদের আজ তেমন কোনো ব্যস্ততা নেই, তারাও এসেছেন। গত প্রায় এক সপ্তাহ ধরেই প্রস্তুতি চলছিল আজকের এই দিনটি সফল করার জন্য। এত আয়োজনের মূল কারণ হচ্ছে, আজ ষষ্ঠ শ্রেণির সবাই কারখানা পরিদর্শনে যাবে। যদিও সবার ইচ্ছা ছিল বড় কোনো একটা আইসক্রিম কারখানা পরিদর্শনে যাবার কিন্তু স্কুলের আশপাশে কোনো আইসক্রিম কারখানা নেই। যাতায়াতের খরচ, সময়, দূরত্ব, নিরাপত্তা এসব দিক বিবেচনা করে তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্কুলের পাশেই যে ইটভাটা আছে, সেখানেই তারা পরিদর্শনে যাবে।

খুশি আপা এক সপ্তাহ আগেই ক্লাসে এসে সবার সঙ্গে আলাপ করে যার যার এলাকা অনুযায়ী দলে ভাগ হতে সাহায্য করেছেন। আপার সহযোগিতায় সবাই যার যার এলাকা অনুযায়ী দলে বিভক্ত হয়েছে। তাঁর সহযোগিতায় তারা ছোট একটা কারখানা পরিদর্শনের প্রস্তুতি দল তৈরি করেছে। এ ছাড়াও খুশি আপা প্রধান শিক্ষকসহ কয়েকটি বিষয়ের আরও কয়েকজন শিক্ষকের সঙ্গে আলাপ করে তাঁদেরও সঙ্গে নিয়েছেন। এদিকে অনেক অভিভাবক যখন বলা হয়েছে, তখন তারাও সঙ্গী হতে চেয়েছেন।

নির্দিষ্ট সময়ে সবাই ইটের ভাটায় পৌছে গেল। ইটভাটা নিয়ে অনুসন্ধান করার জন্য ওরা আগে থেকেই এ বিষয়ে-

১. অনুসন্ধানের প্রশ্ন
২. অনুসন্ধানের পরিকল্পনা
৩. তথ্য সংগ্রহের পরিকল্পনা
৪. তথ্য সংগ্রহের জন্য সাক্ষাৎকার গ্রহণের প্রশ্নমালা ইত্যাদি তৈরি করে রেখেছিল। এ কাজে তারা 'বিজ্ঞানের চোখ দিয়ে চারপাশ দেখি' অধ্যায়ের সহযোগিতা নিয়েছিল।

অনুসন্ধানের প্রশ্ন:

আমাদের চারপাশে যে সকল জিনিস দেখি সেগুলো কোথায় ও কীভাবে তৈরি করা হয় এবং পরিবেশের সঙ্গে এগুলোর সম্পর্ক কেমন?

তথ্য সংগ্রহ (পর্যবেক্ষণ ও সাক্ষাৎকার):

কারখানায় কীভাবে বিভিন্ন জিনিস তৈরি বা উৎপাদন করা হয় সেটা পর্যবেক্ষণ করার জন্য তারা নিচের তৈরি ছক ব্যবহার করেছিল।

ক্রম	পর্যবেক্ষণের বিষয়	প্রাপ্ত তথ্য
১.	কারখানায় কীভাবে উৎপাদন হয়?	
২.	কারখানায় যে মানুষেরা কাজ করে, তাদের পরিচয় বা কী কাজ করে, তার বিবরণ?	
৩.	কারখানার জমি, ভবন/ছাউনি/যন্ত্রপাতি প্রভৃতির মালিক কে?	
৪.	মালিকের কাজ কী?	

ক্রম	পর্যবেক্ষণের বিষয়	প্রাপ্ত তথ্য
৫.	যারা কাজ করেন বা শ্রমিক, তাদের সঙ্গে ভবন/ছাউনি/ যন্ত্রপাতির কী সম্পর্ক?	
৬.	মালিক কারখানা থেকে কী পান?	
৭.	শ্রমিক কারখানা থেকে কি পায়?	
৮.	কারাখানার সঙ্গে যে সকল মানুষ নানাভাবে যুক্ত, তাদের পরস্পরের সম্পর্ক কী?	
৯.	কারখানায় উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত কাঁচামাল ও জ্বালানি হিসেবে কি ব্যবহার করা হয়?	
১০.	কাঁচামাল ও জ্বালানি কোথা থেকে সংগ্রহ করা হয়?	
১১.	কাঁচামাল ও জ্বালানি ব্যবহার করে কারখানায় কী কী তৈরি বা উৎপাদিত হয়?	
১২.	উৎপাদিত সব দ্রব্যই কি মানুষের কাজে লাগে?	
১৩.	উৎপাদিত দ্রব্য ও পণ্য কোথায় যায়?	
১৪.	কারখানাটির সঙ্গে আশপাশের মানুষ, পশুপাখি বা পরিবেশের সম্পর্ক কী ধরণের ?	
১৫.	কারাখানাটি কি আশপাশের পরিবেশকে মানুষ ও পশু-পাখির জন্য আরও বাসযোগ্য করে তুলছে না সমস্যা তৈরি করছে?	
১৬.		
১৭.		
১৮.		
১৯.		

এই সারণি ব্যবহার করে যে তথ্য পাওয়া গেল তা সবাই বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে উপস্থাপন করল।

চলো আমরাও উপরের ছক ব্যবহার করে কোনো একটি কারখানা পরিদর্শন করে সে বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করি।

এরপর খুশি আপা তাদের বললেন, আচ্ছা বর্তমান সময়ে মানুষ কীভাবে উৎপাদন করে তা তো আমরা দেখলাম। অতীতেও মানুষ কি একইভাবে উৎপাদন করত? অতীতের সব সময়ই কি একইভাবে উৎপাদন করত?

এ প্রশ্ন শুনে সবাই চিন্তিত হয়ে পড়ল, কিন্তু কেউই কোনো উত্তর খুঁজে পেল না। সবাই নিশ্চুপ হয়ে থাকল।

তখন নন্দিনী বলল, মনে হয় আমরা আসলে কেউই এ বিষয়ে কিছু জানি না। কিন্তু বিষয়টা খুবই মজার হবে বলে মনে হচ্ছে। আমার মাথায় একটি বুদ্ধি এসেছে। আমরা যদি এ বিষয়ে একটি অনুসন্ধানী প্রকল্প করতে পারি, তাহলে কেমন হয়?

সবাই সমস্বরে বলে উঠল, খুব মজা হবে ।

খুশি আপা বললেন, খুব ভালো লাগল তোমাদের কথা শুনে। তোমরা এখন নিজে থেকেই বিভিন্ন বিষয় শেখার চেষ্টা করছ। ঠিক আছে চলো আমরা এ বিষয়ে অনুসন্ধানী কার্যক্রম পরিচালনা করি। তাহলে চলো দলে বিভক্ত হয়ে আমরা অতীতে উৎপাদন কীভাবে হতো বা এক কথায় উৎপাদন পদ্ধতি সম্পর্কে কী জানতে চাই সে বিষয়ে অনুসন্ধানের প্রশ্ন তৈরি করি।

তখন সবাই দলে বিভক্ত হয়ে নিচের মতো করে অতীতের উৎপাদন পদ্ধতি সম্পর্কে জানার জন্য অনুসন্ধানের প্রশ্ন তৈরি করল।

অনুসন্ধানের জন্য প্রশ্ন:

অতীতে বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন জায়গায় কীভাবে উৎপাদন বা খাবার/দ্রব্য/পণ্য তৈরি করা হতো এবং ঐ সময়ের মানুষ কীভাবে এসব কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল?

এরপর সব কয়টি দল অনুসন্ধানের প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য তথ্য সংগ্রহের উপযোগী প্রশ্নমালা তৈরি করে উপস্থাপন করল। সবকটি দলের প্রশ্নের উত্তর থেকে তারা আলোচনার ভিত্তিতে নিচের প্রশ্নমালা তৈরি করল।

ক্রম	পর্যবেক্ষণের বিষয়	প্রাপ্ত তথ্য
১.	কোথায় উৎপাদন বা খাবার/বিভিন্ন দ্রব্য/পণ্য তৈরি হয়	
২.	উৎপাদনে বা খাবার/বিভিন্ন দ্রব্য/পণ্য তৈরি করতে কী ধরনের যন্ত্র/মেশিন/হাতিয়ার/অস্ত্র/জিনিস ব্যবহার করা হতো?	
৩.	কীভাবে উৎপাদন হয়?	
৪.	উৎপাদনে যে মানুষেরা কাজ করে তাদের পরিচয় বা কী কাজ করে তার বিবরণ?	
৫.	যেখানে উৎপাদন হয় সে জমি, ভবন/ঘর/ছাউনি/যন্ত্রপাতি প্রভৃতির মালিক কে?	
৬.	মালিকের কাজ কী?	
৭.	যারা কাজ করে বা শ্রমিক তাদের সঙ্গে ভবন/ঘর/ছাউনি/যন্ত্রপাতির কী সম্পর্ক?	
৮.	মালিক উৎপাদন থেকে কী পান?	

ক্রম	পর্যবেক্ষণের বিষয়	প্রাপ্ত তথ্য
৯.	শ্রমিক উৎপাদন থেকে কী পায়?	
১০.	উৎপাদনের সঙ্গে যে সকল মানুষ যুক্ত তাদের পরস্পরের সম্পর্ক কী?	
১১.	উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত কাঁচামাল ও জ্বালানি হিসেবে কী ব্যবহার করা হয়?	
১২.	কাঁচামাল ও জ্বালানি কোথা থেকে সংগ্রহ করা হয়?	
১৩.	কাঁচামাল ও জ্বালানি ব্যবহার করে কী কী দ্রব্য বা পণ্য তৈরি বা উৎপাদিত হয়?	
১৪.	উৎপাদিত সব দ্রব্যই কি মানুষের কাজে লাগে?	
১৫.	উৎপাদিত দ্রব্য ও পণ্য কোথায় যায়?	
১৬.	যেখানে উৎপাদন হয় তার সঙ্গে আশপাশের মানুষ, পশুপাখি বা পরিবেশের সম্পর্ক কী ধরণের ?	
১৭.	যেভাবে উৎপাদন হয় বা উৎপাদন পদ্ধতি কি আশপাশের পরিবেশকে মানুষ ও পশু-পাখির জন্য আরও বাসযোগ্য করে তুলছে না সমস্যা তৈরি করছে?	

চলো আমরাও ওদের মতো উপরের সারণিতে উল্লিখিত প্রশ্ন তৈরি করি এবং অতীতের উৎপাদন পদ্ধতি সম্পর্কে অনুসন্ধানী প্রকল্প তৈরি করি।

প্রশ্নমালা তৈরি করার পর আনাই মোগিনী বলল, কিন্তু আমরা তো অতীতে ফিরে যেতে পারব না, তাহলে অতীতের মানুষের জীবন নিয়ে কীভাবে গবেষণা করব?

শুনে খুশি আপা বললেন, অতীতে মানুষ যা করেছে তা ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি। আমাদের যে **ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান (অনুসন্ধানী পাঠ)** বই আছে সেখানে মানুষের অতীতের কাজের অনেক বিবরণ আমরা খুঁজে পাই। আমরা এই বইসহ অন্যান্য বই, পত্রিকা বা ইন্টারনেটসহ যেকোনো নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে প্রাসঙ্গিক তথ্য ব্যবহার করতে পারব।

এরপর দলগতভাবে ওরা নিচে উল্লিখিত **ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান (অনুসন্ধানী পাঠ)** বইয়ের অধ্যায়গুলো ব্যবহার করে অতীতের বিভিন্ন সময়ে মানুষ কীভাবে উৎপাদন করত সে বিষয়ে অনুসন্ধান করল। প্রতিটি অধ্যায়ের বিষয় নিয়ে ওরা আলাদা আলাদা অনুসন্ধান করল। এগুলোর মাধ্যমে বিভিন্ন সময় ও ভৌগোলিক অবস্থানের উৎপাদনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে ওরা জানতে পারল।

১. মানুষ ও সমাজ এলো কোথা থেকে;

২. সভ্যতার বিকাশ - এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপে নগরায়ন ও রাষ্ট্র। নগর সভ্যতার বিকাশ-এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপ;

৩. নগর সভ্যতার উত্থান পতন-দক্ষিণ এশিয়া;

৪. সাম্রাজ্যের বিস্তার, নগর-রাষ্ট্র, আর বৈচিত্র্য;

৫. আঞ্চলিক পরিচয়, চাষাবাদের বিস্তার এবং তৃতীয় নগরায়ণ : যোগাযোগ, মিশ্রণ আর প্রতিযোগিতার পর্ব

এ কাজে **ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান (অনুসন্ধানী পাঠ)** বইয়ের অধ্যায়গুলোর সঙ্গে ওরা অন্যান্য বই এবং ইন্টারনেটে ও বিভিন্ন শিক্ষামূলক ওয়েব সাইট থেকে প্রাপ্ত তথ্য ব্যবহার করেছে। ইন্টারনেট থেকে কীভাবে তথ্য সংগ্রহ করতে হয় সেটা ওরা আগেই ডিজিটাল প্রযুক্তি বিষয় থেকে শিখে নিয়েছিল।

চলো আমরাও ওদের মতো **ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান (অনুসন্ধানী পাঠ)**, অন্যান্য বই ও ইন্টারনেটের সহযোগিতা নিয়ে অতীতের মানুষ কীভাবে উৎপাদন করত তা অনুসন্ধান করি।

অনুসন্ধান শেষে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে প্রতিটি দল একটি করে রিপোর্ট তৈরি করল। রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন সময়ের ও ভৌগোলিক স্থানের উৎপাদনে ব্যবহৃত হাতিয়ার বা যন্ত্রপাতির মডেল তৈরি করল।

প্রাচীন মানুষের উৎপাদন প্রক্রিয়ার ভূমিকাভিনয়

এ কাজে তারা মাটি, কাগজ, শক্ত বোর্ড, কাঠ বা বাঁশ ইত্যাদি নানা ধরনের মাধ্যম বা জিনিস ব্যবহার করল। এসব মডেল ব্যবহার করে রিপোর্টে উল্লিখিত অনুসন্ধানে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ভূমিকা অভিনয়ের মাধ্যমে অতীতের উৎপাদন পদ্ধতিগুলো উপস্থাপন করল।

চলো ওদের মতো আমরাও অতীতের উৎপাদন পদ্ধতি নিয়ে অনুসন্ধান করে প্রাপ্ত তথ্য নিয়ে রিপোর্ট তৈরি করি এবং হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতির মডেল তৈরি করে ভূমিকা অভিনয় করি।

পরিশিষ্ট –১

শিক্ষা সফরের নমুনা পরিকল্পনা

ভ্রমণের আগে

- বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরিকল্পনায় সুবিধাজনক সময়ে ভ্রমণের জন্য সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ
- শিক্ষাভ্রমণের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অনুযায়ী ভ্রমণের স্থান নির্ধারণ
- শিক্ষাভ্রমণের গন্তব্যস্থান নিয়ে গবেষণা/বিশেষ ভাবে জানা (উচ্চতর শ্রেণির শিশু সহকারে)
- গন্তব্য স্থানে প্রবেশ /পরিদর্শনের জন্যে অনুমতি গ্রহণ
- জেলা পুলিশ/ট্যুরিস্ট পুলিশ/প্রশাসনকে অবহতিকরন
- শিক্ষক-শিক্ষার্থী মিলে বিদ্যালয়ের ভ্রমণ কমিটি গঠন
- শিক্ষা ভ্রমণের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য মাথায় রেখে বিস্তারিত ভ্রমণ সূচি প্রণয়ন (সংযুক্তি)
- প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ (বই, কাগজ, কলম, রেফারেন্স বই ইত্যাদি) তালিকাকরণ
- বাজেট প্রণয়ন, শিক্ষকদের দায়িত্ববন্টন, শিক্ষার্থীদের দল গঠন
- যাতায়ত, থাকা, খাওয়া ও সার্বিক নিরাপত্তা
- অভিভাবকদের উদ্দেশ্য চিঠি (সংযুক্তি)
- শিক্ষার্থীদের অরিয়েন্টেশন (শিক্ষাভ্রমণে কেনো যাচ্ছি, কি করবো, কি করবো না ইত্যাদি)
- গন্তব্যস্থানের প্রতিনিধির সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ
- অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণ যেমন- প্রাথমিক চিকিৎসা বাক্স, খেলাধুলা, বাদ্যযন্ত্র, ডিভাইজ, ব্যানার তালিকাকরণ
- খাবারের ম্যেনু নির্বাচন (স্থানীয় খাবারের অগ্রাধিকার)

ভ্রমণের দিন

- নির্দিষ্ট স্থানে অভিভাবক কর্তৃক শিক্ষার্থী হস্তান্তর– নির্দিষ্ট জায়গায় অপেক্ষা
- যানবাহনে মালামাল উঠানো
- শিক্ষকদের দায়িত্ব বণ্টন, শ্রেণি অনুযায়ী শিশুর হাজিরা
- গন্তব্য স্থানের টিকিট, সম্ভাব্য ক্ষেত্রে রাস্তার টোল

শিক্ষাভ্রমণের সময়

- পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী থাকার স্থানে দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক নিযুক্তকরণের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের ভাগ করা
- বিস্তারিত ভ্রমণসূচী অনুযায়ী কাজ
- শিক্ষার্থীদের সার্বক্ষণিক খেয়াল রাখা (নিরন্তর খবরদারী নয়) ও কাজে উৎসাহিত করা
- নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ
- প্রজেক্ট/অ্যাসাইনমেন্ট অনুযায়ী কাজের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও সাহায্য
- দলগত কাজে সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ
- গল্প, আড্ডা, খেলা, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম

ভ্রমণ শেষে

- অভিভাবকের কাছে শিশু হস্তান্তর
- শিক্ষার্থীদের কাজের প্রদর্শনীর আয়োজন
- বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে খরচের হিসাব
- এই ভ্রমণের অংশগ্রহণে শিক্ষার্থী মূল্যায়ন

বিশেষ লক্ষ্যণীয়-

- কেউ যেনো বুলির স্বীকার না হয়
- নিয়ম ভেঙ্গে দলছুট যেনো না হয়
- রাতে ঘুমানোর স্থানে মেয়েদের নিরাপত্তা
- মেয়ে শিক্ষার্থীর মাসিক হলে করণীয়
- অবৈধ কোনো কিছু সঙ্গে আছে কিনা বা করছে কি না লক্ষ্য রাখা

পরিশিষ্ট –২

বিশ্বভ্রমণ লু

অসুবিধাজনক স্থান:

সুবিধাজনক স্থান:

ুডো–নমুনা

পরিশিষ্ট –৩

বিশ্বভ্রমণ লুডো খেলার নিয়মাবলী

একক ভাবে খেলার নিয়ম	দলীয় ভাবে খেলার নিয়ম
• প্রতিটি বোর্ডে সর্বোচ্চ ৪ জন ও সর্বনিম্ন ২ জন খেলতে পারবে। • ১ পড়লে বিশ্বভ্রমণের যাত্রা শুরু করতে পারবে, তার আগে নয়। যাত্রা শুরুর স্থান ঢাকা। • মৌখিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে নির্ধারণ হবে কে আগে খেলা শুরু করবে। • গল্পে যে যে নিয়ম গুলো সংযুক্ত আছে সেই নিয়ম অনুসারে খেলতে হবে। • ১০০ পয়েন্টে আছে আন্দামান ও নিকোবর দীপপুঞ্জ, এখানে সকল খেলোয়াড়কে পৌঁছাতে হবে। যে সর্বপ্রথম ১০০ পয়েন্টে পৌঁছাবে সে জয়ী হবে।	• খেলাটি শিক্ষার্থীরা ৫-৬ জনের দলে ভাগ হয়ে খেলবে। • প্রতিটি বোর্ডে দুটো দল খেলতে পারবে। • প্রতি দলের একজন ক্যাপ্টেন থাকবে। • টসের মাধ্যমে নির্ধারণ হবে, কোন দল আগে খেলা শুরু করবে। • ১ পড়লে বিশ্বভ্রমণের যাত্রা শুরু করতে পারবে, তার আগে নয়। যাত্রা শুরুর স্থান ঢাকা। • দলের যে কোন একজন খেলা শুরু করবে। কে শুরু করবে তা ক্যাপ্টেন নির্বাচন করবে। • খেলা চলাকালীন যে কোন সময় খেলোয়াড় বদল হতে পারবে। তবে একজন বদলি হলে সে পুনরায় আর খেলার সুযোগ পাবে না। • গল্পে যে যে নিয়ম সংযুক্ত আছে খেলাটি সেই নিয়ম অনুসারে খেলতে হবে। • খেলা সঠিক নিয়মে পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা দেখার জন্যে প্রত্যেক বোর্ডের একজন রেফারি নির্ধারণ করতে হবে। রেফারি কে হবে তা দুই দলের ক্যাপ্টেন ঠিক করবে। যে রেফারি হবে সে খেলায় অংশ নিতে পারবে না। • ১০০ পয়েন্টে আছে আন্দামান ও নিকোবর দীপপুঞ্জ, এখানে সকল খেলোয়াড়কে পৌঁছাতে হবে। যে দল সর্বপ্রথম ১০০ পয়েন্টে পৌঁছাবে সেই দল জয়ী হবে।

লুডো খেলার শর্তাবলি :

লুডো খেলার সময় নিচের শর্তগুলো অবশ্যই মেনে চলতে হবে। বিভিন্ন স্থানে যে সব শর্ত বা অবস্থার কথা বলা হয়েছে ঐসব স্থানে গেলে তা সত্য ধরে নিয়ে খেলতে হবে। তবে এই নিয়ম, প্রশ্ন ও স্থানগলো কিছু নমুনা শর্ত মাত্র। তোমরা কিছু দিন পর পর অবশ্যই নতুন নতুন শর্ত তৈরি করবে এবং খেলাটিকে সব সময় আনন্দময় করে তুলবে।

অসুবিধাজনক স্থান:

১. অজন্তা গুহা, ঔরঙ্গাবাদ— এ গুহায় এসে বের হওয়ার পথ পেতে একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রশ্ন: অজন্তা গুহা কিসের জন্য বিখ্যাত? প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলে ২ ঘর এগিয়ে তাজমহল- এ যাবে, না পারলে ২ ঘর পিছিয়ে বঙ্গোপসাগরে যাবে।

২. মাউন্ট এভারেস্ট (এ পর্বতশৃঙ্গে এসে পৌঁছালে এটি পার হতে তাকে দুই দিন অবস্থান করতে হবে। সেই কারণে সে দুই দান খেলতে পারবে না।)

৩. মাওসিনরাম (বিশ্বের সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাতের স্থান এখানে এসে প্রবল বৃষ্টিপাতের মাঝে পড়বে।একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে একটি ছাতা পাবে এবং পরবর্তী ৫ ঘর এগিয়ে উলানবাতারে পৌঁছাবে, আর না পারলে ৫ ঘর পিছিয়ে কাবুল মরুভূমিতে যাবে। প্রশ্ন: অতি বৃষ্টিপাতের ফলে কি কি অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারে?

৪. চীনের মহাপ্রাচীর—এই প্রাচীর পার হতে তার অবশ্যই একজন গাইড লাগবে। গাইড পেতে ১ ফেলতে হবে। ১ না পড়া পর্যন্ত এগিয়ে যেতে পারবে না।

৫. মাউন্ট ফুজি আগ্নেয়গিরি, জাপান আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত থেকে বাঁচতে তাকে অগ্ন্যুৎপাত শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। ফলে সে একদান খেলা থেকে বিরত থাকবে।

৬. পশ্চিম সাইবেরিয়ান সমভূমি (রাশিয়া)(প্রশ্ন: সমভূমির মূল বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি?প্রশ্নটির উত্তর পারলে ১ ঘর এগিয়ে ট্রান্স সাইবেরিয়ান রেলওয়ে (রাশিয়া) তে যাবে, না পারলে ১ ঘর পিছিয়ে বৈকাল হ্রদ এ যাবে।)

৭. গ্রিস (অ্যাথেন্স, মাউন্ট অলিম্পাস) (এখানকার সভ্যতার পরিচিত দুটি উল্লেখযোগ্য দিক বলতে হবে। প্রশ্নটির উত্তর পারলে সে আবার খেলার সুযোগ পাবে, না পারলে ১ দান খেলা থেকে বিরত থাকবে।)

৮. ডেথ ভ্যালি, ক্যালিফোর্নিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (বিশ্বের উষ্ণতম স্থান) প্রশ্ন: পৃথিবার আর একটি উষ্ণতম স্থানের নাম বলো যা আফ্রিকা মহাদেশে অবস্থিত। এ প্রশ্নে উত্তর দিতে পারলে ৬ ঘর এগিয়ে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে যাবে না পারলে ৬ ঘর পিছিয়ে সাউদাম্পটন দ্বীপ, কানাডাতে যাবে।

৯. বেরিং সাগর (বেরিং প্রণালী) প্রশ্ন: এ প্রণালী কোন দুটি মহাদেশ কে পৃথক করেছে?এই প্রশ্নটির উত্তর দিতে পারলে সে তার দলের একজনকে ৫ দান পর্যন্ত সাহায্যকারী হিসেবে নিতে পারবে, আর না পারলে তার বিপক্ষ দল ৫ দান পর্যন্ত একজন সাহায্যকারী পাবে।

১০. আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা (১৮০ ডিগ্রী) (মানচিত্রে এ রেখাটি কোন কোন জায়গায় বেঁকে গেছে? প্রশ্নের উত্তর পারলে সরাসরি মাইক্রোনেশিয়াতে যাবে, না পারলে লন্ডন গ্রিনীচ, ইউকেতে নেমে

যাবে।

১১. অ্যামাজন রেনফরেস্ট (জঙ্গালে গিয়ে সে পথ হারিয়ে ফেলবে, পথ খুঁজে পেতে তাকে ৬ ফেলতে হবে। ৬ না পড়া পর্যন্ত সে এগিয়ে যেতে পারবে না। ৬ পড়লে সে দক্ষিণ আফ্রিকায় হীরার খনির সন্ধান পাবে।)

১২. অ্যান্টার্কটিকা (তুষার ঝড় থেকে বাঁচতে তার একটি বিশেষ পরিবহনের দরকার হবে। সে তখনই পরিবহনটি পাবে যখন তার দলের যেকোনো একজন খেলোয়াড়কে ১ দানের সমপরিমাণ সময় বরফ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে। যদি সে পারে তবে তার দল ৬ ঘর এগিয়ে ভিক্টোরিয়া ফলস (জিম্বাবুয়) তে যাবে আর না পারলে তার দল ২ দান খেলতে পারবে না।)

১৩. কেপ অফ গুড হোপ/ উত্তমাশা অন্তরীপ (দক্ষিণ আফ্রিকা) আটলান্টিক এবং ভারত মহাসাগরের সীমানা। এখানে এসে সামুদ্রিক ঝড়ের মুখোমুখি হবে। পরের ধাপে যেতে খেলোয়াড়কে তার নিজের জীবনের এমন একটি অভিজ্ঞতার কথা সবাইকে জানাতে হবে যা তাকে সামনের দিকে যেতে অনুপ্রেরণা যোগায়।

১৪. সাহারা মরুভূমি সাহারায় প্রচন্ড তাপ ও বালির ঝড়ের মুখোমুখি হবে। পরিত্রাণ পেতে ঝড় থামা পর্যন্ত ১ দিন অপেক্ষা করতে হবে। ফলে সে একদান খেলা থেকে বিরত থাকবে।

১৫. নীল নদ (মিশর) প্রশ্ন: নীল নদের তীরে কোন সভ্যতা গড়ে উঠেছিলো? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলে ১ পয়েন্ট এগিয়ে পিরামিড দেখতে যেতে পারবে, আর না পারলে ১ পয়েন্ট পিছিয়ে সাহারা মরুভূমিতে যাবে।

১৬. মাদাগাস্কার (সাভানা) এই ধাপের প্রশ্ন: তৃণভূমিতে বড় বড় গাছ জন্মায় না কেন?প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলে ২ পয়েন্ট এগিয়ে ফ্রাঁসোয়া পেরন জাতীয় উদ্যান (অস্ট্রেলিয়া) যাবে, না পারলে ২ পয়েন্ট পিছিয়ে আরব মরুভূমি (সৌদি আরব) এ যাবে।

১৭. মারিয়ানা ট্রেঞ্চ (পৃথিবীর গভীরতম খাদ) (এখানে আসলে সে ৪০ পয়েন্ট পিছিয়ে উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরে খাদে পড়ে যাবে।)

সুবিধাজনক স্থান:

১. পামির মালভূমি (তাজিকিস্তান) পৃথিবীর বৃহত্তম এই মালভূমিতে আসলে পুরস্কার স্বরূপ সে পরপর দুইবার খেলার সুযোগ পাবে।

২. ট্রান্স সাইবেরিয়ান রেলওয়ে (রাশিয়া) (এখানে আসলে সে ৩ পয়েন্ট পরের ধাপ কাস্পিয়ান সাগরে (কাজাখস্তান) এ যেতে পারবে।)

৩. মস্কোর ঘণ্টা, রাশিয়া এখানে আসলে তার বিপক্ষ দলকে পৃথিবীর অন্য একটা বিস্ময়কর জায়গার নাম বলতে হবে। বিপক্ষ দল প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারলে তাদের দলের যেকোনো একজন খেলোয়াড়কে স্ট্যাচু হয়ে ১ দান খেলার সমপরিমাণ সময় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।

৪. কৃষ্ণ সাগর (গ্রিস এবং ইউক্রেন এর মধ্যবর্তী, স্বাস্থ্যকর স্থান) এখানে আসলে সে একটা life পাবে। যার সুবিধা স্বরূপ পরবর্তী যেকোনো একটা অসুবিধা যুক্ত স্থানে পৌঁছালে তাকে আর সেই অসুবিধার মুখোমুখি হতে হবে না।

৫. নেদারল্যান্ডস (ফুলের দেশ) এখানে আসলে তাদের বিপক্ষ দল একটি সত্যি ফুল/ কাগজের তৈরি ফুল উপহার দেবে।

৬. দক্ষিণ আফ্রিকা (ডাইমন্ড মিনারেল) এখানে আসলে প্রচুর হিরার মালিক হবে তার দল এবং সুবিধা স্বরুপ ৫ ঘর এগিয়ে কঙ্গো রেইন ফরেস্ট (DR congo) যাবে।

৭. পিরামিড (মিশর)(পিরামিডের দেশে আসলে সে তার বিপক্ষ দলের বন্ধুদের একটি প্রশ্ন করতে পারবে। প্রশ্নটি পিরামিড/ মিশর সংক্রান্ত হতে হবে। বিপক্ষ দল যদি উত্তর দিতে না পারে তবে তারা তাদের অবস্থান থেকে ৫ ঘর পিছিয়ে যাবে।)

a. ইরাক (প্রাচীন সভ্যতা এবং তেল সম্পদ) এই প্রত্নতাত্ত্বিক ও খনিজ সম্পদে ভরপুর দেশে আসলে ১০ ঘর এগিয়ে নাউরু (ছোটতম দ্বীপ, দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগর) এ যাবে।

৮. সিডনি অপেরা হাউস এখানে আসলে তার বিপক্ষ দল কে যেকোনো একটা কিছু অভিনয় করে দেখাতে বলবে।)

৯. কিরিবাতি (ক্রিসমাস দ্বীপ, উত্তর প্রশান্ত মহাসাগর)। এখানে আসলে সে সরাসরি ১০ পয়েন্ট এগিয়ে আন্দামান নিকোবর দীপপুঞ্জে পৌঁছে যাবে।

১০. আন্দামান নিকোবর দ্বীপ এখানে আসলে তার দল একটি উদ্ধারকারী জাহাজ পাবে, এবং জাহাজে করে ঢাকা পৌঁছাবে।

পরিশিষ্ট – ৪

রিভার পাজল

পৃষ্ঠা দুটি কেটে বই থেকে আলাদা করে নাও। তারপর দাগ বরাবর কেটে ছোট ছোট চারকোণা আকৃতির ছবিগুলো আলাদা করে নাও। তারপর উৎস থেকে মুখ পর্যন্ত নদীটিকে তোমার মত করে সাজাও। তারপর বইয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ কর।

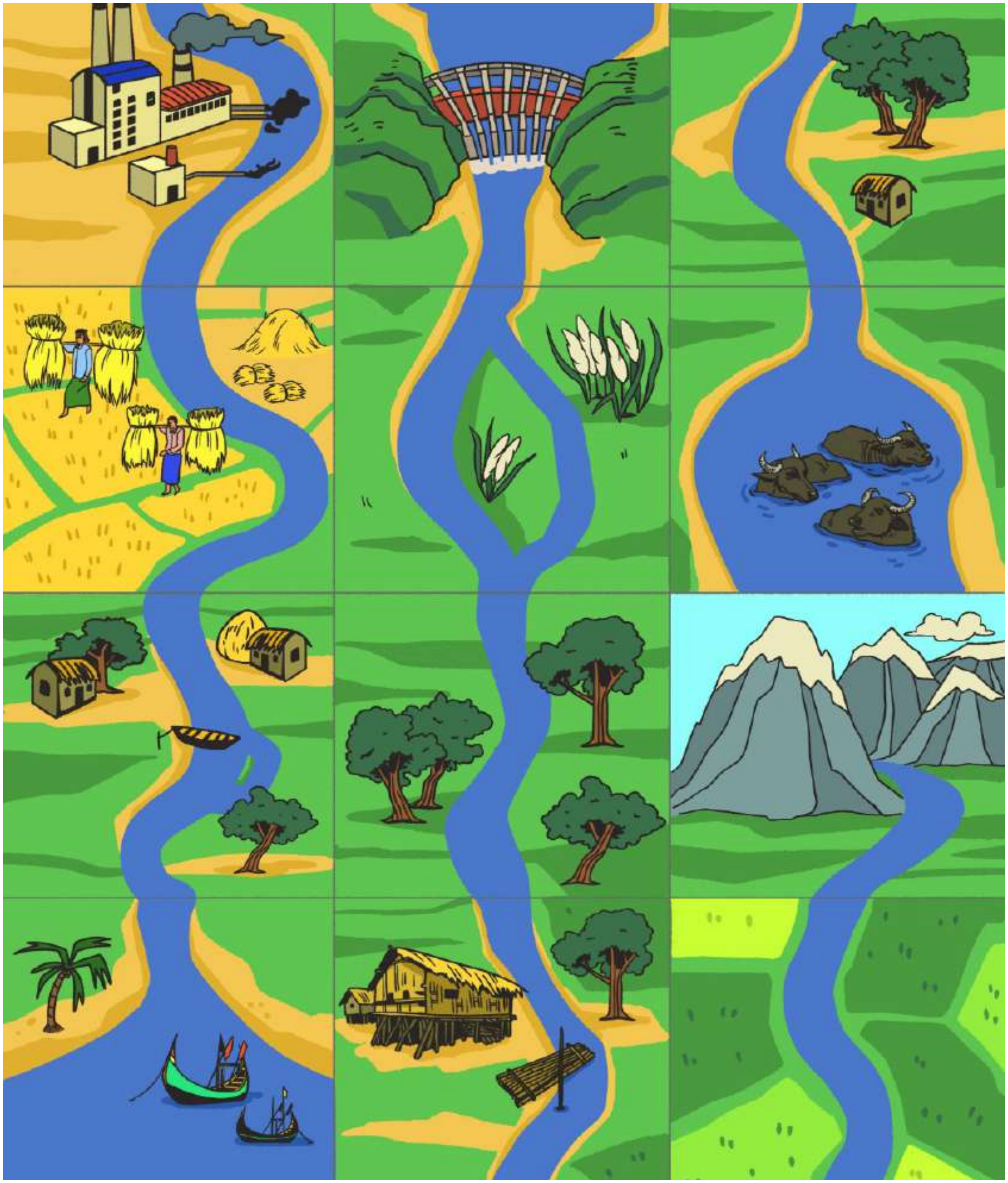

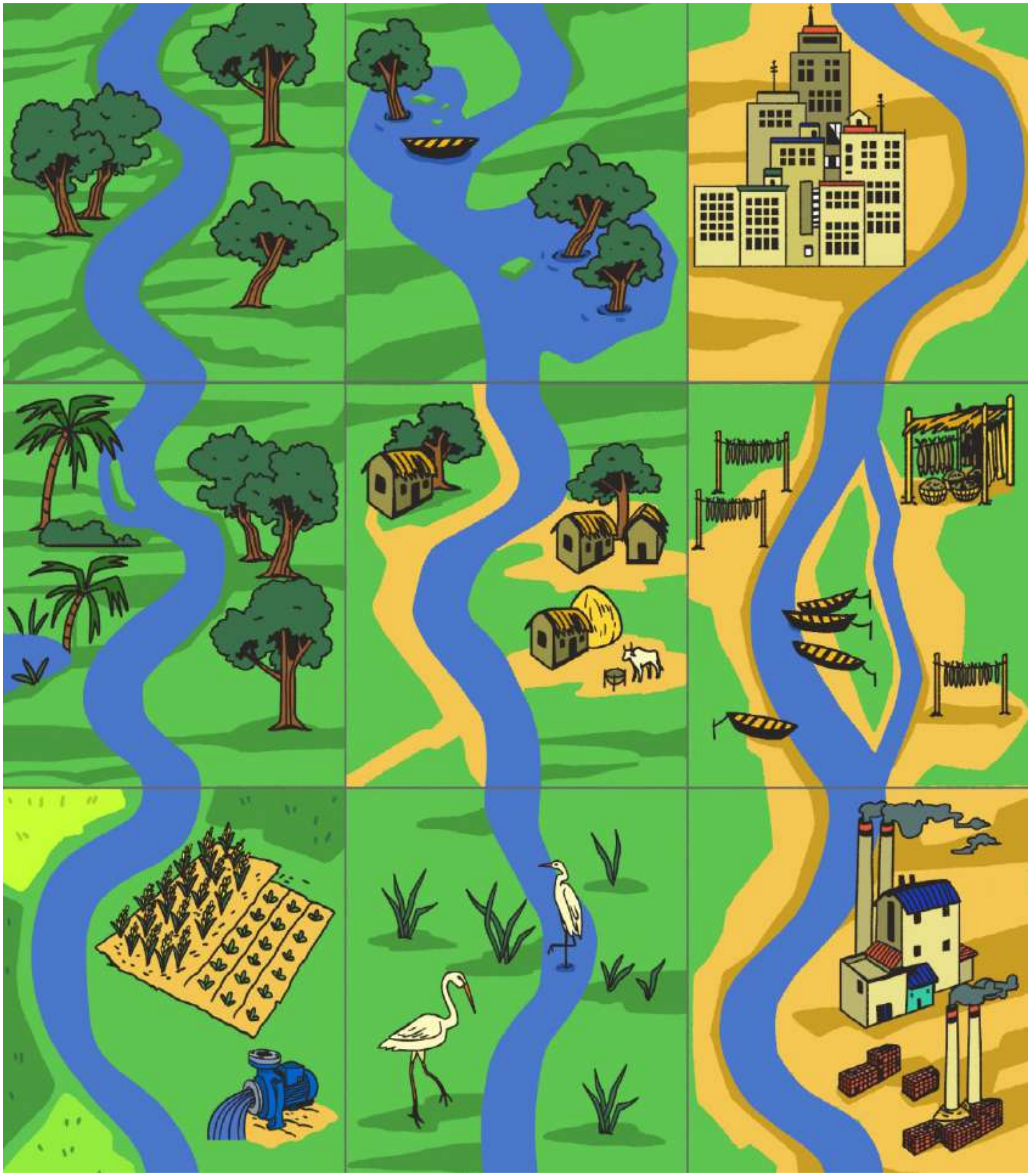

শরণার্থী: ১৯৭১

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী এবং তাদের স্থানীয় দোসরদের নৃশংসতার হাত থেকে রক্ষা পেতে এদেশের মানুষ বিভিন্ন পথে শরণার্থী হিসেবে ভারতে আশ্রয় নেয়। ভারত সরকার মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন প্রায় ১০ মিলিয়ন (এক কোটি) শরণার্থীকে আশ্রয়, খাদ্য ও চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করে।

২০২৩ শিক্ষাবর্ষ

দাখিল ৬ষ্ঠ- শ্রেণি

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান

অনুশীলন বই

শিক্ষাই দেশকে দারিদ্র্যমুক্ত করতে পারে

– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

একতাই বল

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য '৩৩৩' কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে ১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য